মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
আল-কুরআনে
নবুয়্যাত
ও
রিসালাত

আল-কুরআনে নবুয়্যাত ও রিসালাত

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৮-২৯৮৪৩১ ০১৭-৯০৭৭৮৫

আল-কুরআনে নবুয়্যাত ও রিসালাত
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল
প্রথম ঃ মার্চ ১৯৮৪

তৃতীয় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ঃ ২০০৪

প্রকাশক
রোকসানা বেগম

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল্লাহ্ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

ISBN 984-8455-05-1

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

প্রসঙ্গ—কথা

তাওহীদ ও রিসালাত ইসলামের দু'টি মৌল ভিত্তি। প্রধানতঃ এ দু'টি ভিত্তির উপরই ইসলামী জীবন দর্শনের গোটা প্রাসাদ নির্ভরশীল। তাওহীদ ছাড়া যেমন ইসলামী জীবন দর্শনের কল্পনা করা যায় না, তেমনি রিসালাত ছাড়া সে দর্শন কোন অবয়বও লাভ করে না। মূলতঃ তাওহীদ ও রিসালাত পরস্পর সম্পৃক্ত দু'টি স্বতন্ত্র বিষয়। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়।

তবে আপেক্ষিকতা বিচার করলে রিসালাতকেই ইসলামী জীবন প্রাসাদের প্রধান তোরণ রূপে গণ্য করতে হয়। কারণ জীবন দর্শন হিসেবে ইসলামের যা কিছু বক্তব্য, তা সবই এসেছে রিসালাতের মাধ্যমে। রিসালাতই মানুষকে জানিয়েছে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিয়ামত, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান। রিসালাতই মানুষকে দিয়েছে খোদায়ী সার্বভৌমত্ব-ভিত্তিক এক নির্ভুল ও সঠিক জীবন প্রণালী। যদি রিসালাতের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে মানুষের পক্ষে এর কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব হত না; মানুষ জানতে পারত না ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের কোন মাপকাঠি, দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হতনা কল্যাণময় জীবনের কোন অনুপম দৃষ্টান্ত। এদিক থেকে বিবেচনা করলে রিসালাতকে মানুষের প্রতি আল্লাহর এক পরম আশীর্বাদ রূপে গণ্য করাই বিধেয়।

পরিতাপের বিষয়, যে রিসালাত ইসলামী জীবন দর্শনে এতখানি কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী, সে সম্পর্কে আজকের মুসলিম সমাজের ধারণা খুবই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। সমাজের আধুনিক শিক্ষিত একটি অংশ যেমন রিসালাতের উপর তেমন কোন গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নন, তেমনি ধার্মিক শ্রেণীর একটি অংশ রিসালাতকে সীমিত রাখতে চান বিশ্বাস ও ভক্তির একটি সঙ্কীর্ণ পরিসরে। জীবনের আদর্শ বা মডেল রূপে এরা কেউই গ্রহণ করতে চান না রিসালাতের ন্যায় আল্লাহর পরম আশীর্বাদকে। এরই ফলে আজকের মুসলিম সমাজ যেমন ইসলামের অনুপম কল্যাণ-কারিতা থেকে বঞ্চিত, তেমনি নানা মত ও পথের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, দ্বিধা-বিভক্ত।

মুসলিম সমাজের এই দৈন্যদশা সামনে রেখেই মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) 'আল-কুরআনে নবুয়্যাত ও রিসালাত' শীর্ষক এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন ১৯৮৪ সালের প্রথমার্ধে। এই গ্রন্থে প্রধানত আল-কুরআনের বক্তব্য অবলম্বন করেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন নবুয়্যাত ও রিসালত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি; পুংখানুপুংখভাবে জবাব দিয়েছেন সম্ভাব্য তাবৎ সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর। বিশেষতঃ খতমে নবুয়্যাতের ন্যায় জটিল বিষয়টি তিনি যেরূপ মুনশীয়ানার সাথে বিশ্লেষণ করেছেন এবং নবুয়্যাতের সমাপ্তি বিষয়ে উম্মাতের সর্বসম্মত ধারণা ও বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এক কথায় তা অনবদ্য। এদিক থেকে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে যুগের এক বিরাট চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থটি আজ থেকে প্রায় আট বছর পূর্বে রচিত হলেও ইতিপূর্বে নানা কারণে এর প্রকাশনা সম্ভবপর হয়নি আমাদের পক্ষে। বর্তমানে 'খায়রুন প্রকাশনী' গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। সাম্প্রতিককালে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের নানা সমস্যা সত্ত্বেও গ্রন্থটির প্রকাশনার ব্যাপারে যতদূর সম্ভব যত্ন নেয়া হয়েছে। প্রকাশনা সংস্থা এর মূল্যও যথাসম্ভব আয়ত্তাধীন রাখার চেষ্টা করেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটি আমাদের বিদগ্ধ পাঠক সমাজের চিন্তা-চেতনাকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ ও শাণিত করবে এবং তাদের ঈমানী সম্ভ্রমকে উদ্দীপিত করে তুলবে।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন গ্রন্থকারের এই অনন্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান দিন, এই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
সেক্রেটারী
মওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন।

সূচী

আল-কুরআনে

নবুয়্যাত ও রিসালাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নবুয়্যাত ও রিসালাত

সূচনা ঃ

'আল–কুরআনে নবুয়্যাত ও রিসালাত' পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার শুরুতেই 'নবুয়্যাত' ও 'রিসালাত' বলতে কি বুঝায় এবং এ দুটির মধ্যে পার্থক্য কি এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা একান্ত জরুরী মনে হয়। কেননা নবুয়্যাত ও রিসালাত এ দুটির শাব্দিক অর্থ এবং এ দুটির প্রকৃত কাজ, দায়িত্ব ও মর্যাদা না জানলে এ দুটি পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভবপর হবে না।

'নবুয়্যাত' ও 'রিসালাত' পর্যায়ের আলোচনার শুরুতে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি অবশ্যই সামনে রাখতে হবেঃ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (البقرة، ٢١٣)

প্রথমদিকে সমস্ত মানুষই এক ও অভিন্ন পন্থার (একই দ্বীনের) অনুসারী ছিল। (উত্তর কালে এ অবস্থা স্থায়ী থাকতে পারে নি; বরং লোকদের পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে)। তখন আল্লাহ্ নবীগণকে পাঠাতে শুরু করেন। তারা (সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য) সুসংবাদদাতা ও (বাঁকা পথের পথিকদের জন্য আযাবের) ভয় প্রদর্শনকারী ছিল এবং তাদের সঙ্গে পরম সত্যতা সহকারে কিতাবও নাযিল করেন, যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সৃষ্ট মত–পার্থক্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা দিতে পারে। (তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির কারণ এ ছিল না যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়া হয়নি।) মত–বিরোধ তো

তারাই করেছিল যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে আগেই অবহিত করা হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ লাভ করার পর-ও শুধু এ জন্য সত্যকে পরিত্যাগ করে বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন করেছিল যে, তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। অতঃপর যারা নবীগণের প্রতি ঈমান আনলো তাদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুমতিক্রমে তাদের পারস্পরিক বিরোধীয় ব্যাপারাদিতে পরম সত্যের পথ দেখালেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাকে চান সরল-সঠিক-ঋজু পথ প্রদর্শন করেন।

এ দীর্ঘ আয়াতটির বক্তব্যকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়ঃ

— প্রথম দিকে মানুষ হেদায়েত ও সত্যের পথে চলছিল;

— পরে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মত-পার্থক্য ও বিরোধ ঘটে। তারা পরস্পরে বিবাদমান হয়ে পড়ে। আর তদ্দরুণ তারা পৃথিবীতে চরম অশান্তির সৃষ্টি করে।

— এর ফলে তারা সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

— তারা হয়ে যায় কাফির পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও দুনিয়ার স্বার্থলোভের কারণে।

— এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে নবীগণকে পাঠাতে শুরু করেন।

— নবীগণ যেমন ঈমানদার লোকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন, তেমনি বে-ঈমান লোকদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখান।

— আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের নিকট কিতাব নাযিল করেছেন। সে কিতাবে পরম সত্য বিধান পেশ করা হয়েছে। পারস্পরিক মত-পার্থক্য ও বিবাদ-বিসম্বাদে এই কিতাব চূড়ান্ত ফয়সালাকারী।

— এই কিতাব ও অকাট্য নির্দশনাদি পাওয়ার পর-ই তাদের মধ্যে এই মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছিল।

— এই কারণে কেবল ঈমানদার লোকেরাই সে কিতাব থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারে; তা-ও আল্লাহ্র অনুমতি হলে।

— কেননা সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে হেদায়েত লাভ কেবলমাত্র আল্লাহ্র মর্জীর উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। যার প্রতিই সে মর্জী হবে, সে-ই হেদায়েত পাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

আদম ও নূহ্-এর মাঝে সময়ের দশটি অধ্যায়ের ব্যবধান। প্রথমে লোকেরা হেদায়েতের পথের পথিক ছিল। পরে তাদের মধ্যে মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। আর তারপরই আল্লাহ্ নূহ্ ও অন্যান্য নবীগণকে পাঠান।

অপর এক আয়াতে রাসূলগণকে প্রেরণের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষায়ঃ

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا - (النساء: ١٦٥)

এই রাসূলগণ হচ্ছেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক। যেন এদের আগমনের পর লোকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দেখাবার সুযোগ না থাকে। আল্লাহ্‌ তো সর্বাবস্থায়ই বিজয়ী ও সুবিজ্ঞ।

রাসূলগণকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানবতার মুক্তিদাতা রূপে পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে অজ্ঞতা-মূর্খতা ও গুমরাহীর অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে নিয়ে আসেনঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۵ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ - (ابراهيم: ٥)

এবং নিঃসন্দেহে আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাদি সহ পাঠিয়েছিলাম এই বলে যে, তোমার নিজের লোকজনকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে নিয়ে আস এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র ইতিহাসের শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও। নিঃসন্দেহে এতে বহু বড় বড় নিদর্শন রয়েছে প্রতিটি ধৈর্যশীল শোকরকারী ব্যক্তির জন্য।

বস্তুতঃ 'নবুয়্যাত' ও 'রিসালাত' মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি বিশেষ দান। এই দান তিনি যাকে ইচ্ছা কেবল তাকেই দান করেন। তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্য থেকে যাকেই তিনি এর যোগ্য বিবেচনা করেন, তাকেই এজন্য খাস করে নেন। কেননা মূলতঃ এ এক মহা ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করা যার-তার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশেষ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا - (المزمل- ٥)

নিশ্চয়ই আমরা তোমার উপর এক দুর্বহ কালাম নাযিল করব।

'নবুয়্যাত' ও 'রিসালাত' যে এক মহা দায়িত্ব ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, তা আল্লাহ্‌র এই কথাটুকু থেকেই স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে এবং তা আল্লাহ্‌ যাকে চান বিশেষভাবে তাকেই দেন। বলা হয়েছেঃ

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

আল্লাহ্ তাঁর রহমাত—এই নবুয়্যাত বিশেষভাবে তাকেই দান করেন যাকে তিনি চান। আর আল্লাহ্–ই হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহশীল।

বস্তুতঃ 'নবুয়্যাত' ও 'রিসালাত' উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য কোন বস্তু নয়, কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের জোরেও তা পাওয়া যায় না। এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বাছাইয়ের ফল। তিনি তাঁর বান্দাহগণের মধ্য থেকে এই দায়িত্ব অর্পণের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের বাছাই করে নেন এবং নিজ থেকেই তাদের এই নবুয়্যাত ও রিসালাত দান করেন। অতএব তা কোন মানুষের অর্জনযোগ্য জিনিসও নয়। মানুষ নিজেরা চেষ্টা করে, গবেষণা করে বা সাধনা–সংগ্রাম করেও তা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ পর্যায়ে ঘোষণা দিয়ে বলেছেনঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ـ (الحج: ٧٥)

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল বাছাই করে স্বীয় পছন্দের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী।

আদম, নূহ্, ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে তিনিই নবী–রাসূল নিয়োগ করেছেন নিজ বাছাই নীতির ভিত্তিতে। বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىٓ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ (ال عمران: ٣٣)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম, নূহ ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদের সারা দুনিয়ার বুক থেকে বাছাই করে নিয়েছেন।

আর وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ـ (ص ـ ٤٧)

নিশ্চয়ই এরা আমার নিকট বাছাই করা অতীব উত্তম ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য।

'নবুয়্যাত' ও 'রিসালাত' যেমন অতি বড় দায়িত্ব–কর্তব্য ও সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার, তেমনি তা অতি বড় সম্মান ও মর্যাদারও ব্যাপার, সন্দেহ নেই। জাহিলিয়তের অনুসারীরা হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর ব্যাপারে এই ভুল ধারণার বশবর্তী ছিল যে, এত বড় সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য কোন ইয়াতীম দরিদ্র ব্যক্তি হতে পারে না, হতে পারে সমাজের অভিজাত বংশের শ্রেষ্ঠ ধনী বা প্রভাব ও প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই ধারণাকে আদৌ সমর্থন করেননি। তাঁর নিকট লোকটি ইয়াতীম আর দরিদ্র নাকি অভিজাত বংশের অতিবড় ধনী ও প্রতাপশালী, এ নিয়ে কোন প্রশ্নই নেই। তিনি তো দেখেন নবুয়্যাত ও রিসালাত–এর মহান পবিত্র দায়িত্ব পালনের মৌলিক যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আত্ম–

নিবেদনের ভাবধারা পূর্ণমাত্রায় কার মধ্যে রয়েছে। তাই জাহিলিয়তের উক্ত ধারণার প্রতিবাদ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ـ (الزخرف ٢٣)

ওরাই তোমার রব্-এর রহমত (নবুয়্যাত) বন্টন করে নাকি? আসলে দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবন–উপকরণ আমরাই (তাদের মধ্যে) বন্টন করে থাকি এবং তাদের পরস্পরকে অপর পরস্পরের উপর উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছি।

مَعِيشَتَهُمْ বলতে যদিও মানুষের বৈষয়িক ও বস্তুগত জীবন–উপকরণ বুঝায়; কিন্তু এখানে তারই মত আল্লাহ্–প্রদত্ত নবুয়্যাত ও রিসালাতই বোঝানো হয়েছে; যেহেতু আল্লাহ্র নবুয়্যাত ও রিসালাত–ই হোক কিংবা হোক বস্তুগত জীবন সামগ্রী, সবকিছুরই মৌলিক বন্টন একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। এ ব্যাপারে মানুষের করণীয় কিছুই নেই, বক্তব্যও কিছু থাকতে পারে না। আল্লাহ্ নিজেই যেমন ধন–মাল বন্টন করেন, নবুয়্যাত ও রিসালাতও তিনি নিজেই বন্টন করেন। বিশেষতঃ নবুয়্যাত ও রিসালাত দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার বাছাই নীতিই প্রধান ভিত্তি। এ ক্ষেত্রেও মানুষের কিছুই বলবার থাকতে পারে না, যেহেতু মানুষের সাধারণ বিচার–বুদ্ধি অনুযায়ী নবুয়্যাত ও রিসালাত–এর বন্টন হয় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ـ (الانعام ـ ١٢٥)

আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত কোথায় রাখবেন (কা'কে তাঁর রাসূল বানাবেন) তা তিনি নিজেই সবচাইতে ভাল জানেন।

কেননা ধন–মালের মালিক হওয়া কিংবা উচ্চ বংশীয় হওয়া আর নবুয়্যাত রিসালাত পাওয়া এক কথা নয়। এ দু'য়ের মাঝে কোন সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নেই। যারা উচ্চ বংশীয় কিংবা বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হবে, তারাই যে নবী রাসূল হওয়ার যোগ্য হবে, এমন কোন কথাই হতে পারে না। মানুষের মধ্যে যোগ্যতা–প্রতিভা ও পাত্রত্বের দিক দিয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকা খুবই স্বভাবিক। ফলে হতে পারে উচ্চবংশীয় নয়—নয় বড় কোন ধনী; কিন্তু নবী–রাসূল হওয়ার জন্য সে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য।

নবুয়্যাত ও ধন–মালের মালিকত্ব বা প্রশাসনিক কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য

নবুয়্যাত–রিসালাত একান্তভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দান বিশেষ। মহা শক্তিমান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান আল্লাহ্ যাকে চান, তা তিনি বিশেষ করে তাকেই দিয়ে থাকেন। তার সাথে ধন–মালের মালিকত্ব কিংবা রাজত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের আদৌ

কোন সাদৃশ্য নেই। এ দু'য়ের মধ্যকার পার্থক্য এখানে স্পষ্ট করে দেখাতে চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রথমঃ নবুয়্যাত–রিসালাত বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রমিত বা বন্টিত হয় না। উত্তরাধিকার সূত্রেও তা পাওয়া যায় না। নবীর পুত্র এজন্যই নবী হয় না যে, সে একজন নবীর পুত্র। পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত ধন–মালের উত্তরাধিকারের ন্যায় নবুয়্যাত ও রিসালাত উত্তরাধিকার সূত্রে কখনই প্রাপ্তব্য হতে পারে না। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔ (الدخان: ٣٢)

তাদের অবস্থা জেনে–বুঝে বাছাই করে নিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য লোকদের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি।[১]

দ্বিতীয়ঃ নবুয়্যাত–রিসালাত কখনই কোন কাফির ব্যক্তিকে দেয়া হয় না, দেয়া হয় কেবলমাত্র মুমিন ব্যক্তিকে। কিন্তু ধন–মাল ও রাজত্ব–কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র এমন কোন নীতি নেই। তাই ধন–মালের মালিকত্ব বা রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা যে কোন কাফির ব্যক্তিও লাভ করতে পারে। যেমন ফিরাউন আল্লাহ্‌দ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও মিশরের নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। সে তার সময়ের জনগণকে সম্বোধন করে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে বলেছিলঃ

يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۔ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ۔ (الزخرف: ٥١ - ٥٢)

হে জনগণ! মিশরের বাদশাহী কি আমার জন্য নির্দিষ্ট নয়? আর এই খাল–নদী কি আমারই অধীন প্রবাহিত হচ্ছে না? — তোমরা কি তা দেখতে পাও না? আমি কি অতি ভাল মানুষ নই ঐ ব্যক্তির অপেক্ষা যে হীন ও নীচ, যে নিজের কথাটিও স্পষ্ট করে বলতে পারে না?

ফিরাউন তার এই কথাটির মাধ্যমে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে প্রথম উল্লেখ করেছে সমগ্র মিশরের উপর তার নিরংকুশ মালিকত্ব ও কর্তৃত্বের কথা—সব কিছুই তার অধীন হওয়ার কথা। দ্বিতীয়, সে উল্লেখ করেছে তার উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়ার কথা এবং তৃতীয়তঃ বলেছে তার স্পষ্টভাষী ও সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণে সক্ষম হওয়ার কথা। এই কটি দিক দিয়ে সে নিজেকে হযরত মূসা (আ)–এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চেয়েছিল।

---

(১) আয়াতটি যদিও বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কেই বলা। তবু নবুয়্যাত–রিসালাত দানের ক্ষেত্রেও যেহেতু আল্লাহ্‌র এই নিজস্ব বাছাই নীতি পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর, এই জন্য এ আয়াতটিকে সেক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়।

তার পূর্বে নমরূদও বাদশাহ হওয়ার ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের মালিক হওয়ার দরুণ স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেছিল হযরত ইবরাহীম (আ)–এর তুলনায়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي

يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ط

তুমি কি সেই ব্যক্তির কথা বিবেচনা করনি, যে আল্লাহ্র দেয়া রাজকীয় ক্ষমতা লাভ করে ইবরাহীমের রব্ এর বাপারে তার সাথে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছিল—— এবং দাবি করেছিলঃ আমি বাঁচাই ও আমিই মারি?

অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) বাদশাহ্ও নয়, সে কাউকে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না; কিন্তু নমরূদ এই সব দিক দিয়ে পূর্ণ পারঙ্গম। অতএব সে–ই শ্রেষ্ঠ, তারই তো নবী হওয়ার কথা। সে কেন ইবরাহীমের কথা শুনবে ও মেনে নিবে? কিন্তু আল্লাহ্র নিকট এ কথা স্বীকৃত নয়।

তৃতীয়ঃ নবুয়্যাত ও রিসালাত কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। স্ত্রীলোককে কখনই নবী বা রাসূল বানানো হয়নি—হয় না। কেননা নবুয়্যাত ও রিসালাত অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপার। প্রাণান্তকর কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে হয় এই দায়িত্ব পালনের জন্য। আর এই শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করা স্ত্রীলোকদের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব নয়।

এ কথা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন এ আয়াটিতেঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ط (يوسف ، ١٠٩)

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমরা যে সব রাসূল পাঠিয়েছি, তারা সবই পুরুষ লোক। তাদের প্রতি আমরা ওহী পাঠাতাম, তারা জনপদেরই অধিবাসী ছিল।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ـ

(النحل : ٤٣)

তোমার পূর্বে আমরা যাদেরকেই রাসূল বানিয়েছি তারা সকলেই পুরুষ ছিল, তাদের প্রতি আমরা ওহী পাঠাতাম। অতএত তোমরা যদি কোন বিষয়ে না জান, তাহলে এই ওহীপ্রাপ্ত জ্ঞানবান লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে নাও।

চতুর্থঃ 'নবুয়্যাত' ও 'রিসালাত'–এর ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, বিশাল। তার সমুখে রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তার দাওয়াত একান্তই মৌলিক ও ভিত্তিগত। তার দাওয়াত একান্তভাবে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান গ্রহণের, আল্লাহ্র দাসত্ব

কবুলের এবং পরকালের প্রতি ঐকান্তিক দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণের। সে দাওয়াত ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলার, ইহকালীন জীবনের তুলনায় পরকালীন জীবনকে অগ্রাধিকার দানের। রাজত্ব, রাজতন্ত্র—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিংবা স্ব-অর্জিত—এ ঈমানের পথে দুরধিগম্য ও অনতিক্রম্য প্রবল প্রতিবন্ধক। কেননা রাজত্ব, বাদশাহী বৈষয়িকতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। তাই রাজা বা বাদশাহ—দেশের সর্বোচ্চ ও নিরংকুশ ক্ষমতাশালীকেই নবী বা রাসূল হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহ্ চাইলে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন হযরত দায়ূদ (আ) ও তাঁর পুত্র সুলাইমান (আ) আল্লাহ্র নবীও ছিলেন, বাদশাহও ছিলেন। আর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান ছিলেন। অবশ্য তিনি 'বাদশাহ' বা 'রাজা' ছিলেন না।

নবী ও রাসূল—এর মধ্যে পার্থক্য

'নবী' একজন মানুষ। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি শরীয়াত নাযিল করেছেন ওহীর মাধ্যমে। কিন্তু তা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত নয়।

আর রাসূলও একজন মানুষ। আল্লাহ্ তাঁর নিকট শরীয়াতের বিধান ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। সেই সাথে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার দায়িত্ব-ও তার উপর অর্পিত।

এ পর্যায়ে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেনঃ

'রাসূল' শব্দের অর্থ 'প্রেরিত'। এই অর্থের দৃষ্টিতে আরবী ভাষায় দূত, বাণী-বাহক, সংবাদদাতা বা সংবাদ-বাহক ইত্যাদি অর্থ বোঝাবার জন্য এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে এই শব্দটি হয় সেই সব ফেরেশতাদের বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যাঁরা আল্লাহ্র নিকট থেকে বিশেষ কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়ে থাকেন, অথবা এই নামে অভিহিত করা হয় সে সব ব্যক্তিকে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব-মানবের নিকট তাঁর পয়গাম পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন।

'নবী শব্দের অর্থ সম্পর্কে আভিধানিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ একে نَبَأٌ শব্দ থেকে নির্গত মনে করেন। এর অর্থ সংবাদ-বাহক। আবার কারো কারো মতে এর মূল হচ্ছে 'নবুউন' (نُبُوٌّ) অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাবান ও উন্নত মান-সম্মানসম্পন্ন। আজহারী কাসায়ীর সূত্রে একটি তৃতীয় কথাও বর্ণনা করেছেন। তা হলো, আসলে এই শব্দটি হচ্ছে 'নাবী-ই' (نَبِيٌّ)। এর অর্থ পথ ও পন্থা বা রাস্তা। আর নবী-রাসূলগণকে 'নবী' বলা হয় এইজন্য যে, তাঁরাই হচ্ছেন আল্লাহ্র দিকে যাওয়ার পথ-প্রদর্শক। কুরআন মজীদে এই দুটি শব্দ কারো কারো জন্য একসাথে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۔ (مريم : ٥١)

সে ছিল এক নিষ্ঠাপূর্ণ ও মনোনীত ব্যক্তি। আর নবী–রাসূল ও ছিল সে।

এক ব্যক্তিকে 'নবী–রাসূল' বলার অর্থ, হয় হবে উচ্চ মর্যাদাবান সংবাদ–বাহক; কিংবা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সংবাদদাতা কিংবা পয়গম্বর, যিনি আল্লাহ্‌র পথের সন্ধানদাতা।

কুরআন মজীদে এ দুটি শব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। একই ব্যক্তিকে কোথাও শুধু 'নবী' আবার কোথাও শুধু 'রাসূল' বলা হয়েছে। আবার কোথাও এই শব্দ দুটি এভাবেও ব্যবহৃত হয়েছে, যা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এ দুটির মধ্যে মর্যাদা বা দায়িত্ব ও কাজের স্বরূপের দিক দিয়ে কোন পারিভাষিক পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا ....

আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল পাঠাই নি, না কোন নবী। তবে —

এভাবে বলার কারণে স্পষ্ট মনে হয়, নবী ও রাসূল দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা এবং এ দুটির মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। একারণে তাফসীরকারদের মধ্যে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এই শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্যের রূপটি কি—কি রকমের পার্থক্য? কিন্তু এপর্যায়ে যতই মত–পার্থক্য ও বিতর্ক হোক–না কেন, অকাট্য দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে নবী ও রাসূল এ দুটি শব্দের আলাদা–আলাদা পদমর্যাদা নির্ধারণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। খুব বেশী বললে এটুকুই বলা যায়, 'রাসূল' শব্দটি 'নবী' অপেক্ষা একটি বিশেষ গুণের ইঙ্গিতবহ। অন্য কথায়, সব রাসূল নবীও; কিন্তু সব নবী রাসূল নয়। আরও বলা যায়, নবীগণের মধ্যে রাসূল শুধু সেই সব মহান মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ, যাঁদেরকে সাধারণ নবীগণের অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। একটি হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) হযরত আবু ইমামা (রা) থেকে এবং হাকেম হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের কথাটি হচ্ছেঃ নবী করীম (স)–এর নিকট রাসূলগণের মোট সংখ্যা কত, তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ৩১৩ কিংবা ৩১৫ জন। আর নবীগণের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে বললেনঃ ১ লক্ষ ২৪ হাজার। হাদীসটির সনদ দুর্বল হলেও একই কথার বর্ণনা কয়েকটি হাদীসে পাওয়ার দরুণ দুর্বলতা অনেকটা দূর হয়ে যায়। (তাফহীমুল কুরআন (বাংলা) ৮ম খন্ড, ২৭–২৮ পৃঃ)

অতএব 'রিসালাত' নবুয়্যাতের তুলনায় অধিক উঁচু মর্যাদার জিনিস। কেননা প্রত্যেক রাসূল মূলতঃ নবী। কিন্তু প্রত্যেক নবী–ই রাসূল নন। নবীগণের মোট সংখ্যা কত? — এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়, বিভিন্ন বর্ণনাও উদ্ধৃত করা হয়। একটি বর্ণনায় তাঁদের

সংখ্যা বলা হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার।[১] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তাঁর সংকলিত বিরাট হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছেঃ আমি বললাম, হে রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে? বললেনঃ আদম। আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপকারী নবী।[২] বললাম, হে রাসূল! আল্লাহ্‌র রাসূল কত জন? বললেনঃ তিন শত ও প্রায় দশ—এক বিরাট সংখ্যক। হযরত আবু ইমামা'র বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ এক লক্ষ বিশ হাজার। তাঁদের মধ্য থেকে রাসূল হচ্ছেন তিনশ পনের জন—একটি বিরাট সংখ্যক।[৩]

তবে কুরআন মজীদে মাত্র পঁচিশ জনের নামোল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই রাসূল ছিলেন। এঁদের সকলেরই প্রতি ঈমান আনা ফরয।[৪]

কুরআনে যাঁদের নামোল্লেখ করা হয়নি, তাঁদেরকেও আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ কুরআনে সকল নবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। যাঁদের যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে,তাঁরা তো নিঃসন্দেহেই আল্লাহ্‌র নবী। নাম উল্লেখ করা হয়নি এমন নবীও অনেক রয়েছেন। তাঁরাও আল্লাহ্‌রই নবী। কেননা আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط (النساء: ١٦٤)

বহু সংখ্যক রাসূলের বর্ণনা তোমার নিকট পূর্বে দিয়েছি, এ ছাড়াও রাসূল রয়েছে, যাদের সম্পর্কে তোমাকে কোন বর্ণনা দেইনি।

রাসূলগণ আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশিত। এই দিক দিয়ে তাঁরা নবীগণ থেকে ভিন্নতর—অধিক ও অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে তাঁরা অধিক ও অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারী। এ পর্যায়ে এ আয়াতটি লক্ষণীয়ঃ

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا-

(الاحزاب : ٣٩)

যেসব নবী আল্লাহ্‌র রিসালাতকে পুরামাত্রায় পৌছিয়ে ও যথাযথ প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং আল্লাহ্‌কেই বুঝে–শুনে ভয় করে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করেনা (তাঁরাই রাসূল)। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

বস্তুতঃ রাসূলকেই আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় । যেমন হযরত মুহাম্মাদ (স)–কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

---

১. ইমাম শাওকানী লিখেছেন নবী–রাসূলগণের মোট সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৪ হাজার।

২. ইমাম শাওকানীর তাফসীর 'ফত্হুল কাদীর' গ্রন্থে হযরত আবু যর (রা) বর্ণিত হাদীসে বর্ণনাটি এভাবে উদ্ধৃতঃ

قلت يا رسول الله أرأيت ادم نبيا كان؟ قال نعم كان نبيا رسولا كلمة الله - (اخرجه ابوالشيخ وابن مردويه ج ١ ص ٥٥)

৩. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)।

৪. النبوة والانبياء محمد على الصابونى ص ١٣

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ط

(المائدة : ٦٧)

হে রাসূল! তোমার রব্‌-এর নিকট থেকে যা তোমার নিকট নাযিল হয়েছে তা তুমি পূর্ণমাত্রায় পৌঁছিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দাও। আর তুমি যদি তা না-ই করলে, তা হলে তুমি তাঁর রিসালাতকে পৌঁছিয়ে দিলে না।

অর্থাৎ নবী যখন রিসালাত লাভ করেন, তখনই তিনি রাসূল হন। কিন্তু সব নবীই রিসালাত পান না বলে সব নবী-ই রাসূল নন। আর নবী ছাড়া—নবী না হয়ে কেউ-ই রাসূল হতে পারেন না। এ কারণে রাসূল মাত্রই নবী।

নবীগণের মর্যাদা ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য এ আয়াতটি পাঠ করতে হবেঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَإِقَامَ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ـ

(الانبياء : ٧٣)

এবং এই নবীগণকে আমরা ইমাম—জননেতা বানিয়েছি; তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী হেদায়েত প্রদান করে। আর তাদের প্রতি আমরা বিপুল কল্যাণময় কার্যাবলী সম্পাদন, সালাত কয়েম করার ও যাকাত আদায়-বন্টনের নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। বস্তুতঃ তারা সকলেই আমার প্রকৃত বান্দাহ ছিল।

অর্থাৎঃ

— নবীগণ আল্লাহ্‌ নিযুক্ত জননেতা;

— নবীগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান অনুযায়ী লোকদেরকে হেদায়েত করেন;

— আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে ওহীর মাধ্যমে যাবতীয় কল্যাণময় কাজের নির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন;

— সালাত কয়েম ও যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা সম্পাদন করা নবীগণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ;

— নবীগণ একান্তভাবে আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বান্দাহ।

অতএব নবীগণ সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে রাসূলগণ আল্লাহ্‌ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয় ও মহাসম্মানিত বান্দাহ। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বাছাই করা, শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী ও বিশ্ব-মানবের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়োজিত নেতা। মানুষকে সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথের দিশা তাঁরাই দেন, দিতে পারেন। কেননা তাঁরা প্রতি মুহূর্তই আল্লাহ্‌র বিধানের অধীন ও ঐকান্তিকভাবে অনুসারী।

বস্তুতঃকুরআন উপস্থাপিত পূর্ণাঙ্গ আদর্শের বাস্তব প্রতিমূর্তি হচ্ছেন আল্লাহ্র নবী ও রাসূলগণ।

নবী–রাসূলগণের মধ্যে পারস্পরিক শ্রেনা ও মর্যাদা পার্থক্য

আল্লাহ্ তা'আলার নবী ও রাসূলগণ অভিন্ন শ্রেণী ও মর্যাদার অধিকারী নন। তাঁদের কতক অপর কতকের তুলনায় অতীব উচ্চ ও উত্তম মর্যাদায় অভিসিক্ত এবং এমনিভাবে কতক অপর কতকের তুলনায় কম মর্যাদার অধিকারী। এই শ্রেণী ও মর্যাদা পার্থক্যের কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই বলেছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ - (البقرة : ٢٥٣)

এই রাসূলগণ, এদের কতককে অপর কতকের উপর আমরা অধিক মর্যাদা দিয়েছি।

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا - (الاسراء : ٥٥)

এবং নবীগণের কতককে অপর কতকের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি এবং দায়ূদকে জাবুর (কিতাব) দিয়েছি।

নবী–রাসূলগণের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে এইরূপ পার্থক্য করা সম্পর্কে অবশ্য একটা প্রশ্ন উঠেছে। তা হচ্ছে আল্লাহ্ নিজে যদিও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে পার্থক্য করার কথা বলেছেন; কিন্তু আমাদের জন্য তা করা এবং কতককে অপর কতকের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান বিশ্বাস করা কি জায়েয হতে পারে? আল্লাহ্ নিজেই নবীগণের প্রতি ঈমান আনার শিক্ষা দিয়ে মুমিনগণের আকীদা হিসাবে ঘোষণা করেছেনঃ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ - (البقرة ٢٠٥)

আমরা নবী–রাসূলগণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না।

কিন্তু এই প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। কেননা এ আয়াতে যে পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করা, কতক নবী–রাসূলকে আল্লাহ্র প্রকৃত নবী–রাসূলরূপে বিশ্বাস করা এবং অপর কিছু সংখ্যক নবী–রাসূলকে সে রূপে বিশ্বাস না করার দিক দিয়ে পার্থক্য করা। এইরূপ পার্থক্য করার কোন অধিকার কোন ঈমানদার ব্যক্তিরই থাকতে পারে না। আহ্লি কিতাব—ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তা–ই করেছে। তারা কোন কোন নবী–রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং অপর কতিপয় নবী–রাসূলকে আল্লাহ্ প্রেরিত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। আর এভাবেই তারা ঈমান আনার ব্যাপারে নবী–রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করেছে। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ـ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ـ (النساء: ١٥٠-١٥١)

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর নবী–রাসূলগণকে অবিশ্বাস ও অমান্য করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর নবী–রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, বলেঃ আমরা কতকের প্রতি ঈমান রাখি ও অপর কতককে (আল্লাহ্র নবী–রাসূলরূপে) মানিনা, আর সেই সাথে কুফর ও ঈমানের মাঝে একটি (সমন্বয়কারী) পথ বের করার জন্য সচেষ্ট হয়, তারা পাক্কা কাফির। এই কাফিরদের জন্য আমরা অপমানকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

কারো কারো প্রতি ঈমান আনা ও অপর কারো প্রতি কুফর করা—আল্লাহ্র নবী বা রাসূলরূপে মেনে নিতে অস্বীকার করার যে পার্থক্য তা এবং নবী–রাসূলগণের মধ্যে শ্রেণী ও মর্যাদাগত পার্থক্য মেনে নেয়া কোনক্রমেই এক কথা হতে পারে না। আর এই পার্থক্যও মানুষের নিজেদের করার অধিকার নেই। তবে যে আল্লাহ্ নবী–রাসূলগণকে তাঁর পক্ষ থেকে দ্বীনের বাহক হিসাবে পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেই যদি তাঁদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করে থাকেন, তবে সে পার্থক্যকে মেনে নেয়াও ঈমানেরই অনিবার্য দাবি। কুরআন মজীদে শ্রেণীগত ও মর্যাদাগত–ভাবে নবী–রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করার কথা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ করেছেনঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ (البقرة: ٢٥٣)

এই রাসূলগণ—তাদের কাউকে কাউকে আমরা অপর কারো কারো অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে তো আল্লাহ্ নিজেই কথা বলেছেন। আবার তাদের কতককে অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন এবং মরিয়ম–পুত্র ঈসাকে আমরা অকাট্য প্রমাণ–নিদর্শনাদি দিয়েছি ও 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তার সাহায্যও করেছি।

নবী–রাসূলগণ মানুষ ছিলেন কেন?

নবী–রাসূলগণ আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহ্গণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম। তাঁরা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত দূত। মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার

আদেশ-নিষেধ সম্বলিত জীবন-বিধান তাঁরাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে জনগণের নিকট পৌছিয়েছেন। তাঁরাই মানুষকে জানিয়েছেন, আল্লাহ্ কিসে সন্তুষ্ট, কিসে অসন্তুষ্ট, একান্তভাবে আল্লাহ্র দাস হয়ে জীবন যাপন করার পন্থা ও পদ্ধতি কি। এই সব কথা বান্দাহদের পক্ষে জানা একান্তই অপরিহার্য। অন্যথায় আল্লাহ্র মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। এ কারণে আল্লাহ্ নিজেই মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব রূপে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।

কেননা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান লাভ করার অন্য কোন উপায়ই নেই। মানুষ নিজেও নিজের জন্য নির্ভুল, ন্যায়পরায়ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ কোন জীবন-বিধান রচনা করতে সমর্থ নয়। তাই আল্লাহ্ নিজেই সেই জীবন বিধান রচনা করে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন মানুষ সৃষ্টিরও বহু পূর্বে। এই জীবন-বিধান মানুষের নিকট পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে পৌছিয়ে দেয়ার মাধ্যম এই নবী-রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাহ হওয়ার জন্য মানুষের সম্মুখে একটি আদর্শ থাকা একান্তই জরুরী, যাকে তারা অনুসরণ করবে। সে আদর্শ হতে পারে মানুষ-ই। একজন মানুষ যখন নিজের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে আল্লাহ্র বিধান পালনের মাধ্যমে তৈরী করে, তখন সে অন্য মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারে। সেই মানুষটিকে অনুসরণ করে মানুষ আল্লাহ্র বান্দাহরূপে গড়ে উঠতে পারে। এইরূপ এক অনুসরণীয় আদর্শ ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র বিধান পালন ও আল্লাহ্র অনুগত বান্দাহরূপে গড়ে উঠা সম্ভব হয় না। ঠিক এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকেই অনুসরণীয় আদর্শরূপে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ একজন মানুষই হতে পারে, ফেরেশতা বা জ্বিন হতে পারে না। কেননা ফেরেশতা ও জ্বিনরা প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিন বা ফেরেশতাকে নবী বা রাসূল বানিয়ে পাঠান নি।

কিন্তু কাফিররা এই তত্ত্ব বুঝতে পারে না। তারা মনে করে, মানুষ কি করে আল্লাহ্র নবী বা রাসূল হতে পারে? জ্বিন বা ফেরেশতাই আল্লাহ্র নবী বা রাসূল হতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এই ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। বলা হয়েছেঃ

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ـ

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ـ (الانعام ٨ - ٩)

ওরা (কাফিররা) বলেঃ এই নবীর প্রতি কোন ফেরেশতা নাযিল হয়নি কেন? (যে এসে ঘোষণা করবে যে, ইনি আল্লাহ্র রাসূল)।— আমরা যদি প্রকৃতই একজন ফেরেশতা নাযিল করতাম (এবং সে এসে উক্ত রূপ ঘোষণা দিত) তাহলে এখন

পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হত। অতঃপর তাদেরকে আর কোন অবকাশই দেয়া হত না।

আর যদি আমরা ফেরেশতাই নাযিল করতাম, তাহলে তাকে একজন মানুষ বানিয়েই পাঠাতাম। আর তাহলে তাদেরকে পূর্বের মতই নানা শোবাহ-সন্দেহের মধ্যেই নিমজ্জিত করে ফেলতাম। ওরা প্রশ্ন তুলেছেঃ اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا -

আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

জওয়াবে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا -
(الاسراء: ٩٥)

বলঃ পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারাই নিশ্চিন্তে চলা-ফেরা ও বসবাস করত, তাহলে আমরা ফেরেশতাকেই তাদের জন্য নবী-রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম।

অর্থাৎ পৃথিবীতে বাস করে মানুষ। তাই মানুষের জন্য মানুষ-নবীই পাঠানো হয়েছে। ফেরেশতারা দুনিয়ায় স্থায়ী বসতি বানায়নি বলেই ফেরেশেতাকে নবী-রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়নি। মানুষের জন্য ফেরেশতাকে নবী-রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়নি এই জন্য যে, ফেরেশতা-রাসূলকে অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে মূলতঃই সম্ভব ছিলনা। মানুষ ফেরেশতাকে তার আসল রূপে তো দেখতে পারে না। দেখতে পারে তখন, যদি ফেরেশতা কোন মানুষের আকার-আকৃতি ধারণ করে। এরূপ অবস্থায় মানুষ-বেশী ফেরেশতা মানুষের জন্য কখনই অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারত না। এই কারণে আল্লাহ্ মানুষকেই নবী-রাসূল বানিয়ে মানুষের সম্মুখে পেশ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে আল্লাহ্র বিধান গ্রহণ করতে ও বাস্তবভাবে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে বলেছেন।

নবী-রাসূলের কাজ

১. নবী-রাসূলগণের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে দুনিয়ার মানুষকে একমাত্র মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর ঐকান্তিক দাসত্ব কবুলের দাওয়াত দেয়া। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং এটাই হচ্ছে তাঁদের প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ -
(الانبياء: ٢٥)

তোমার পূর্বে আমরা যে রাসূল-ই পাঠিয়েছি, তাকে আমরা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি ছাড়া ইলাহ কেউ নেই। অতএব তোমরা কেবল আমারই দাসত্ব কর।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ (النحل: ٣٦)

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই আমরা রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা সকলে এক আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং এক আল্লাহ্র দাস হতে দেয় না—নিজের দাস বানিয়ে রাখে এমন সব শক্তি ও প্রতিষ্ঠান–তাগুত—কে অস্বীকার কর।

২. নবী–রাসূলগণের দ্বিতীয় কাজ হলো, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ–নিষেধ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান জনগণের নিকট পৌছিয়ে দেয়া। আল্লাহ্র বিধান পৌছিয়ে দেয়ার জন্য যে মাধ্যম ও বাহন প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। আল্লাহ্ নিজেই এই বাহন ও মাধ্যম রূপে নবী–রাসূল প্রেরণের নিয়ম চালু করেছেন। নবী–রাসূলগণ সমস্ত নবুয়্যাতি জীবনব্যাপী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সে দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেন না, তার প্রতি কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)–কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ـ

(المائدة: ٦٧)

হে রাসূলঃ তোমার নিকট তোমার রব্–এর নিকট থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা তুমি যথাযথ পৌছিয়ে দাও। যদি তা না কর, তাহলে (বুঝতে হবে), তুমি আল্লাহ্র রিসালাতকে পৌছালে না।

৩. তৃতীয় কাজ হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে জনগণকে পথ দেখানো, সেই দিকে নিয়ে চলা, চলতে সাহায্য করা এবং এই পথে লক্ষ্য স্থলে পৌছিয়ে দেয়া।

প্রত্যেক রাসূলের জন্য এই দায়িত্ব অবশ্য পালনীয় এবং এ এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বস্তুতঃ মানুষ স্বভাবতঃই দিশেহারা। সে যেমন আল্লাহ্কে চিনেনা, আল্লাহ্র বিধান জানেনা, কল্যাণের পথের সন্ধানও তার জানা নেই। নবী–রাসূলগণই মানুষকে যেমন আল্লাহ্র সাথে পরিচিত করান, আল্লাহ্র বিধান জানিয়ে দেন, তেমনি সেই বিধান বাস্তবভাবে পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্কে পাওয়ার পথের সন্ধানও দেন, সেই পথে চলতে সাহায্য করেন; পথের প্রতি বাঁকে—প্রতিটি সন্ধিক্ষণে মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে নির্ভুল পথের দিকে চালিত করেন। এই কাজ নির্ভুলভাবে করতে পারার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী–রাসূলগণের কাছে কিতাব নাযিল করেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

(ابراهيم: ١)

এই কিতাব তোমার প্রতি আমরা নাযিল করেছি এজন্য, যেন তুমি মানুষকে পুঞ্জিভূত অন্ধকারের মধ্য থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসতে পার— তাদের রব্ব্–এর অনুমতিক্রমে স্বতঃপ্রসংশিত মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী আল্লাহ্‌র পথে।

এ আয়াতটিতে আল্লাহ্‌র কিতাব নাযিল হওয়ার এবং রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এবং তা হচ্ছেঃ মানুষকে কুফর ও শিরকের পুঞ্জিভূত অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসা এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথের সন্ধান দেয়া, আল্লাহ্‌র পথে চালিয়ে শেষ মনযিল আল্লাহ্‌কে পাওয়া পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে চলা। ইরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ - يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (المائدة: ١٥-١٦)

আমাদের রাসূল এসে গেছে। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবের যে অংশ গোপন করছিলে, সে তার অনেকগুলিকে প্রকাশ করে বলে দিবে, অবশ্য অনেকগুলিকে ছেড়ে দিবে। বস্তুতঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আলো ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবও এনেছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণকারী লোকদেরকে তার সাহায্যে শান্তির পথসমূহের দিকে পরিচালিত করে এবং পুঞ্জিভূত অন্ধকার থেকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আলোকের দিকে তাদেরকে বের করে আনে এবং সত্য–সঠিক–ঋজু পথের দিকে তাদের চালিত করে।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا - وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا -

(الاحزاب: ٤٥-٤٦)

হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শক ও আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল আলোদানকারী সূর্যরূপে।

এ আয়াতে নবীকে রাসূল বানাবার কথা বলা হয়েছে প্রথমে এবং তারপর তাঁর দায়িত্ব ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। সে দায়িত্ব হলোঃ তিনি সাক্ষ্য দিবেন হক ও বাতিল—সত্য ও মিথ্যার; দ্বীন পালনকারী ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি পরকালে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দিবেন আর বে–ঈমান–কাফিরদের জন্য জাহান্নামের ভয়

২—

দেখাবেন। তিনি আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে আল্লাহ্‌র দিকেই মানুষকে আহ্বান জানাবেন। তিনি হবেন চুতর্দিক উজ্জ্বলকারী দেদীপ্যমান সূর্যের মত। অজ্ঞানতা ও জাহিলিয়তের সব অন্ধকার তাঁর দরুণ দূর হয়ে যাবে, চতুর্দিককে তিনি তওহীদী জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল–উদ্ভাসিত করে তুলবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নবী–রাসূলগণের এ যেমন মর্যাদা, তেমনি এ দায়িত্বও বটে।

৪. আল্লাহ্‌র নবী–রাসূলগণ বিশ্ব মানবের অনুসরণীয় নেতা, অনুসরণীয় আদর্শ ও পথ প্রদর্শক। আল্লাহ্ তাদেরকে যেমন উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, তেমনি তাঁরা হন বিবেক–বুদ্ধির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ এবং আচার–আচরণে হন পবিত্রতম। ইরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

(الاحزاب : ٢١)

নিঃসন্দেহে রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে, তাদের জন্য যারাই আল্লাহ্ ও পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী এবং যারা আল্লাহ্‌কে বহুল পরিমাণে স্মরণ করে।

হযরত ইবরাহীম (আ)ও আল্লাহ্‌র অতীব মর্যাদাশীল নবী এবং মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ ছিলেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ - (الممتحنة : ٣)

নিঃসন্দেহে ইবরাহীম এবং তার সঙ্গী–সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য অতীব উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে।

এই আদর্শ হিসাবেই তাঁদের অনুসরণ করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলাঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ط (الانعام : ٩١)

এই নবী–রাসূলগণই হচ্ছেন সেই লোক, আল্লাহ্ নিজেই যাদের হেদায়েত করেছেন। অতএব তুমি এই লোকদের হেদায়েতকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে চল।

৫. মানুষকে পরকালের কথা জানিয়ে দেওয়া এবং পরকালে পুনরুত্থানের কথা বলে লোকদেরকে নসীহত করা। মৃত্যুর পর মানুষকে যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে অনিবার্যভাবে, সে বিষয়ে তাদেরকে জানিয়ে সতর্ক করে দেয়া। কিয়ামতের দিন মানুষ ও জ্বিনকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এই কিয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে সতর্ক করে দেয়ার জন্য তাদের নিকট নবী–রাসূলগণ এসেছিলেন কিনা?

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ـ (الأنعام : ١٣١)

তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াত বর্ণনা করবে ও আজকের দিনের সাক্ষাতের বিষয়ে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিবে?

৬. মানুষকে ধ্বংসশীল বৈষয়িক জীবন থেকে পরকালীন স্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুত করা, বস্তুবাদের পরিবর্তে তাকে নৈতিকতাবাদী বানানো। কুরআনে এই দুই জীবন ধারার তুলনা করে বলা হয়েছেঃ

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ـ (العنكبوت : ٦٤)

এই দুনিয়ার জীবন সবকিছু ভুলে খেলায় মেতে থাকা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত সত্য স্থায়ী জীবন হচ্ছে পরবর্তী ঘরের জীবন। যদি লোকেরা এটা জানতো।

اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ..... وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ـ (الحديد : ٢٠)

তোমরা জানবে যে, দুনিয়ার জীবনটা খেল–তামাসা, চাকচিক্য, পারস্পরিক অহংকার–গৌরব প্রকাশ এবং ধন–মাল ও সন্তানের আধিক্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করা ছাড়া আর কিছু নয়। .... পক্ষান্তরে পরকালে (হয়) কঠিন আযাব (ভোগ করতে হবে) না হয় (পাওয়া যাবে) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আসলে দুনিয়ার জীবনটা একটা মহা প্রতারণার সামগ্রী মাত্র।

৭. নবী–রাসূলগণ এভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে তাদের হেদায়েত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করবেন। যেন কিয়মতের দিন মানুষ বলতে না পারে যে, হে আল্লাহ্! আমরা তো তোমার কোন কথা জানতে পারিনি, জানতে পারিনি পরকালে তোমার নিকট হিসাব দেয়া ও তার পরিণতি ভোগ করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে। সে কারণেই দুনিয়ায় নবী–রাসূলগণকে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন দয়াময় মালিক আল্লাহ্ তা'আলা।

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ـ

নবী–রাসূলগণের আগমনের (এবং তাদের দায়িত্ব পালনের পর) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করার কোন সুযোগই মানুষের জন্য থাকবে না, এ কারণেই তিনি দুনিয়ায় সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবী–রাসূলগণকে (পাঠিয়েছেন)।

শিক্ষণ–প্রশিক্ষণই নবী–রাসূলগণের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ। ইরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

আল্লাহ্ নিশ্চয়ই অতিবড় অনুগ্রহ করেছেন মুমিনদের প্রতি এভাবে যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল বানিয়েছেন, যে তাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌র আয়াত তেলাওয়াত করবে, তাদের পরিচ্ছন্ন পবিত্র করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষ দেবে। যদিও তারা এর পূর্বে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে ডুবে ছিল।

নবী–রাসূলগণ মাসূম

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানুষের তুলনায় নবী–রাসূলগণকে সর্বাধিক উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। তাঁদের সেই উচ্চতর মর্যাদাসমূহের একটি বড় দিক হচ্ছে, তারা মাসূম—নিস্পাপ। কোনরূপ পাপ কার্য তারা করেন নি, আল্লাহ্‌র না–ফরমানী বা গুনাহের সর্ব প্রকারের কাজ থেকে তাঁরা মুক্ত ও পবিত্র। এই মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁদেরকে দিয়েছেন।

'মাসুম' (معصوم) 'ইসমাত' (عِصْمَةٌ) থেকে গঠিত। এর শাব্দিক অর্থ 'নিষেধ' বা 'রক্ষা'। আরবী কথায় বলা হয় عَصَمْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ অর্থাৎ 'আমি তাকে খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছি'। عَصَمْتُهُ عَنِ الْكَذِبِ 'তাকে আমি মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছি, মিথ্যা বলা থেকে বিরত রেখেছি'। 'মিথ্যা থেকে তাকে রক্ষা করেছি।'

কুরআন মজীদে হযরত নূহ–এর পুত্রের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছেঃ

سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ـ (هود ، ٤٣)

আমি শীগগীর কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিব, তা আমাকে বন্যার পানি থেকে রক্ষা করবে।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ط (يوسف ، ٣٢)

নিশ্চয়ই আমি নিজে তাকে ডুবাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে আত্মরক্ষা করে নিষ্পাপ রয়ে গেছে।

হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে এ হচ্ছে আজীজের স্ত্রীর সাক্ষ্য ও নিজের গুনাহের স্বীকারোক্তি।

একটি সহীহ হাদীসে রাসূলে করীম (স)–এর কথা এ ভাষায় বর্ণিত হয়েছেঃ

أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ..... فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ـ (بخارى، مسلم)

আমি লোকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ – মেনে নিবে। তা যদি তারা মেনে নেয় তাহলে তারা তাদের রক্ত ও ধন–মাল আমার থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের দাবিতে কিছু নেয়া হলে স্বতন্ত্র কথা। আর তার হিসাব আল্লাহ্‌র উপরই বর্তাবে।

এ হাদীসে عَصَمُوْا অর্থ নিরাপদ করে নিল, বিপদমুক্ত করল, ক্ষয় বা ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করল।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ নিষ্পাপতা (عصمة) কে নিষ্পাপতা বলা হয় এজন্য যে তা মানুষকে পাপ কার্য করতে নিষেধ করে।

আর ইসলামী শরীয়াতে عصمة অর্থঃ

حِفْظُ اللّٰهِ لِاَنْبِيَاءِهٖ وَرُسُلِهٖ عَنِ الْوُقُوْعِ فِى الذُّنُوْبِ وَالْمَعَاصِىْ وَارْتِكَابِ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمُحَرَّمٰتِ ـ

গুনাহ, পাপ, নাফরমানীর কাজে জড়িয়ে পড়া এবং নিষিদ্ধ–ঘৃণ্য–খারাপ ও হারাম কাজ করা থেকে নবী–রাসূলগণকে আল্লাহ্ তা'আলার রক্ষা করা।

এরূপ সংরক্ষণ কেবলমাত্র নবী–রাসূলগণের জন্যই নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা এরূপ গুণ–বৈশিষ্ট্য কেবল তাঁদেরকেই দান করেছেন, তাঁদেরকেই এই বিশেষ গুণ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মহা সম্মানিত করেছেন, সমগ্র মানুষ থেকে তাঁদের বিশিষ্ট বানিয়েছেন, সম্পূর্ণ ভিন্নতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। গুনাহ–নাফরমানী থেকে আল্লাহ্‌র বিশেষ সংরক্ষণ লাভের এই মর্যাদা ও সম্মান কেবলমাত্র নবী–রাসূলগণেরই রয়েছে। নবী–রাসূলগণ ছাড়া এই গুণ–বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব সৃষ্টিজগতে আর কারোরই নেই, আর কারোরই তা প্রাপ্য নয়।

নবী–রাসূলগণ এই সংরক্ষণ লাভ করেন কেবল বড় বড় (কবীরাহ) গুনাহ থেকেই নয়, ছোট ছোট (সগীরা) গুনাহ্ থেকেও তাঁরা এই সংরক্ষণ লাভ করেন। ফলে তাঁদের

দ্বারা কোন গুনাহ—আল্লাহ্‌র একবিন্দু না-ফরমানী সংঘটিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আল্লাহ্‌র কোন আদেশ-নিষেধের একবিন্দু বিরুদ্ধতা তাঁদের দ্বারা কখনই সংঘটিত হতে পারে না। তাঁদের ছাড়া দুনিয়ার অপর কোন ব্যক্তি বা মানব শ্রেনী এই সংরক্ষণ পেতে পারে না।

এর অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে মানুষের সম্মুখে আল্লাহ্‌র পূর্ণমাত্রার বান্দাহ রূপে ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ যথাযথ ও পুরাপুরি পালনের বাস্তব প্রতীক হিসাবে পেশ করেছেন এবং সর্বসাধারণ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন—কথা ও কাজ সর্বদিক দিয়ে তাঁদেরই অনুসরণ করতে। এক্ষণে তাঁদের পক্ষেই যদি গুনাহ-নাফরমানীর মধ্যে কার্যতঃ জড়িয়ে পড়া সম্ভব হয়, তাঁদের পক্ষেই পাপ কাজ করা সম্ভব হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও পাপ কাজ শরীয়াতসম্মত বিবেচিত হতে পারে। মানুষ তো তাঁদেরকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। তাঁরা কোন মুহূর্তে পাপ-নাফরমানী করলে—করতে পারলে সাধারণ মানুষ তাকেই নিদর্শন বানিয়ে সর্বক্ষণ পাপ-নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তখন আর তাদেরকে সে নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখা কোনক্রমেই সম্ভব হবেনা। অথবা তখন আর আমরা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করতে পারব না, করা কর্তব্য (ওয়াজিব বা ফরয) হবে না। আর তাহলে সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইসলামী আদর্শ পালন কোন লোকই করবে না। সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে ভরে যাবে। আর তাহলে আল্লাহ্‌র মানুষ সৃষ্টি এবং এই সীমাহীন বিশ্বলোক সৃষ্টিই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যেত। কিন্তু তা কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

তাছাড়া নবী-রাসূলগণ মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পবিত্র 'ওহী' গ্রহণ ও ধারণ করেন। নিষ্পাপ ফেরেশতাই তাঁদের নিকট সে 'ওহী' বহন করে নিয়ে আসে। এই ফেরেশতার মাধ্যমেই বস্তু-উর্ধ্ব জগতের সাথে তাঁদের নিবিড়-গভীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র একবিন্দু নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে কখনই সম্ভব হতে পারে না।

উপরন্তু আল্লাহ্‌র নাফরমানী হচ্ছে ঘৃণ্য মলিনতা, অপবিত্রতা। মন-মানসকে তা মলিনতা-পংকিলতায় কলুষিত করে দেয়। তা নবী-রাসূলগণের আত্মা—মন-মানস ও চরিত্রকে স্পর্শ মাত্রও করতে পারে না। নবী-রাসূলগণ চোর হতে পারেন না, ডাকাত হতে পারেন না, মদ্যপ হতে পারেন না, ব্যাভিচারী হতে পারেন না, পরাস্বাপহরণকারী হতে পারেন না।

অতএব বলা যায়, শরীয়াতের অকাট্য দলীল এবং সাধারণ যুক্তি—সর্ব দিক দিয়েই প্রমাণিত যে, নবী-রাসূলগণ অবশ্যই 'মা'সুম' (معصوم) গুনাহমুক্ত হবেন।

নবী-রাসূলগণ সাময়িকভাবে ভুল করতে পারেন, যাদু প্রভাবিতও হতে পারেন

নবী-রাসূলগণ মা'সুম,বেগুনাহ, একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কিন্তু তার অর্থ কখনই এই নয় যে, তাঁরা মানবীয় প্রকৃতি (Nature)-ই হারিয়ে ফেলেন। মানুষ স্বভাবতঃই ভুল-ভ্রান্তির প্রকৃতিসম্পন্ন। মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ও উদ্যম-উদ্যোগ কোন কোন সময় দুর্বলও হয়ে পড়তে পারে, এ যেমন সত্য, তেমনি সাময়িক ক্রোধ বা অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়েও নবী-রাসূল এমন কোন কাজ করে বসতে পারেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা—যিনি সেই নবী-রাসূলগণকে নিযুক্ত করেছেন—পছন্দ করেন না। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা সঙ্গে সঙ্গেই তার সংশোধন করে দেন। সে ভুলকে স্থায়ী হয়ে থাকতে দেন না, বরং সে ভুলের প্রতিক্রিয়া বা পরিণতিকে মুছে ফেলেন, নিশ্চিহ্ন করে দেন। কোন কোন সময় আল্লাহ্ নিজেই নবী কর্তৃক কোন ধরনের ভুল ঘটিয়ে তাঁরা যে মানুষ—মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন, তা দেখিয়ে থাকেন না, এমন কথা বলা যায় না। ফলে তাতে নবী ও রাসূলের যেমন কোন গুনাহ হয় না, তেমনি সেই ভুলের উপর তাঁরা স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েও থাকেন না।

নবী-রাসূলগণ যে কিছু সময়ের জন্য হলেও ভুল করতে পারেন, আল্লাহ্র ভালোভাবে বলে দেয়া স্পষ্ট কথাও ভুলে যেতে পারেন, তার সর্বপ্রথম এবং অতিবড় প্রমাণ হচ্ছে, স্বয়ং হযরত আদম (আ) ও হাওয়া নির্দেশিত বৃক্ষের নিকটেও যাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্র স্পষ্ট নিষেধ বাণীও ভুলে গিয়েছিলেন। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গীতে ও বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে বলা হয়েছে। সূরা ত্ব-হা'য় বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۔ (طٰه : ١١٥)

আমরা ইতিপূর্বে আদমকে একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা ভুলে গেল এবং আমরা তার মধ্যে কোন দৃঢ় সংকল্প পাইনি।

হযরত আদম (আ) আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজটি করেছিলেন শয়তানের অসঅসায়। আল্লাহ্র আদেশ ছিল নির্দেশিত বৃক্ষটির নিকটেও যাবেনা। কিন্তু শয়তান তার এক বন্ধুর বেশ ধারণ করে এক উন্নত অবস্থার—চিরন্তন জীবন ও চিরস্থায়ী রাজত্বের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত করল। তিনি শয়তানের এই প্রলোভন-আক্রমণের সমুখে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। তাঁর নীতিবিচ্যুতি ও পদস্খলন ঘটল। কিন্তু এই নীতিবিচ্যুতি ও পদস্খলন সত্ত্বেও তিনি মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান হারান নি, তাতে বিন্দুমাত্র পার্থক্যও ঘটেনি। আল্লাহ্র হুকুম পালনের বাধ্যবাধকতার কথাও তিনি মুহূর্তের তরেও ভুলে যান নি। কেবলমাত্র এক উপস্থিত আবেগ—যা শয়তানী প্ররোচনার ফলে তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল—তাঁর উপর এক বিভ্রান্তি ও ভুলের

আচ্ছাদন চাপিয়ে দিয়েছিল। তার আত্মসংযমের গ্রন্থি ঢিলা ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। তিনি আল্লাহ্নুগত্যের উচ্চতম মর্যাদা থেকে নাফরমানীর নিম্নতম পংকে পড়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর এই অবস্থাকে 'ভুলে যাওয়া' ও 'সংকল্পের অভাব' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই কথাকেই তিনি বলেছেন এ ভাষায় ঃ ..وَعَصَىٰٓ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى 'আদম তার রব্-এর নাফরমানী করল এবং সত্য সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।'

কিন্তু তারপর-ই আল্লাহ্ বলেছেনঃ

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى - (طٰهٰ، ۱۲۲)

অতঃপর তার রব্ তাকে বাছাই করে সম্মানিত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে হেদায়েত দান করলেন।

অর্থাৎ শয়তানের মত আল্লাহ্র না-ফরমানীর কারণে তাঁকে দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন না। আল্লাহ্র আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি যে নিম্নতম পংকে পড়ে গিয়েছিলেন, সেখানেও তাঁকে পড়ে থাকতে দিলেন না; রবং তাঁকে তুলে আবার নিজের নিকট মর্যাদাবান করে রাখলেন। তার মূল কারণ এই যে, হযরত আদম পূর্ণ নির্ভীক বা বে-পরোয়া হয়ে নাফরমানী করেন নি, ভুলক্রমে নাফরমানী হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তওবা করেছেন, আল্লাহ্ তাঁর তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

আদম (আঃ) নিজের ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমরা আমাদের নিজেদেরই উপর জুলুম করেছি। এক্ষণে তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি রহমত না কর তাহলে আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ব।

আল্লাহ্ তাঁর এই তওবা ও দোয়া কবুল করেছিলেন। কাজেই আল্লাহ্র নাফরমানী করার অপরাধে তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে এ কথার আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

নবী-রাসূলগণ যে কিছু সময়ের জন্য হলেও যাদু প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারেন, তার বড় প্রমাণ হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে কুরআনেরই ঘোষণা। হযরত মূসা (আ) যখন ফিরাউনের সংগ্রহীত যাদুকরদের সম্মুখবর্তী হলেন তখন তারা জিজ্ঞাসা করলঃ

اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى - (طٰهٰ، ۶۵)

মূসা! তুমি আগে ছাড়বে, না আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করব?

মূসা (আ) বললেনঃ 'তোমরাই আগে ছাড়।'

কিন্তু প্রথমে ফিরাউনের যাদুকররা যখন তাদের যাদু নিক্ষেপ করল, তখন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল? কুরআন মজীদই বলছেঃ

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ - فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ -

(طه ٦٦-٦٧)

সহসা তাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠিগুলি তাদের যাদুর জোরে দৌড়াচ্ছে বলে মূসার মনে হলো। ফলে মূসা নিজ মনে ভয় পেল।

এইরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেনঃ

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ - وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ -

(طه: ٦٨-٦٩)

ভীত হয়ো না, তুমি–ই জয়ী হবে। নিক্ষেপ কর যা তোমার হাতে আছে। তা এখনই ওদের বানোয়াট জিনিসগুলি গিলে ফেলবে। ওরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, তা যাদুকরের প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। আর যাদুকর কখনই সফলকাম হতে পারে না, তারা যত হাঁক করেই আসুক না কেন।

সূরা আল–আরাফ–এ বলা হয়েছেঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ - (الاعراف: ١١٦)

তারা যখন যাদুজাল নিক্ষেপ করল, তখন লোকদের চোখকে যাদু প্রভাবিত করে দিল এবং তাদেরকে ভীত–সন্ত্রস্ত করে তুলল।

এ আয়াতে সাধারণ লোকদের যাদু প্রভাবিত ও তদ্দরুণ ভীত–সন্ত্রস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর উপরে উল্লেখিত আয়াতে হযরত মূসা (আ)–এর নিজের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত মূসা মহিমান্বিত নবী–রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি যাদুর নিকট সাধারণ মানুষের অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। কেননা তিনি আল্লাহ্র নবী–রাসূল হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মানবীয় স্বাভাবিকত্ব থেকে মুক্ত হননি। তবে তাঁর সে অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে দেয়া হয়নি। কেননা তিনি আল্লাহ্র মহান নবী ও রাসূল ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যাদু নবীর নবুয়্যাত হরণ করতে বা যাদুর প্রভাব তাঁকে গুমরাহ করতে পারে না। খোদ

রাসূলে করীম (স)-এর উপরও যাদু করা হয়েছিল এবং তার প্রভাবে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত দৈহিকভাবে কষ্ট পেয়েছেন।

যাদুর প্রভাব সম্পর্কে এই অকাট্য প্রমাণের পর একথা মেনে নিতে কোন অসুবিধা নেই যে, নবী-রাসূলগণ সাময়িকভাবে ভুলও করতে পারেন। খোদ কুরআনেই তার প্রমাণ রয়েছে।

হযরত ইউনুস (আ)-এর কিস্সা তো সকলেরই জানা। তিনি ইরাকের নি-নাওয়ার এলাকায় প্রেরিত হন এবং লোকদেরকে তওহীদের দাওয়াত পেশ করেন। লোকেরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। তিনি আযাব নাযিল হওয়ার ভয় দেখালেন। বললেন, তিন দিনের মধ্যে আযাব এসে যাবে। তৃতীয় দিন আযাবের সমস্ত লক্ষণ পুঞ্জীভূত হয়ে এল। লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করল যে, হযরত ইউনুস (আ)-এর ওয়াদা পূর্ণ হতে চলেছে। তারা সকলে ভয়ে বসতির বাইরে চলে এল, সাচ্চা দিলে তওবা করল, রহম চেয়ে কাতর কণ্ঠে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আযাব প্রত্যাহার করে নিলেন। হযরত ইউনুস (আ) ঘোষিত সময়ে আযাব না আসার কারণে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে ও আমাকে হত্যা করবে। এই সময় তিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন ওহী আসার অপেক্ষা না করেই ক্রুদ্ধ হয়ে পালিয়ে গেলেন।[১] পরবর্তী অবস্থায় আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা না করে নবীর পক্ষে নিজের নিয়োগস্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া আল্লাহ্র পছন্দ হয়নি। বলতে গেলে এটা তাঁর মানবীয় ভুল পর্যায়ে গণ্য। কেননা নবী শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দ্বীনী দাওয়াতের দায়িত্ব পালনে রত থাকেননি। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তিনি নিজস্ব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হিজরাত করে চলে গেছেন। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

আর মাছওয়ালাকেও আমরা ধন্য করেছি। স্মরণ কর, সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল আর মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাকে ধরকে সক্ষম হব না। শেষ পর্যন্ত সে অন্ধকারের মধ্যে থেকে কাতর কণ্ঠে এই বলে ডাকল; 'নেই কোন মা'বুদ তুমি ছাড়া—হে আল্লাহ—পবিত্র মহান তোমার সত্তা। আমি অবশ্যই জুলুমকারীদের একজন।

আযাব আসা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়াই স্থানত্যাগ করে চলে যাওয়াই ছিল তাঁকে আল্লাহ্র পাকড়াও করার একমাত্র কারণ। পরে তিনি নৌকায় সমুদ্র পার হওয়ার সময় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেই আল্লাহ্র হুকুমে বড় একটি মাছ তাঁকে গ্রাস করে। সেই মাছের পেট ও সমুদ্রের

١. لغات القرآن ج ٢ ص ٣٢٠

তলদেশ—এই দুই প্রকারের অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থেকে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট স্বীয় দোষ স্বীকার করেন এবং গুনাহের মাগফিরাত কামনা করেন। পরে আল্লাহ্‌ তাঁকে সমুদ্র ও মাছের গর্ভ থেকে মুক্তি দেন। বলেছেনঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ - (الانبياء: ٨٨)

অতঃপর আমরা তার দোয়া কবূল করলাম এবং দুঃখ–কষ্ট থেকে তাকে মুক্তি দিলাম। আর আমরা ঈমানদার লোকদের এমনি করেই মুক্তি দিয়ে থাকি।

নবী হওয়া ও আল্লাহ্‌র বড় প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যখন তাঁর দ্বারা মানুষোপযোগী অপরাধী হয়ে পড়ল, তখন আল্লাহ্‌ তাঁকে খাতির করলেন না, বরং সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের শস্তি দিলেন। কিন্তু অপরাধী যখন ক্ষমা চায় তখন ক্ষমা করাই আল্লাহ্‌র স্থায়ী নিয়ম।

রাসূলে করীম (স) কোন কোন উম্মুল মুমিনীনের কথায় অভিমান–ক্ষুব্ধ হয়ে সহসাই বলে ফেলেছিলেনঃ আমি এই কাজ আর কখনই করব না। মনে হয়, যে কাজ তাঁর জন্য হালাল ছিল, তিনি সেই কাজটি করবেন না—যেন তা করা হারাম—এইরূপ সংকল্প ঘোষণা করলেন। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেনঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ - (التحريم: ١)

হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহ্‌ যা হালাল করে দিয়েছেন, তুমি তা (নিজের জন্য) হারাম করছ কেন?

বাহ্যতঃ বাক্যটি প্রশ্নবোধক হলেও মূলতঃ তা আল্লাহ্‌র অপছন্দেরই প্রকাশক মাত্র। অর্থাৎ নবী করীম (স)–কে জিজ্ঞাসা করা হয়নি যে, তুমি একাজ কেন করলে? বরং তাঁকে আল্লাহ্‌ সতর্ক করে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র হালাল করে দেওয়া জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার যে কাজটি তাঁর দ্বারা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌ তা'আলার পছন্দ নয়। কেননা আল্লাহ্‌ নিজে যা হালাল করেছেন, তাকে কেউ–ই—এমনকি কোন নবী–রাসূলও হারাম করতে পারেন না। যদিও নবী করীম (স) যে কাজ করবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন, সে কাজকে তিনি হারাম মনে করেন নি, শরীয়াতের দৃষ্টিতেও তিনি সে কাজকে হারাম ঘোষণা করেন নি। শুধু নিজে করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তো কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, আল্লাহ্‌র সর্বশেষ রাসূল ছিলেন। তিনি নিজেই যদি আল্লাহ্‌র হালাল করা কোন জিনিস নিজের জন্যও হারাম করে নেন, তা হলে গোটা উম্মাত তাকে হারাম মনে করে নিতে পারে বলে বড়ই আশংকা হয়েছিল। অথবা কেউ মনে করে নিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র হালাল করা জিনিসকেও হারাম করা যায়, তাতে কোন দোষ হয় না। এই কারণে আল্লাহ্‌ তাঁর এই কাজ পছন্দ করেন নি এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করে তাঁর এই ভুলের

সংশোধন করে দিলেন। তাঁকে ভুলের উপর স্থায়ী হতে দিলেন না এবং তাঁর দ্বারা কোন গুনাহও হতে দিলেন না।

হযরত মুহাম্মাদ (স) বাল্যকাল থেকেই মা'সুম

হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসাবেই সৃষ্টি করেছিলেন। এই কারণে জন্মকাল থেকেই তিনি সর্বপ্রকারের গুনাহের কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়্যাত লাভ-মুহূর্ত পর্যন্ত কোন সময়ই কোন পাপ কাজে জড়িত হতে দেননি। আর নবুয়্যাত লাভ করার পর এই সংরক্ষণ (عصمة) মুহূর্তের তরেও হারানোর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না; বরং অতঃপর এই 'ইস্‌মাত' অধিকতর দৃঢ়, ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়।

বাল্যকালে একবার তিনি ন্যাংটা হতে যাচ্ছিলেন। সহসাই তিনি অদৃশ্য জগতের নিষেধাবলী শুনতে পান। অপর একদিন কাবা নির্মাণকালে সমবয়সী বালকদের সাথে একত্রিত হয়ে পাথর টানছিলেন। অন্যান্য বালকরা পরিধানের কাপড় খুলে মাথায় দিয়ে নিয়েছিলেন যেন পাথরের চাপে বা ঘষায় মাথায় জখম না হয়। তখন তাঁর চাচা আব্বাস বললেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র তুমিও তোমার পরনের কাপড় খুলে মাথার উপর রেখে নাও। এই আদেশ পেয়ে যখনই কাপড় খুলতে গেছেন অমনি তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।[১]

মনে হচ্ছে, পরিধেয় কাপড় খোলা সংক্রান্ত এই ঘটনা দু' দু'বার ঘটেছিল।

'ইস্‌মাত' নবুয়্যাতের পূর্বে, না পরে?

নবী-রাসূলগণের নিষ্পাপতা তাঁদের নবুয়্যাত লাভের পূর্বে হয়, না পরে এবং তা কেবল কবীরা গুনাহ থেকে, না কবীরা-সগীরা সকল গুনাহ থেকে, এ বিষয়ে ইসলাম-বিশেষজ্ঞ মনীষীগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

কারো কারো মতে নবী-রাসূলগণের 'ইস্‌মাত' (নিষ্পাপতা) কেবল মাত্র নবুয়্যাত লাভের পূর্বেই হয় এবং তারপরও তা স্থায়ী থাকে। কেননা নবুয়্যাত-পূর্ববর্তী ব্যক্তিগত আচার-আচরণ নবুয়্যাত-পরবর্তী জীবনের উপর ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অতএব যিনি নবী ও রাসূল হবেন, তাঁকে বাল্যকাল থেকেই পরিচ্ছন্ন মন-মানসিকতা ও উন্নত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, যেন নবুয়্যাত লাভের পর তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সামান্যও অভিযোগ উঠতে না পারে।

আর আল্লাহ্‌র সকল নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে বাস্তবভাবেও তা-ই দেখা যায়। তিনি উন্নত মন-মানসিকতা ও পবিত্র চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই নবী-রাসূল রূপে মনোনীত করেছেন এবং বাল্যকাল থেকেই তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করেছেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার দুটি ক্ষুদ্রায়তন ঘোষণা উল্লেখ্য।

---

১. السيرة النبوية لابن هشام والتعليق عليها من السهيلي ج۱ ص۱۹۴

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)–কে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ (طه - ٣٩) 'এবং যেন তুমি আমার চোখের উপর (আমার সংরক্ষণ ও পাহারাদারীতে) থেকে তুমি তৈরী হতে ও গড়ে উঠতে পার'। পরে বলেছেনঃ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ (طه - ٤١) 'এবং খুব বেশী বেশী যত্ন নিয়ে আমি তোমাকে গড়ে তুলেছি।' এভাবে নবী–রাসূলগণকে তিনি 'সেরা মানুষ' ও 'সর্বোত্তম সর্বোন্নত মানের মানুষ' বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই তাঁদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ـ (ص، ٤٧)

এবং নিঃসন্দেহে তারা (নবী–রাসূল) আমার নিকট বিশেষ বাছাই–পছন্দ করা সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য।

অতএব নবী–রাসূলগণ বাল্য জীবন থেকে—নবুয়্যাত লাভের পূর্ব থেকেই এবং তারপরও সর্বতোভাবে সংরক্ষিত ও মা'সুম (নিস্পাপ, বেগুনাহ্) লোক। এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

অপর কিছু লোকের মত হচ্ছে, নবী–রাসূলগণ 'মা'সুম' হন নবুয়্যাত লাভের পর, তার পূর্বে নয়। তখন তাঁরা সগীরা–কবীরা উভয় প্রকারের গুনাহ থেকেই মুক্ত ও পবিত্র থাকেন। কেননা মানুষ তাঁদের নবুয়্যাত লাভের পর–ই তাঁদের অনুসরণ করতে আদিষ্ট, নবুয়্যাত–পূর্ববর্তী জীবনে তাঁদের অনুসরণ করার কোন প্রশ্নই নেই। আর তাঁরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী লাভ করেন, তখই তাঁরা নবী রূপে বরিত হয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। তার পূর্বে তাঁরা সাধারণ মানুষের মতই। তবে নবুয়্যাতের পূর্বেও তাঁরা সাধারণ গুনাহ–খাতা থেকে পবিত্র থাকেন তাঁদের স্বাভাবিক প্রকৃতির কারণে। কিন্তু তাকে 'নবুয়্যাত' পর্যায়ের 'ইস্‌মাত' বলা যায় না।

আল–উস্তাদ আবদুর রহমান আল–হাবান্নাকাহ লিখেছেনঃ

'নবীর নবী রূপে বরিত হওয়ার পূর্বে দুটি অবস্থা হতে পারেঃ(১) হয় তিনি কোন শরীয়াত পালনে বাধ্য,—তাহলে এই সময় তাঁর 'ইস্‌মাত' আলোচ্য বিষয় নয়। কেননা গুনাহ–খাতার হিসাব তো শরীয়াত পালনে বাধ্য হওয়ার পরবর্তী ব্যাপার। যদি মনে করা হয় যে, তিনি কোন শরীয়াত পালনে তখন বাধ্য (مُكَلَّفْ) নন, তাহলে সেই সময় তিনি মা'সুম ছিলেন কি ছিলেন না, তা এক অবান্তর প্রশ্ন। তবে নবীর নিজস্ব স্বভাবগত পরিচ্ছন্ন মন–মানসিকতা, উন্নত আত্মা, বিবেক–বুদ্ধির সুস্থতা–স্বচ্ছতার কারণে গোটা সমাজের মধ্যে তিনি আদর্শ ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিভাত হন। তাঁর আচার–আচরণ, স্বভাব–চরিত্র, পারস্পরিক আদান–প্রদান, সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি সবই উন্নত হয়, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সকল প্রকার হীন ও নীচ কার্যকলাপ থেকে স্বভাবতঃই তিনি পবিত্র থাকেন। (২) না হয়, কোন পূর্ববর্তী রাসূল উপস্থাপিত শরীয়াত পালনে নবুয়্যাত–পূর্ববর্তী জীবনেও তিনি বাধ্য (مكلف) হবেন। যেমন হযরত লূত (আ)

তাঁর চাচা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপস্থাপিত শরীয়াত পালনে নবুয়্যাত পূর্বেও বাধ্য ছিলেন। বনী-ইসরাঈল বংশের নবী-রাসূলগণও তা-ই ছিলেন। তাঁদের নিজেদের 'ওহী' লাভের পূর্বেও তাঁরা অপর কোন নবী প্রবর্তিত শরীয়াত পালনে বাধ্য ছিলেন। এই সময়ে তাঁদের 'মা'সুম' থাকার পর্যায়ে শরীয়াতে অকাট্য কোন দলীল নেই। তখন সগীরা-কবীরা কোন প্রকারের গুনাহ থেকেই পবিত্র থাকার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা চলেনা। তবে এ পর্যায়ে নবী-রাসূলগণের জীবন-চরিত প্রকাশ করে যে, এই সময়ও তাঁরা সকল প্রকারের গুনাহ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছেন। সগীরা কিংবা কবীরা—কোন গুনাহে-ই তাঁরা জড়িত হননি।[১] যদি এই সময়ে তাঁদের কারো দ্বারা কোন গুনাহ হয়েছে বলে দেখাও যায়, তবু সে জন্য তাঁকে কিছু মাত্র অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। কেননা সেটিকে একটি বিরল ঘটনা বলেই মনে করতে হবে, যা মানুষ মাত্রের দ্বারাই সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়।

নবী-রাসূলগণের কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত ও পূত-পবিত্র থাকার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐকমত্য হওয়ার পরও প্রশ্ন উঠেছে সগীরা গুনাহ সম্পর্কে। কোন সগীরা গুনাহ কি তাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব? এই পর্যায়ে জমূহর ফিকাহ্‌বিদগণ মত দিয়েছেন যে, তাঁরা কবীরা গুনাহের ন্যায় সগীরা গুনাহ থেকেও মুক্ত ও পবিত্র। কেননা আমরা—সর্বসাধারণ মানুষ—তো তাঁদের সকল প্রকার কার্যাবলীরই অনুসরণ করতে আদিষ্ট। এই আদেশ শর্তহীন। এমতাবস্থায় তাঁদের দ্বারা সগীরা গুনাহ হতে পারে মনে করলে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।[২]

আহলি সুন্নাতের প্রখ্যাত আলিম আবু ইসহাক আল-ইসফ্রায়েনী বলেছেনঃ নবী-রাসূলগণ দ্বারা কোন প্রকারেরই গুনাহ হয় না। কেননা তাঁরা সগীরা-কবীরা সকল প্রকারের গুনাহ থেকেই পবিত্র। এটা তাঁদের 'মু'জিজার' অকাট্য দলীলের ঐকান্তিক দাবি। কোন কোন লোক তাঁদের দ্বারা সগীরা গুনাহ হওয়ার পর্যায়ে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে, নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে তা-ও জায়েয নয়।[৩]

শেষের দিকের (মুতায়াখ্-খিরীন) মনীষীগণের কেউ কেউ বলেছেনঃ

'নবী-রাসূলগণের দ্বারা কোন কোন গুনাহের কাজ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই জানিয়েছেন। সে জন্য তিনিই তাঁদের 'তিরস্কার (عتاب) করেছেন। সে ব্যাপারে তাঁদেরকেও তিনি জানিয়েছেন, তা থেকে দূরে সরে থাকতে সঙ্গে সঙ্গেই তাম্বীহ করেছেন। তাঁরা তাম্বীহ পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছেন, সঙ্গে

১. العقيدة الاسلامية واسسها

২. الجامع لاحكام القرآن للقرطبي

৩. النبوة والانبياء للصابوني ص ٥٥

সঙ্গেই তওবা করেছেন। এই ব্যাপারগুলি বহু ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছে। ফলে তা অস্বীকার করা যায় না, তার কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যাও দেয়া চলেনা। তবে সেগুলি মানবীয় ভুল–ভ্রান্তি পর্যায়ের। তাতে তাঁদের মহান পবিত্র নবুয়্যাত ও রিসালাত–এর মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। তবে সেগুলি এমন যে, অন্যদের ক্ষেত্রে তা حسنات অতীব উত্তম কাজ বলে গণ্য হতে পারে, যদিও তাঁদের বেলায় তা سيئات 'খারাপ কাজ'। জুনাইদ বাগদাদী বলেছেনঃ حسنات الابرار سيئات المقربين 'উচ্চ মানের নেক লোকদের অনেক ভালো কাজই এমন, যা আল্লাহ্‌র অতীব নিকটবর্তী লোকদের জন্য তা–ই খারাপ রূপে গণ্য'।

ইমাম কুরতুবী বলেছেনঃ এই কথাটি সত্য। এই নবী–রাসূলগণের দ্বারা গুনাহ হয়েছে বলে অকাট্য দলীলের সাক্ষ্য ও প্রমাণ পাওয়া গেলেও বুঝতে হবে যে, তাতে তাঁদের পদ–মর্যাদা কিছু মাত্র ক্ষুন্ন হয়নি; বরং তার প্রতিবিধান সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা থেকে তাঁদেরকে পবিত্র করে নিয়েছেন, তাঁদের পরিচ্ছন্ন করেছেন, হেদায়েত প্রাপ্ত বানিয়েছেন।[৪]

নবী–রাসূল ব্যতীত আর কেউ মাসুম হতে পারে?

নবী–রাসূল ছাড়া আর কেউ মা'সূম—গুনাহ–খাতা থেকে পবিত্র, সংরক্ষিত হতে পারেন বলে কোন প্রমাণ নেই। কেননা তাঁদের ছাড়া অন্যরা সকলেই সাধারণ মানুষের পর্যায়ে গণ্য। আর তারা ভুল–ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না, গুনাহে পড়া থেকে তারা সংরক্ষিত–ও নয়। তবে আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন 'ওলী'কে কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত রেখে থাকতে পারেন। রেখে থাকলে তা তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের ব্যাপার বলতে হবে। কিন্তু তা সেই 'ইস্‌মাত' কক্ষণই নয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে নবী–রাসূলগণকে দিয়েছেন। কুরআন মজীদের আয়াতঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔ (الحديد ۲۸)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে ইহ–পারকালে দ্বিগুন বা অব্যাহত রহমাত দান করবেন এবং তোমাদের জন্য এমন একটি আলো বানিয়ে দিবেন, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে পারবে। তিনি তোমাদের গুনাহও মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ্ তো অতীব ক্ষমাশীল, অতিশয় অনুগ্রহ দানকারী।

---

৪. الجامع لاحكام القرآن ج ۱ ص ۳۰۸

আয়াতটিতে যে 'নূর'–এর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ, যা আল্লাহ্‌র ওলী ও পরহেজগার–মুত্তাকী লোকেরা লাভ করে থাকেন। এও এক প্রকারের 'সংরক্ষণ' বটে। তবে তা কোনক্রমেই ইস্‌মাত নয়। ফলে তাঁরা কেউ মা'সুম অভিহিত হতে পারে না। কেউ তেমন দাবি করলে তা যে ভিত্তিহীন, তার পক্ষে শরীয়াতের কোন দলীল—কুরআন ও সুন্নাহ—পেশ করা যেতে পারে না, তা জোরের সাথেই বলা যায়। কেননা মানুষ স্বভাবতঃ ভুল–ভ্রান্তিতে সংমিশ্রিত। এ কারণেই ইমাম মালিক (র) মদীনায় রাসূলে করীম (স)–এর কবরের প্রতি ইশারা করে বলেছিলেনঃ

مَا مِنَّا إِلَّا مَنْ رَدَّ وَرُدَّ عَلَيْهِ إِلَّا صَاحِبُ هٰذَا الْقَبْرِ ـ

আমাদের মধ্যেকার প্রত্যেক ব্যক্তিই এমন যে রদ্দ করেছে এবং তার কথা রদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এই কবরে শায়িত ব্যক্তি তেমন নয়।

আর রাসূলে করীম (স)–এর এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অতুলনীয় মর্যাদা কেবল এ জন্যই যে, তিনি ছিলেন 'মা'সূম'।

নবী–রাসূলগণের কি নাফরমানী করার ক্ষমতা রহিত?

এই পর্যায়ে একটি প্রশ্ন তীব্র হয়ে উঠতে পারে। নবী–রাসূলগণ আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক সংরক্ষণ লাভ করেন বলে তাঁদের দ্বারা কার্যতঃ কখনই কোন গুনাহ সংঘটিত হতে পারে না। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণার দলীল ও বিবেক–সম্মত যুক্তির ভিত্তিতে তা অকাট্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নবী–রাসূলগণের গুনাহ করার স্বভাবজাত ক্ষমতাও কি চিরতরে রহিত হয়ে যায়? না, মৌখিকভাবে মানুষ হওয়ার দরুণ স্বাভাবিকভাবে গুনাহ–নাফরমানী করার ক্ষমতা তাঁদেরও থাকে, কিন্তু তাঁরা তা কার্যতঃ করেন না—করতে পারেন না কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সংরক্ষণের কারণে ও তাঁদের নিজেদের হৃদয়ে নিহিত ঈমানী শক্তি ও আল্লাহ্‌র ভয় জেগে উঠার কারণে?

প্রশ্নটি নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবী–রাসূলগণ যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা–রহিতই হন, তাহলে মনে করতে হয়, তাঁরা মানুষের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেন ও ফেরেশতাদের ন্যায় পাপ–নাফরমানীর ক্ষমতা মুক্ত হয়ে পড়েন। তখন তাঁরা এমন অবস্থায় পৌছে যান বা উন্নত হন, যখন তাঁরা আর সাধারণ মানুষের অনুসরণীয় থাকেন না। কেননা সাধারণ মানুষ তো নাফরমানীর ক্ষমতামুক্ত নয়। তারা কি করে এমন সব মহান সত্তার অনুসরণ করতে পারে, যাঁদের পাপ–নাফরমানী করার ক্ষমতাই নেই।

এ প্রেক্ষিতে যে কথাটি কুরআন–সুন্নাহর আলোকে আমাদের সমুখে প্রতিভাত হয়ে উঠে তাহলো, নবী–রাসূলগণ মা'সুম, নিষ্পাপ নিঃসন্দেহে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গুনাহ করার, পদস্খলিত হওয়ার ও ভূল–ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাওয়ার শক্তি ও

যোগ্যতাও হরণ করে নেয়া হয়, যার ফলে তাঁদের দ্বারা গুনাহর কার্যটি আদৌ সম্পাদিত হতে পারে না। —না, এরূপ অর্থ হতে পারে না; বরং সঠিক অর্থ হচ্ছে, নবী–রাসূলগণ যেহেতু মানুষ, তাই গুনাহ্ করার স্বাভাবিক সামর্থ্য তাঁদেরও থাকে। কিন্তু মানবীয় সব স্বাভাবিক গুণের ধারক হওয়া সত্ত্বেও—মানবোচিত প্রবণতা, ভাবধারা, অনুভূতি, উচ্ছাস–আবেগ, কামনা–বাসনা–ক্রোধ ইত্যাদি সব থাকা সত্ত্বেও—তাঁরা এমন পবিত্র আত্মা ও আল্লাহ্র ভয়ে সদা কম্পমান থাকেন যে, জেনে বুঝে—সচেতন অবস্থায় কোন গুনাহ করার ইচ্ছা তারা কখনই করেন না এবং কার্যতঃ গুনাহ্ তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হয় না। তাঁরা নিজেদের বিবেকে এমন জবরদস্ত দলীল–প্রমাণ অনুভব করেন, যার দরুণ তাদের নফ্স কখনই কুপ্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করতে পারে না। তবে অজ্ঞাতসারে বা বেখেয়ালীতে পড়ে কারো যদি কখনও কোন পদস্খলন ঘটেও যায়, তাহলে তখন অবিলম্বেই স্পষ্ট ওহী নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিবৃত্ত করেন ও কার্যতঃ পাপ থেকে দূরে সরিয়ে নেন। কেননা নবীর পদস্খলন একাকী নবীর পদস্খলনই নয়, তা একটি গোটা উম্মাতের পদস্খলনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নবী যদি সত্য দ্বীন থেকে একবিন্দু পরিমাণও সরে যান, তাহলে সারা দুনিয়া গুমরাহীর অতল তলে তলিয়ে যাবে।

এই কথাটি আমি বুঝতে পেরেছি কুরআন মজীদের হযরত ইউসুফ (আ) সংক্রান্ত একটি বর্ণনা ভঙ্গী থেকে—যাতে বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۔ (يوسف، ٢٤)

সে (স্ত্রী লোকটি) ধীরে ধীরে অগ্রসর হল তার (ইউসুফের) প্রতি এবং সে (ইউসুফ)–ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হত তার (স্ত্রী লোকটির) দিকে যদি না সে তার রব্–এর সুস্পষ্ট দলীল দেখতে পেত।'

অর্থাৎ যে কামাগ্নিতে স্ত্রী লোকটি দগ্ধ হচ্ছিল ও হযরত ইউসুফের (আ) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তা হযরত ইউসুফের মধ্যেও বর্তমান ছিল। তিনি তাতে প্রভাবিত হয়ে স্ত্রীলোকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতেন যদি না আল্লাহ্র বুরহান—দলীল—দেখতে পেতেন। তাঁর ভেতরে যৌন আকর্ষণই ছিল না, একথা কিন্তু কুরআন বলছেনা।

শুধু তা–ই নয়। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পূর্বে হযরত ইউসুফ (আ) যে সব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর এই কথাটিও ছিল, যা কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ۚ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(يوسف، ٥٣)

আমি নিজের নির্দোষিতার কথা কিছুই বলছিনা। নফ্স তো অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করতেই থাকে। অবশ্য বাঁচতে পারে কেবল সে, আমার রব্ যার প্রতি যতটা রহমাত দান করেন। আমার রব্ বস্তুতঃই বড় ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াময়।

হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহ্র নবী হওয়ার পরও তিনি মানুষই রয়েছেন। তাই তাঁর 'নফ্স' নামক রিপুটি রয়ে গেছে—বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, হরণ-ও করা হয়নি এবং তা তাঁর কাজ করতেই থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, নবী-রাসূলগণ নাফরমানী করার শক্তি-রহিত হন না। শক্তি থাকেই; কিন্তু আল্লাহ্র বিশেষ রহমাতের সংরক্ষণে সে শক্তি কার্যতঃ কখনই ব্যবহৃত হয় না।

হযরত ইউসুফ (আ) নবী হয়েও গুনাহ করার স্বভাবসিদ্ধ শক্তি-বঞ্চিত ছিলেন না, তা তাঁর সেই কাতর প্রার্থনা থেকেও প্রমাণিত হয়, যা তিনি আজীজের বেগমের দম্ভপূর্ণ উক্তি

وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ - (يوسف، ٣٢)

সে আমার আদেশ মত কাজ না করলে তাকে কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিত হবে।

একথা শোনার পর আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করেছিলেন এই বলেঃ

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ - (يوسف، ٣٣)

হে আমার রব্! ওরা যে দিকে আমাকে ডাকে তার তুলনায় কয়েদখানাই আমার নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়। হে আল্লাহ্! তুমি-ই যদি ওদের ষড়যন্ত্র আমার দিক থেকে ফিরিয়ে না দাও, তাহলে আমি ওদের ষড়যন্ত্রজালে জড়িয়ে পড়ব এবং জাহিলদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব।

এই কথা তার পক্ষেই বলা শোভন, যার মধ্যে গুনাহ করার শক্তি-সামর্থ্য আছে বটে; কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও তাঁর ভয়-ই তাঁকে তা থেকে বিরত রেখেছে। সে নিজেও তা থেকে বিরত থাকতে চাচ্ছে এবং সে জন্য সে কাতর কণ্ঠে আল্লাহ্র সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু গুনাহ করার শক্তিই যদি না থাকে, তাহলে তার গুনাহর মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয়ে এতটা কাতর হওয়ার কোনই কারণ থাকতে পারে না।

কাজেই একথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, নবী-রাসূলগণের 'মা'সূম' হওয়া অর্থ কখন-ই এই নয় যে, তাদের গুনাহ ও নাফরমানী করার ক্ষমতাই নেই; বরং তার যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে, তাঁরা মানুষ বলে শক্তি ও ক্ষমতা তো আছে; কিন্তু তাঁরা নিজেরা

ইচ্ছা করে কখনই তা করেন না, তাতে জড়িয়ে পড়ার মত কঠিন অবস্থা দেখা দিলেও আল্লাহ্ তাঁদের তা থেকে বাঁচিয়ে দেন।

আল্লাহ্‌র নিকট নবী–রাসূলের স্থান

নবী–রাসূলগণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র কর্তৃক নিয়োজিত। আর যে লোক যখনই আল্লাহ্ কর্তৃক নবী ও রাসূল হিসাবে নিয়োজিত হন, তখন থেকেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহ্‌রই একান্ত অনুগত হয়ে থাকতে হয়। তাঁর নিজ ইচ্ছামত কিছু করার ইখতিয়ার থাকে না, আল্লাহ্‌র আদেশ–নিষেধ ও মর্জীর বিপরীত কিছু করারও কোন অধিকার থাকেনা তাঁর। আল্লাহ্ তাঁকে যে বাণী দেন, তা তাঁকে নিজে পালন করতে হয় এবং অন্যদের নিকট তা যথাযথভাবে পৌছাতেও হয়।

জনগণের ইচ্ছার অনুসরণ করা বা জনগণের দাবি অনুযায়ী কোন মু'জিজার সৃষ্টি করারও কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ (الرعد ٣٨)

কোন রাসূলেরই এই শক্তি ছিল না যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকেই কোন নিদর্শননিজেই দেখিয়েদিবে।

বস্তুতঃ নবী–রাসূলগণ মু'জিজা দেখিয়েছেন। হযরত মূসা (আ) শ্বেতহস্ত ও যষ্ঠির মু'জিজা দেখিয়েছেন। সালেহ নবী (আ) উষ্ট্রীর নিদর্শন দেখিয়েছেন। হযরত ঈসা নবী (আ) অন্ধদের চক্ষুষ্মান ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করার মু'জিজা দেখিয়েছেন। কিন্তু যিনি যা–ই দেখিয়ে থাকুন, তা কেউ–ই নিজের ক্ষমতা বলে দেখান নি, দেখাবার সাধ্য নিজস্বভাবে কারোরই ছিল না; বরং আল্লাহ্ যখন যার দ্বারা যা কিছু প্রকাশ করার উপযোগী মনে করেছেন, তখন তিনিই তার দ্বারা তা প্রকাশ করিয়েছেন। নবী–রাসূলগণ খোদায়ী শক্তির ধারক হন না। তাঁরা নিজ ইচ্ছামত কিছু বলতে পারেন না। যেমন আল্লাহ্ নিজেই হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বলেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ـ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ـ (النجم: ٣-٤)

রাসূল নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা সেই ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তার নিকট নাযিল করা হয়।

সেই ওহীকে অনুসরণ করে চলা–ই হয় রাসূলের জীবনের একমাত্র কর্তব্য। রাসূলের জবানীতে বলা হয়েছেঃ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ ـ (الانعام: ٥٠)

আমি অনুসরণ করে চলি কেবল সেই বিধানের, যা আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়।

নবী যেমন গায়েব–এর ইলম জানেন না, তেমনি তিনি আল্লাহ্‌র ধন–ভান্ডারেরও মালিক–মুখতার হয়ে যান না। রাসূলে করীম (স)–এর জবানীতেই বলা হয়েছেঃ

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ـ

(الانعام : ٥٠)

হে নবী, আপনি জানিয়ে দিনঃ আমি তো বলিনা যে, আল্লাহ্‌র ধন–ভান্ডার আমার নিকট রয়েছে, আমি তো গায়েবও জানিনা, এ–ও বলিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা।

অর্থাৎ যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত নবী বা রাসূল হন, তিনি যেমন ফিরেশতা হয়ে যান না—একজন মানুষই থাকেন, তিনি গায়েবী ইলম–এরও নিজস্বভাবে ধারক হন না, তেমনি তিনি আল্লাহ্‌র বিশাল–অশেষ ধন–ভান্ডারেরও অধিপতি হন না; বরং একজন আল্লাহ্–অনুগত বান্দাহ হয়েই থাকেন তিনি। তিনি মানুষের কামনা–বাসনা অনুসরণ করেও কোন কাজ করার অধিকারী হন না; বরং এ ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্‌র দিক দিয়ে অত্যন্ত নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হন। এ দিক দিয়ে আল্লাহ্ রাসূল (স)–কে অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেছেনঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا وَاقٍ ـ

(الرعد : ٣٧)

এখন যদি তুমি তোমার নিকট (ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত) ইলম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও লোকদের খাম–খেয়ালীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তোমার না কোন সাহয্যকারী আছে, না তাঁর পাকড়াও থেকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারে।

এমন কি লোকেরা যখন নবী ও রাসূলকে আল্লাহ্‌র বিধান অনুসরণ ও কার্যকর করণ থেকে বিরত রাখার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, সেই মূহূর্তে নবীর একজন মানুষ হিসাবে তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু তখন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তিনি রক্ষা পেয়ে যান। এই পর্যায়ে আল্লাহ্ নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ـ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ـ (الاسراء : ٧٣)

হে নবী! এই লোকেরা এ চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি রাখেনি যে, তোমাকে ফেতনায় ফেলে সেই ওহী থেকে ফিরিয়ে নিবে যা আমরা তোমার নিকট পাঠিয়েছি, যেন

তুমি আমাদের নামে নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা রচনা করে চালিয়ে দাও। তুমি এরূপ করলে তারা তোমাকে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। এই অবস্থায় অসম্ভব ছিলনা যে, আমরা তোমাকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না রাখলে তুমি তাদের প্রতি হয়ত কিছুটা ঝুঁকে পড়তে।

রাসূল একজন মানুষ ছিলেন বলেই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল না; কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্‌র সংরক্ষণ নীতির কারণেই তিনি রক্ষা পেয়ে যান। আর খোদা-না-খাস্তা ভিন্নরূপ অবস্থা হলে আল্লাহ্ তাঁকে কিছুমাত্র ছেড়ে দিতেন না। বলেছেনঃ

إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔

(الاسراء:৭৫)

কিন্তু তুমি যদি এইরূপ করতে তাহলে আমরা তোমাকে দুনিয়ায়ও দ্বিগুণ আযাবের আস্বাদন করাতাম, আর পরকালেও দ্বিগুণ আযাব দিতাম। অতঃপর আমাদের মুকাবিলায় তুমি কোন সাহায্যকারীও পেতেনা।

বস্তুতঃ নবী-রাসূলগণ যা কিছুই পান, তা একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই পান। তাঁদের নিজেদের কোন কিছুরই ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছায়, অনুগ্রহে যা কিছুই তাঁদের দান করেন, তা-ই হয় তাঁদের একমাত্র শক্তি ও সম্পদ। আবার তিনি দিয়েও তা অতি সহজেই তাঁদের নিকট থেকে কেড়ে নিতে পারেন যদি তা তিনি চান। তিনি নিজেই বলেছেনঃ

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ (الاسراء ৮৬)

হে নবী! আমরা চাইলে সেই সবকিছুই তোমার নিকট থেকে কেড়ে নিতে পারি, যা আমরা ওহীর মাধ্যমে তোমাকে দান করেছি। অতঃপর তা তোমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীও তুমি পাবে না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ কাউকে নবী-রাসূল রূপে মনোনীত করে তাঁর নিকট ওহী পাঠিয়ে তিনি কোনক্রমেই ঠেকে যান না; এমন হন না যে, অতঃপর তাঁকে নবীর ইচ্ছামতই চলতে হবে। তাঁর কোন ক্ষমতা থাকবে না। না, তা নয়; কাউকে নবী বানালে ও তাঁকে ওহী পাঠালেও সেই সব কিছুই কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র থেকেই যায়, তিনি কখনই কিছুমাত্র ঠেকে যান না, অক্ষম হয়ে পড়েন না; কেননা তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সর্বশক্তির একমাত্র আধার—চিরন্তন, শাশ্বত।

বিশ্বনবীর সার্বজনীনতা

দ্বীন–ইসলাম হযরত মুহাম্মদ (স·) উপস্থাপিত দ্বীন। তাঁর এই দ্বীনের দাওয়াতের বহু সংখ্যক দিক রয়েছে। বিস্তীর্ণ তার দিগন্ত ও আয়তন। তার গভীরতা অতলস্পর্শ। সে বিষয়ে কথা বলার ও আলোচনা করার অনেক দিক ও ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও আপাততঃ রসূলে করীম (সঃ)–এর দাওয়াতের একটি মাত্র দিক সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যেই সীমিত থাকতে চাই এবং সেই একটি দিকের উপরই সমগ্র লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করেছি। সে দিকটি হলো, তার দাওয়াতের বিশ্বব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা। কুরআন মজীদেও এ বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

আমরা কুরআনের বিশাল বিস্তীর্ণ পরিমন্ডলে দাঁড়িয়ে তার বিশ্ব–কেন্দ্রিক ঘোষণাবলী শুনতে পাচ্ছি, যদিও তার নাযিল হওয়ার সময়কাল থেকে আমরা অনেক দূরে পৌঁছে গেছি। কুরআন উদাত্ত কন্ঠে ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে, ইসলাম মৌলিকভাবে একটি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস বিশেষ কোন সময়, সমাজ বা জনসমষ্টির জন্য নির্দিষ্ট নয়। বিশেষ কোন শহর, নগর বা দেশের জন্য একান্তভাবে নির্দেশিত নয়। দ্বীন–ইসলাম পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসাবে সকল ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য—জতি, দেশ, কাল, বর্ণ ও ভাষার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন; মানব বংশের সকল পর্যায়ে তা বাস্তবায়িত হওয়ার যোগ্য—কোন প্রতিবন্ধকতাই এ পথ আগলে দাঁড়াতে পারে না। জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রতিবন্ধকতাও তথায় স্বীকৃতব্য হতে পারে না। তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনের ইতিহাস এবং তার বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের ইতিবৃত্তই এর অকাট্য প্রমাণ।

আমরা যখনই হযরত মুহাম্মদ (স·) উপস্থাপিত দ্বীনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি, তখন আমাদের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের কুহেলিকা বিলীন হয়ে যায়। কোনরূপ চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকার ছাড়াই আমরা সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

রাসূলে করীম (স·)–এর দ্বীনী দাওয়াতের প্রথম সূচনা–পর্ব তাঁর বংশ ও পরিবার–পরিমন্ডলের মধ্যেই আবর্তিত। কেননা আল্লাহ্‌ই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۔ (الشعراء ۔ ٢١٤)

'এবং তোমার বংশীয় নিকটবর্তী লোকদের সতর্ক কর'

এই নির্দেশের তাৎপর্য খুবই গুরুত্ববহ। আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দূরবর্তী ও অনাত্মীয় লোকেদের তুলনায় নিকটাত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের বা বংশের লোকদের থেকে অধিক আনুকূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। বিশেষ করে গোত্র-কেন্দ্রিক সমাজ জীবনের সেই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বংশ ও রক্ত সম্পর্কের আপনত্ব বোধের ভাবধারায় এই আনুকূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

রসূলে করীম (স·) তাঁর দ্বীনী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ের সুদীর্ঘ তিনটি বছর কাল পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্য দিয়েই অতিক্রম করেন। এই সময় তিনি যতটা সম্ভব অপ্রকাশ্যভাবে আপন ও নিকটবর্তী লোকদেরকেই ঈমান গ্রহণে আহবান জানাতে থাকেন। সেক্ষেত্রেও তিনি কখনও ইশারা ইংগিত আবার কখনও স্পষ্ট ভাষায় তাঁর এই দাওয়াতের সাধারণত্ব বা বিশ্বজনীনতাকে লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। তিনি বলতে চাইতেন যে, তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট নয়, তা দুনিয়ার সর্বসাধারণ মানুষের জন্য, নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই গ্রহণীয়, অনুসরণীয় যেমন, তেমনি সকলের জন্য কল্যাণকরও। এই মুহূর্তে বিশেষ একটা পরিবেষ্টনীর মধ্যে সীমিত হলেও অচিরেই তা সর্বসাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত ও পরিব্যক্ত হয়ে পড়বে। তখন তা কোন বিশেষ বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না।

রাসূলে করীম (স·) নিজের ঘরে তাঁর চাচা-মামা পর্যায়ের ও সম্পর্কশীল ব্যক্তিদের একত্রিত করে সর্বপ্রথম যে দাওয়াত পেশ করেন, প্রামান্য ইতিহাসে তা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছেঃ

وَاللهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَاِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَاللهِ لَتَمُوْتُنَّ كَمَا تَنَامُوْنَ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُوْنَ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَاِنَّهَا الْجَنَّةُ اَبَدًا وَالنَّارُ اَبَدًا ـ تاريخ الكامل لابن الاثير ج ٢ ، ص ٢١

যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপাস্য ও মাবুদ নেই তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহর রাসূল রূপে বরিত ও নিয়োজিত হয়েছি বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের জন্য। আল্লাহ্র নামে শপথ। তোমরা অবশ্যই মরবে যেমন করে তোমরা নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড় এবং তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, যেমন করে তোমরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠ। তখন তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে। সেই সাথে এ-ও জানবে যে, জান্নাত চিরন্তন, জাহান্নামও স্থায়ী।

অতঃপর কিছু সময়ের অবকাশ হয়ে যায়। এই সময়ে তিনি তাঁর দ্বীনী দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তখন তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দ্বীনী দাওয়াতের দায়িত্বের কথা সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ করে দেওয়ার নির্দেশ পান। সে নির্দেশের ভাষা ছিল এইঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ (الحجر-٩٤)

হে নবী। যে কাজে তোমাকে নির্দেশিত করা হয়েছে, তুমি তা বলিষ্ঠভাবে চতুর্দিকে প্রকাশ ও প্রচার করে দাও এবং শিরক-এ লিপ্ত লোকদের একবিন্দু পরোয়া করো না।

এই নির্দেশ পেয়ে রাসূলে করীম (স·) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী 'সাফা' পর্বতের শিখরে আরোহন করেন এবং উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিতে থাকেনঃ 'হে প্রাতঃকালীন জনতা। আওয়াজ শুনে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী মক্কার জনতা পর্বতের পাদদেশে সমবেত হয়। তাদের সম্বোধন করে তিনি বলেনঃ 'আমি যদি তোমাদের বলি যে, এই পাহাড়ের এ পাশে শত্রু পক্ষের একদল অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে না?[১] উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠলঃ 'আমরা আজ পর্যন্ত তোমার মুখে কোন মিথ্যা কথা শুনতে পাইনি, তোমার ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতাই আমাদের নেই।

এই কথা শুনে নবী করীম (স·) বললেনঃ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّيْ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمِثْلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يُرِيْدُ أَهْلَهُ فَخَشِىَ أَنْ يَسْبِقُوْهُ إِلٰى أَهْلِهِ فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَا صَبَاحَاه وتيتم اوتيتم ـ

(السيرة الحلبية ـ ج ١ ص ٣٢١)

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা। তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আল্লাহ্ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না—কোন কাজেই আসব না। আমিতো কঠিন আযাব আসার আগে-ভাগে

---

(১) পর্বৎ শিখরে দাঁড়িয়ে একদিকে সমবেত লোকদেরকে সেই পর্বতের অপর দিকে অবস্থিত কোন বিষয়ে সংবাদদান নবীর প্রকৃত অবস্থানের সাথে তাৎপর্যপূর্ণ। নবী এই দুনিয়ার মানুষ হয়েও পরকালীন জীবনের সব কিছু ওহীর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেন যা সাধারণ মানুষেরন অগোচরে থাকে। যেমন পর্বৎ শিখরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ অপর দিকের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র। আমার ও তোমাদের ব্যাপারকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চাইলে মনে করঃ এক ব্যক্তি শত্রু বাহিনী দেখতে পেল, সে তার আপন–জনদের সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু ভয় পেল, শত্রুরা তার আগেই তার আপন–জনের উপর আক্রমণ করে বসে নাকি। তখন সে নিরুপায় হয়ে চিৎকার দিতে লাগল, হে সকাল বেলার জনগণ। সাবধান হয়ে যাও, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে'

এ ভাবেই ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। বলা যায়, হাঁটি হাঁটি পা পা করেই তা অগ্রসর হচ্ছিল। চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন শিরক ও নাস্তিকতার আবরণ ছিন্ন করেই অতি ধীরে ধীরে তাঁকে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। এ সময়ই মক্কা নগরীর কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দ্বীন–ইসলাম গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক যুবকও তাঁর দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়। সেই সাথে কুরাইশ সরদাররাও উৎকর্ণ হয়ে উঠে। অবস্থা দেখে তারা অনেকটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেমন করে এই আওয়াজকে নিস্তব্ধ করা যায়, সে চিন্তায় তারা খুবই কাতর হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত তারা এই আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে মুহাম্মদ (স·)–কেই সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য তারা প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক নিয়ে একটি হত্যাকারী দল গঠন করে এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দেয় যে, তারা একসাথে একই ব্যক্তির ন্যায় আঘাত হানবে, যেন তিনি শেষ হয়ে যান। তাহলে তাঁর বংশ বনু হাশেম বিশেষ কারোর বিরুদ্ধে রক্ত মূল্যের দাবি করার সাহস পাবে না। সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাও সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। এভাবে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে; কিন্তু সেজন্য কাউকেই কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না, সমাজের নিকটও দায়ী হতে হবে না।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের এই ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ করে দিলেন। তিনি রাসূলে করীম (স·)–কে মদীনার পথে মক্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।

রাসূলে করীম (স·) মদীনায় উপস্থিত হলে সেখানকার প্রাচীন অধিবাসী আওস ও খাজরাজ বংশের লোকেরা তাঁর হাতে বয়আত করলেন, তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন; তাঁর প্রতিরক্ষায় সর্বাত্মক শক্তি ব্যয়ের জন্যও ওয়াদাবদ্ধ হলেন। যেমন এর পূর্বে মক্কায় দু' দু'বার তারা বয়আত করেছিলেন।

রাসূলে করীম (স·) মক্কা এবং নিজের বংশের লোকদের ত্যাগ করে চলে গেলেও তাঁর বংশের লোকেরা তাঁর পিছু ধাওয়া করা ত্যাগ করেনি। ফলে তাঁর ও কুরাইশদের মধ্যে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাঁকে এবং তাঁর গঠিত ইসলামী সমাজকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে কুরাইশরা শেষ রক্ত বিন্দু ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয়

নি। এভাবে হিজরতের পর সুদীর্ঘ ছয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই সময় মক্কার সন্নিকটে 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে হযরত মুহাম্মদ (স·) ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দশ বছর মেয়াদী একটি সন্ধি–চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা 'ফত্হুম–মুবীন'—'সুস্পষ্ট বিজয়' বা তার সূচনা বলে কুরআন মজীদের আয়াতে ঘোষণা করেন। ফলে নবী করীম (স·) দূরবর্তী স্থানসমূহে তওহীদী দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার একটা নির্বিঘ্ন সুযোগ পেয়ে যান।

এই সময় তিনি চতুর্দিকে দূত পাঠিয়ে বড় বড় রাজা–বাদশাহ ও শাসকদের নিকট দ্বীন–ইসলাম কবুল করার দাওয়াত পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। রোমের সম্রাট কাইজার, পারস্য সম্রাট কিস্‌রা, মিশরের কিবৃতী শাসক 'আজীম' হাবশার বাদশাহ গাসানী প্রধান হারিস, সিরীয় রাজা তহম, ইয়ামামা শাসক হাওদা এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রপতি, এমনকি সরকারী কর্মচারী, ধর্ম যাজক ইত্যাদির নিকট দ্বীন–ইসলাম কবুলের আহবান সম্বলিত পত্র পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি শান্তির একমাত্র বিধান দ্বীন–ইসলাম কবুল করার ও তাঁকে আল্লাহ্‌র রাসূল রূপে মেনে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

এসব পত্র ও আহবান অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, বিশ্বনবী (স·)–এর দাওয়াত ও দ্বীন ছিল বিশ্বজনীন। সমগ্র পৃথিবীর জন্যই তা ছিল আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন এবং তিনি ছিলেন সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সর্বশেষ রাসূল। প্রেরিত পত্রসমূহের ভাষা ও বক্তব্য থেকেও এ কথাই প্রতিভাত হয়ে উঠে।

স্যার টমাস আরনোল্ড বলেছেনঃ এই সব চিঠি যাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তাদের উপর এর বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কালের স্রোত অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, উক্ত পত্রসমূহে যা কিছু বলা হয়েছিল তা কিছুমাত্র শূন্যগর্ভ ছিলনা। এই চিঠিগুলো অধিকতর স্পষ্টতা ও তীব্রতা সহকারে সেই সত্যকেই প্রমাণ করেছে, যার কথা কুরআন বারবার দাবি হিসাবে পেশ করেছে। আর তা হচ্ছে সকল মানুষের প্রতি দ্বীন–ইসলাম কবুল করার আহবান। —আদ–দাওয়াত ইলাল ইসলাম, পৃষ্ঠা–৩৪

প্রেরিত পত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া ঃ

নবী করীম (স·) প্রেরিত উক্ত দাওয়াতী পত্রসমূহ যে শূন্যগর্ভ উদ্দীপনায় নিঃসৃত ছিল না, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, পত্রসমূহ প্রাপক ব্যক্তিদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাদের অনেককে বিশ্রামের শয্যা থেকে তীব্র কষাঘাতে জাগিয়ে দিয়েছিল। অনেককে অন্ধত্ব ও নিষ্ক্রিয়তার গহবর থেকে বাইরে ঠেলে দিয়েছিল। রাসূলে করীম (স·)–এর সে দাওয়াত সম্পর্কে সকলেই কমবেশী ভাবিত হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ তাঁর নবুয়্যতকে অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিলেন, ঈমান

এনেছিলেন রাসূলে করীম (স·) উপস্থাপিত দ্বীনের প্রতি। কেউ কেউ মহামূল্য হাদীয়া-তোহফাও লোক মারফত পৌঁছে দিয়েছিলেন রাসূলে করীম (স·)-এর দরবারে। এ পর্যায়ে সীরাতুন্নবী ও ইসলামের ইতিহাস পর্যায়ের প্রামান্য গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে।

রোমান সম্রাট কাইজারের ভাই তাকে বলল, ফেলে দাও ও চিঠি। তখন সে তার ভাইকে লক্ষ্য করে বলল:

এমন ব্যক্তির চিঠি কি করে ফেলে দিতে পারি, যাঁর নিকট সবচাইতে বড় ফেরেশতা (জিবরাইল) যাতায়াত করেন। ?

দরবারে উপস্থিত কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ানকে সম্বোধন করে বলল:

'তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তা হলে কোন সন্দেহ নেই, তিনি একজন নবী। তাঁর কর্তৃত্ব তো আমার পায়ের তলার যমীন পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছে যাবে।'

রোমান বিপশ পত্র পাঠান্তর গীর্জায় পৌঁছে বহু লোকের সামনে বলল:

'হে রোমান জনতা, আমাদের নিকট 'আহমাদ'-এর একখানি পত্র এসেছে। তাতে তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানিয়োছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য কেউ নেই এবং আহমাদ আল্লাহ্‌র রাসূল'।

'মুকাউকাস' বলেছিলেন: এই নবীর ব্যাপারটি নিয়ে আমি অনেক চিন্ত-ভাবনা করেছি। তিনি পরিত্যজ্য কোন কাজ করার আদেশ করেন না এবং মনের আগ্রহের কোন জিনিস নিষেধও করেন না। তাঁকে পথভ্রষ্ট, যাদুকর রূপেও দেখতে পাই না, মিথ্যাবাদী গণক রূপেও না।

কাইজারের নিয়োজিত আম্মানের কর্মকর্তা রাসূলে করীম (স·)-এর প্রতি একখানি পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা অকপটে প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য কাইজার তা জানতে পেরে তাঁকে পাকড়াও করল এবং ইসলাম ত্যাগ করার নির্দেশ দিল। কিন্তু তা মানতে তিনি অস্বীকার করলেন। তখন কাইজার তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। তিনি যখন নিহত হচ্ছিলেন, তখন কবিতার একটি ছত্র পড়ে জানিয়ে দিয়ে গেলেন: 'মুসলিম সমাজকে জানিয়ে দাও, আমি একজন মুসলিম, আমার হাড়-মাংস সবই আমার রব্ব-এর জন্য একান্ত অনুগত'।

ইয়ামামার রাজা হাওদা ইবনে আলী রাসূলে করীম (স·)-এর নিকট একখানি পত্র পাঠিয়ে জবাব দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন: 'আপনি যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা কতইনা সুন্দর, কতইনা উত্তম'। বাহরাইনের শাসক মুনয়ির ইবনে সাভী রাসূলে করীম (স:)-এর দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের কথাও তাতে প্রকাশ করেছিলেন।

হিময়ার–এর শাসকগণ এবং নাজরানের পাদ্রীগণও ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন। কিসরা'র ইয়ামেনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ,হাজরা মওত–এর শাসক, আইলার বাদশাহ ও ইয়াহুদীগণ ইসলাম গ্রহণ অথবা জিজিয়া আদায় করতে রাযী হওয়ার কথা জানিয়েছিল।

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিতে ইসলাম কবুলের কথা এতটা দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে নবী করীম (স·) তাঁর গায়েবানা জানাযাও পড়েছিলেন। এখানে আমরা শুধু নমুনা স্বরূপ প্রেরিত পত্রসমূহের কয়েকটি মাত্র প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করলাম। এ হচ্ছে বিপুলের মধ্য থেকে অতি সামান্য ও অতি অল্প কয়েকটির কথা। এসব থেকে শুধু এটুকু প্রমাণ করাই এখানে আমাদের উদ্দেশ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (স·)–এর দীর্ঘ দাওয়াত এবং তাঁর মহান নবুয়্যাত ও রিসালাত ছিল বিশ্বজনীন। তা কোন এক দেশ বা এলাকা বা জাতিগোষ্ঠীর জন্য একান্তভাবে নির্দিষ্ট ছিল না।

রাসূলে করীম (স·)–এর প্রেরিত দ্বীন কবুলের দাওয়াতী পত্রাদির প্রতিক্রিয়া উল্লেখ প্রসঙ্গে পারস্য সম্রাট কিস্‌রা'র প্রতিক্রিয়াটা অনুল্লেখিত থাকা ঠিক হবেনা বিধায় আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে যে, কিস্‌রা তার পূর্ববংশ সামানীদের উত্তরাধিকারী হিসাবেই সিংহাসনে আসীন হয়েছিল। সে রাসূল করীম (স·)–এর দ্বীন কবুলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, একজন আরবের 'অধীনতা' (?) মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। শুধু তা–ই নয়, দ্বীন– ইসলামের এই দাওয়াতকে সে ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য এবং তার সিংহাসনের জন্য খুবই বিপজ্জনক মনে করেছিল।

এ কারণে সে রাসূলে করীম (স·)–এর পত্রখানি টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল। ইয়ামেনে নিযুক্ত তার শাসনকর্তা 'বাযান'কে লিখে পাঠাল যে, তুমি হিজাজের এই ব্যক্তির (নবী করীম (স·) নিকট দু'জন লোক পাঠিয়ে দাও। তারা যেন তাঁকে ধরে আমার নিকট নিয়ে আসে। (السيرة الحلبية ج ٣ ص ٢٧٨) (الكامل ج ٢، ص ٨١)

বস্তুতঃ এ হচ্ছে রাসূলে করীম (স·)–এর বিশ্বের চতুর্দিকে দ্বীন কবুলের আহবানের এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। এসব থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, তাঁর দাওয়াত ছিল বিশ্বজনীন, তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, বিশ্বের সকল দেশের,সকল কালের, সকল মানুষের জন্য নবী ও রাসূল। কেননা যারা সে দাওয়াত কবুল করেছিলেন, তারা এই দ্বীনকে সকল মানুষের গ্রহণযোগ্য মনে করেই গ্রহণ করেছিলেন। আর যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাও তাকে তাই মনে করেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। নতুবা কোন জাতীয়তাবাদী ধর্ম অন্য জাতির লোকদের জন্য না গ্রহণের প্রশ্ন উঠে, না প্রত্যাখ্যানের।

বিশ্বজনীন রিসালাত প্রমাণকারী আয়াতঃ

এ পর্যায়ে আমরা কুরআন মজীদ থেকে সে সব আয়াত বাছাই করে উদ্বৃত করব, যা থেকে অকাট্যভাবে প্রমানিত হবে যে, রাসূলে করীম (স)–এর রিসালাত ছিল বিশ্বজনীন, ছিল সমগ্র বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য। তা যেমন কোন বিশেষ দেশ বা অঞ্চল কিংবা ভাষা, বর্ণ বা বংশের লোকদের জন্য ছিল না, তেমনি কেবল এক কালের লোকদের জন্যও ছিল না। তা ছিল সারা পৃথিবীর সকল কালের, সকল মানুষের জন্য সমানভাবে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি সর্ব মানুষের সার্বিক কল্যাণ বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন। এ পর্যায়ে নিম্নে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ কয়েকটি ভাগে উদ্ধৃ করা যাচ্ছে :

প্রথমঃ বহু সংখ্যক আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, তাঁর রিসালাত সারা বিশ্বব্যাপী। তিনি সর্ব মানুষের প্রতিই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ্ তাঁকে সমগ্র বিশ্বলোকের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন।

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ (الاعراف ـ ١٥٨)

বল, হে মানুষ সকল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ (سبأ ـ ٢٨)

আমরা তোমাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপেই পাঠিয়েছি (অন্যকোন রূপে নয়)।

وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ (النساء ـ ٧٩)

আমরা তোমাকে মানুষ মাত্রের জন্য রাসূল রূপে পাঠিয়েছি। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ (الانبياء ـ ١٠٧)

আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ـ (الفرقان ـ ١)

মহান পবিত্র বরকতওয়ালা সেই আল্লাহ্, যিনি পার্থক্যকারী কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর বান্দাহ্‌র উপর, যেন সে সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ـ (الانعام ـ ١٩)

এবং আমার প্রতি ওহী করে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন আমি তদ্দ্বারা

তোমাদেরকে এবং সেই লোকদেরকেও যাদের নিকট তা পৌছবে–সতর্ক করতে পারি।

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ـ (الصف-٩)

তিনিই মহান আল্লাহ্, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েতের বিধান ও সত্য অনুসরণ ও অধীনতার ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেন সে তাকে সমগ্র আনুগত্য ব্যবস্থার উপর জয়ী করে দিতে পারে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ـ (النساء ـ ١٧٠)

হে মানুষঃ এই রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের রব্–এর নিকট থেকে সত্য বিধান নিয়ে এসেছে। অতএব, তোমরা ঈমান আনো, তা তোমাদের জন্য অতীব কল্যানকর।

الٓر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ـ (ابراهيم ـ ١)

এই গ্রন্থ তোমার প্রতি—হে নবী—এজন্য নাযিল করেছি যেন তুমি মানুষকে পূঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনতে পার সেই লোকদের রব্–এর অনুমতিক্রমে।

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ـ (ال عمران ١٣٨)

এই কিতাব সমগ্র মানুষের জন্য প্রকাশ্য বর্ণনা এবং হেদায়েতের বিধান এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য উপদেশ।

কেবল এই ক'টি আয়াতই নয়, আরও বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে, যা স্পষ্ট ও আকাট্যভাবে ব্যক্ত ও প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (স·)–এর নবুয়্যত ও রিসালাত সারা দুনিয়ার সর্বকালের মানুষের জন্য।

দ্বিতীয় ঃ কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে নিঃশর্তে ও কোনরূপ বিশেষণ ব্যতীত সমগ্র মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে।। সম্বোধনের এই রূপ ও প্রকৃতি প্রমাণ করে যে, এই কুরআন যেমন সর্ব মানুষের জন্য, হযরত মুহাম্মদ (স·)–এর নবুয়্যত ও রিসালাতও সর্ব মানুষের জন্য। এ পর্যায়ের কিছু আয়াত এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ـ (البقرة ـ ٢١)

হে মানুষ! তোমরা সকলে তোমাদের সেই রব্–এর দাসত্ব কবুল কর—দাস হয়ে থাক—যিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকেও; এই আশায় যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করার নীতি গ্রহণ করবে।

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ (البقرة-١٦٨)

হে মানুষ! তোমরা আহার কর পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে হালাল, উত্তম–উৎকৃষ্টরূপে আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে স্পষ্ট ভাষায়ঃ 'হে মানুষ' (يٰاَيُّهَا النَّاس) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে এ সম্বোধন—এ আহবান মানুষ পদবাচ্য সকলেরই জন্য, সকলেরই প্রতি। বিশেষ কোন অংশের মানুষের জন্য নয়। এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (স·) যে দ্বীন পেশ করেছেন—দ্বীন–ইসলাম, তা সকল মানুষের জন্য যেমন, তেমনি তাঁর নবুয়্যত রিসালাত সর্বকালের, সর্বমানুষের জন্য। ইসলাম বিশ্বজনীন দ্বীন। যদি তা না হত, তাহলে কুরআনে এরূপ সম্বোধন উদ্ধৃত হওয়ার কোন তাৎপর্যই থাকত না। অথচ কুরআনে 'হে মানুষ' বলে ষোলটি আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে।

তাছাড়া 'আহলি কিতাব'—অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে কুরআন মজীদের মোট বারটি আয়াতে। ওরা তো কোন–না–কোন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ছিল; আসমানী কিতাবের ধারক হয়ে পরিচিতও ছিল ওরা। ওদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে রাসূলের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানোর কি অর্থ হতে পারে? তাতে এ–ই বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (স·)–এর নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হওয়ার পর নির্বিশেষে সকল মানুষকে তাঁরই প্রতি ঈমান আনতে হবে, পূর্বের সব নবী ও রাসূলের নবুয়্যত ও রিসালাতের মেয়াদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। অতঃপর অন্য কারোর নবুয়্যত বা রিসালাত চলতে পারে না।

তৃতীয় ঃ কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করে বহু সংখ্যক বিধান পেশ করা হয়েছে। সে বিধান বিশেষ কোন বর্ণ, বংশ বা দেশের লোকদের জন্য নয়। এথেকেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীম (স·) পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বসবাসকারী সকল মানব সমাজের সংশোধন ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর রিসালাত কোন বিশেষ সীমার মধ্যেই সীমিত বা সংকুচিত ছিল না। এ পর্যায়ের কতিপয় আয়াতঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔ (اٰل عمران۔۹۷)

আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা সাধারণভাবে সব মানুষেরই কর্তব্য— তবে যারা সেই পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ্যবান।

এ আয়াতের বক্তব্য হল, যে কোন মানুষ আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অধিকারী হবে, তাকেই এই ঘরের হজ্জ করতে হবে। আল্লাহ্‌র জন্য তা একান্তই কর্তব্য এবং এ কর্তব্য উক্ত গুণের অধিকারী প্রত্যেকটিমানুষেরই—সে মানুষ যে দেশের, যে বংশের ও যে কালেরই হোক না কেন। কুরআনের আয়াতে এই কর্তব্য কেবল আরবদের জন্য বা কেবল সে কালের লোকদের জন্য, এমন কথা বলা হয়নি।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ۔ (الحج ـ ۲۵)

মসজিদে হারাম, যা আমরা সমস্ত মানুষের জন্য বানিয়েছি, তথায় স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সমান।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ (لقمان۔ ۶)

লোকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা মন–ভুলানো কথা খরিদ করে আনে, যেন সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদের ভ্রষ্ট করা যায়।

এখানে কথার ধরণ যা–ই হোক, সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পথ থেকে গুমরাহকারী যে কোন মন–ভুলানো কালাম বা কথা ক্রয় করা বা তার ব্যবহার করা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম এবং এ হারাম সকল মানুষের জন্য। গায়ক–গায়িকা, নৃত্যশিল্পী বা যৌন সুরসুরি সৃষ্টিকারী নভেল–নাটক থেকে শুরু করে সকল প্রকারের অশ্লীল কাজ এ আয়াত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম। কেননা আয়াতে আল্লাহ্‌র দিক থেকে মন–ভোলানো যে–কোন জিনিসকে সকল মানুষের জন্যই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ ঃ কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, তার হেদায়েত বিশেষভাবে কোন সমাজ বা জন–সমষ্টির জন্য নয়, বিশেষ কোন কাল বা সময়ের লোকদের জন্য নয়,বরং আসমানের নীচে যমীনের বুকে অবস্থানকারী সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণ। এ পর্যায়ে কতিপয় আয়াতঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ـ

(النساء-١٧٤)

হে মানুষ, তোমাদের নিকট তোমাদেরই রব্ব–এর নিকট থেকে অকাট্য দলিল এসে গেছে এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ـ (البقرة-١٨٥)

রমযান মাস, তাতেই নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়েতের বিধান হিসাবে কুরআন নাযিল হয়েছে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ

(الزمر-٢٧)

আমরা এই কুরআনে জনগণের সম্মুখে নানা রকম ও নানা প্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি এই আশায় যে,তারা সম্ভবতঃ তা থেকে বিশেষভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে।

اَلْكِتٰبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ (ابراهيم-١)

এই গ্রন্থ, তা তোমার প্রতি আমরা এজন্য নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদেরকে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোকের দিকে বের করে নিয়ে আসতে পার।

এ ক'টি আয়াতই উদাত্ত কণ্ঠে জানাচ্ছে যে, কুরআন সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। সকলেরই জন্য আলো; অজ্ঞানতা ও পাপ বুদ্ধির সুচিভেদ্য অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে এই কুরআন এবং তা বিশেষভাবে কারোর জন্যই নয়, নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতাংশটিও স্মরণীয়ঃ

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ (الجمعة-٣)

আর এই রাসূলের আগমন অনান্য সেই লোকদের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি। (অর্থাৎ পরে এসে মিলিত হবে।)

এই 'অন্যান্য লোক' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? নিশ্চয়ই সেইসব লোক যারা উত্তরকালে কিয়ামত পর্যন্ত আরব–অনারব নির্বিশেষে এসে এই মুসলিমদের সাথে ঈমানের ভিত্তিতে মিলিত হবে। ফলে এই আয়াতাংশও রাসূলে করীম (সঃ)–এর বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নবুয়্যত ও রিসালাতের কথাই প্রমাণ করছে। সেই সাথে একথাও প্রকারান্তরে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর এ নবুয়্যত ও রিসালাত পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত, সম্প্রসারিত। অতঃপর অপর কোন নবী বা রাসূলের আগমনের কোন সম্ভবনার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার কোন অবকাশই নেই।

এসব আলোচনার সারকথা এ-ই দাঁড়ায় যে, রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাত ও নবুয়্যতের বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতা অবশ্য স্বীকৃতব্য। তা না কোন জাতীয়তা-আঞ্চলিকতার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ, না কাল ও যুগের সীমায় পরিবেষ্টিত। উপরের যে চার পর্যায়ের আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার প্রথম পর্যায়ের আয়াত প্রমাণ করছে রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাতের সার্বজনীনতা, দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়াত প্রমাণ করে মৌলিক ও খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই কুরআনী সম্বোধনের সাধারণত্ব, তৃতীয় পর্যায়ের আয়াত স্পষ্ট করে যে, বিভিন্ন সাধারণ শিরোনামের অধীনে দেওয়া হুকুম-আহকাম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য। আর চতুর্থ পর্যায়ের আয়াত দেখাচ্ছে যে, কুরআনের হেদায়েত ও সতর্কীকরণ বিশেষ কোন জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য নির্বিশেষে।

ভিন্নতর দৃষ্টিকোণে রসূলের সার্বজনীনতাঃ

রাসূলে করীম (স)-এর রিসালাতের সার্বজনীনতা ভিন্নতর দৃষ্টিকোণেও বিবেচ্য। এই দৃষ্টিকোণটিও ইসলামের প্রকৃতির সাথে পরাপুরি সামঞ্জস্যশীল। বিশ্বলোক, জীবন ও মানুষ এবং আইন প্রণয়ন ও শরীয়তের বিধান রচনার দিক দিয়েও ইসলামের দৃষ্টিকোণের ব্যাপক বিশালতা লক্ষ্যণীয়।

বস্তুতঃ ইসলাম তার আইন-বিধান নির্ধারণে এবং মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ চিন্তায় মানবতার সেই সাধারণ প্রকৃতির উপর অধিক নির্ভরতা গ্রহণ করেছে, যার উপর সমস্ত মানব বংশের সৃষ্টি ও সংগঠন বাস্তবায়িত হয়েছে, যা মানুষের সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একেবারে অতি সাধারণ ও সকলকেই পরিব্যাপ্ত। কেউ-ই তার বাইরে নয়। এ দিক দিয়ে দুনিয়ার কোন অঞ্চলের মানুষের সাথে অপর অঞ্চলের বা কোন সময়-কালের মানুষের সাথে অপর সময়কালে মানুষের বিন্দুমাত্র পার্থক্যও নেই। আর ইসলাম যখন সকল মানুষের এই অভিন্ন প্রকৃতি ও জন্মগত স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বিধান পেশ করেছে, তখন সে বিধান গ্রহণ ও পালনের দায়িত্বের দিক দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বা বিভিন্ন সময়-কালের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা হবে কেন? কেন বলা হবে, ইসলাম কেবল অমুক এলাকার বা অমুক সময়ের লোকদের জন্য আর অমুক অমুক এলাকার বা অমুক অমুক সময়ের লোকদের জন্য নয়? ইসলামের ব্যাপারে এই ধরনের কথা নিতান্তই যুক্তিহীন।

কেননা নবী করীম (স)-এর উপর স্থাপিত জীবন-বিধান—দ্বীন-ইসলাম-এর ব্যাপক ভিত্তিকতা ও দিক- বিপুলতার প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, মানুষের জীবনে যত দিক, যত বিভাগ ও যত সমস্যাই থাকতে পারে, রাসূলে করীম (স) তার কোন একটি দিক, বিভাগ বা সমস্যাকে বাদ দিয়ে—উপেক্ষা করে-কথা বলেননি, বরং সকল দিক, বিভাগ ও সমস্যা সম্পর্কেই কথা বলেছেন। এ দিকটাও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূলে করীম (স) সার্বজনীন—সকল মানুষের জন্যই

নবী ও রাসূল ছিলেন। কোন বিশেষ শ্রেনীর বা বিশেষ সমস্যায় জর্জরিত জনগণের সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর আগমন হয়নি।

এ বিষয়ে যত চিন্তা–বিবেচনাই করা হবে, নিঃসন্দেহে দেখা যাবে যে, ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার মহামূল্য শিক্ষা, বিশ্বাস পর্যায়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং আইনগত রীতিনীতি বারবার বিবেচনা করলেও কিছুতেই বোঝা যাবে না যে, তা বিশেষ কোন যুগের বা এলাকার জন্য মাত্র। তাঁর উপস্থাপিত শরীয়তের বিধানও নয় সীমিত বা সীমাবদ্ধ। কেননা আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে জীবন বিধান রচিত হয়, তার বিশেষ কতকগুলো চিহ্ন বা নিদর্শন থাকে। প্রথমতঃ তাতে থাকবে বিশেষ পরিবেশগত বিশেষত্ব কিংবা থাকবে স্থানীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য। এভাবে যে, সে পরিবেশ বদলে গেলে কিংবা সেই বিশেষত্ব না থাকলে বা সেই বৈশিষ্ট্য তিরোহিত হলে সে জীবন বিধান কার্যকর হতে পারে না, তদনুযায়ী জীবন যাপন করাও সম্ভব হবে না। তখন তা মরীচিকায় পরিণত হয়। তার কল্যাণকর ব্যবস্থাদিও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইসলামে সে রকম চিহ্ন বা নিদর্শন কিংবা লক্ষণাদি পাওয়া যায় কি?

এ পর্যায়ে আমরা অনায়াসেই জ্ঞান ও আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের উপস্থাপিত কতিপয় বিষয় পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করতে পারি। তাহলে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সর্বাগ্রে আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদকে এই পর্যালোচনার কষ্টিপাথরে যাঁচাই করতে পারি। বস্তুতঃ কুরআন হচ্ছে এক চিরন্তন মু'জিজা। চৌদ্দশ' বছর কাল ধরে তা এই দুনিয়ায় আলো বিতরণ করে যাচ্ছে। দুনিয়ার মানুষ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখনই কুরআন তার দিকপ্লাবী আলোকচ্ছটা জ্বালিয়েছে। মানুষ হারিয়েছিল তার মনুষ্যত্ব, মানবিক মর্যাদা, তার মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা। মানুষের পরস্পরের মধ্যে ছিল প্রচন্ড দ্বন্দ্ব, মারামারি ও রক্তপাত। চতুর্দিকে ছিল জংলী ব্যবস্থা। মানুষ ছিল ভীত–সন্ত্রস্ত।

এ পরিস্থিতিতেই কুরআন অবতীর্ণ হতে শুরু করে। তা উজ্জ্বল করে ধরে বিশ্ব–উজ্জ্বলকারী আলো। মানুষকে ফিরিয়ে দেয় তার মনুষ্যত্ব, মানবিক মর্যাদা ও অধিকার। সামাজিক–সামষ্টিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে গড়ে তোলে মানুষের এক একটি সমাজ—কেবল জাজীরাতুল আরবেই নয়, তার বাইরে, প্রায় সকল দেশে। ইসলামের শিক্ষা, আইন–বিধান, আদেশ–নিষেধ, রীতি–নীতি ও কর্তব্য সকল সমাজের জন্যই নির্বিশেষ মানবীয় কল্যাণের বিধায়ক। সে কল্যাণ লাভে কোন এক অঞ্চলের লোকদের অপর অঞ্চলের লোকদের অপেক্ষা অধিক সুবিধাভোগী এবং অপর কোন অঞ্চলের লোকদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে দেখা যায়নি। কোন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে আর অপর জন–সমষ্টি গুমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে, এমনটাও কখনো ঘটেনি।

তার কারণ, ইসলাম এক নির্ভুল জীবন–দর্শন উপস্থাপন করেছে, খালেস

তওহীদী আকিদাই হচ্ছে তার মৌল ভাবধারা আর তা–ই হচ্ছে সাধারণভাকে সমস্ত মানব সমাজ সংশোধনের নির্ভুল উপায়।

ইসলাম সকল প্রকারের শিরক—শিরকী আকীদার উপর আঘাত হেনেছে। মূর্তি–পূজা বা আকাশমার্গীয় অবয়বের আরাধনা–উপাসনা বন্ধ করেছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শক্তির সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শক্তির নিকট নতি বা আনুগত্য স্বীকারের সমস্ত রীতি ব্যবস্থাকে খতম করেছে, শিরক–এর সমস্ত বন্ধন–প্রভাব থেকে মানব–সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। গুমরাহীর সমস্ত ফাঁদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে। পাহাড়–প্রস্তর পূজা ও পশু পূজার অর্থহীনতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। কেননা এগুলোর ভালো বা মন্দ—ক্ষতি বা উপকার কিছুই করার একবিন্দু ক্ষমতা নেই। পশুগুলো এতই অক্ষম যে, ওরা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারে না। মানুষ পূজার, মানুষের গোলামী করার এবং কতিপয় মানুষের মনগড়া আইন পালনের অন্তঃসারশূন্যতাকেও স্পষ্ট করে তুলেছে। ফলে মানুষ ফিরে পেয়েছে তার মর্যাদা ও মাহাত্ম। এ ক্ষেত্রে আরব উপদ্বীপ ও তার বাইরের মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র তারতম্যও দেখা যায়নি। তা ছিল নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই ইসলামের উদার অবদান।

ইসলামের এই জ্ঞান পরিচিতি, এই তাওহীদী আকীদা তো এমন নয় যে, তা কোন বিশেষ এলাকার মানুষ গ্রহণ করতে পারে আর অপর এলাকার মানুষেরা তা গ্রহণ করতে পারে না।

সূরা আল–হাদীদ–এর শুরুর আয়াত ক'টি গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাঠ করলে যে–কেউ স্পষ্ট অনুভব করবে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এ আয়াত ক'টির শিক্ষা অতীব উন্নত মানের এবং গভীর জ্ঞানগর্ভ। তা কখনই বিশেষ এলাকার লোকদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হতে পারে না। অন্য এলাকায় তা বাস্তবায়িত হওয়ার অযোগ্যও নয় কোন একটি দিক দিয়েও।

সে আয়াত ক'টির বাংলা অনুবাদ হচ্ছেঃ আল্লাহ্র তসবীহ্ করছে প্রত্যেকটি জিনিসই যা পৃথিবী ও আকশমন্ডলে রয়েছে। পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের রাজত্ব সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক একমাত্র তিনিই। জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন কেবল তিনিই এবং সব কিছুরই উপর তিনিই শক্তিমান।

ইসলামের যাবতীয় হুকুম–আহকাম, ইবাদত ব্যবস্থা, পারস্পরিক লেন–দেন, নৈতিকতা প্রভৃতি পর্যায়ের আদর্শ ও আইন–বিধানের কোন একটি সম্পর্কেও কি একথা বলা যায় যে, তা কোন কোন ক্ষেত্রে পালনযোগ্য আর অপরাপর ক্ষেত্রে আদৌ পালনযোগ্য নয়? না।

ইসলাম পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যে সব বিধি–বিধান পেশ করেছে—বিয়ে, সন্তান পালন, তালাক, স্বামী–স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য, ইয়াতীমদের সামাজিক নিরাপত্তাদান, অসীয়ত কার্যকরকরণ, মানুষের পারস্পরিক মিলমিশ, আমানত সংরক্ষণ, সকলের প্রতি উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন, ন্যায় কাজে

পারস্পরিক সহযোগিতা ও অন্যায়-পাপ কাজে অসহযোগিতা পর্যায়ের আইন বিধান—এর মধ্যে কোন্‌টি এমন, যা পৃথিবীর সকল দেশে, সকল অঞ্চলে ও সকল সমাজে পালন করা যায় না?

ইসলামের নৈতিক আদর্শ ও তৎসংক্রান্ত বিধি-বিধান দ্বীন-ইসলামের গৌরবের বিষয়। তার বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল নৈতিক বিধানকে অতিক্রম করে গেছে। ইসলাম সত্য ভাষণ ও সততার নীতি, আমানত রক্ষার নীতি, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, পারস্পরিক ভালো ধারণা পোষণ, ক্ষমাশীলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, মেহমানদারী, ঔদার্য, বিনয়, শোকর, তাওয়াক্কুল, কর্মে নিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিক ভাবধারাসম্পন্ন আদর্শ উপস্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে মিথ্যা কথন, কার্পণ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মসাতকরণ, শঠতা, কপটতা, মিথ্যাদোষারোপ, ক্রোধ-আক্রোশ, হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ধোকা-প্রতারণা, অহংকার প্রভৃতি হীন ও জঘন্য কার্যকলাপ পরিহার করার উপদেশ দিয়েছে।

ইসলাম এক অপূর্ব রাজনৈতিক দর্শন ও ব্যবস্থা পেশ করেছে, যাতে সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার মৌলিক নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকার কেবলমাত্র সারেজাহানের স্রষ্টা মালিক আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত। মানুষ তা গ্রহণ করে তারই মত অন্য মানুষের গোলামী করার ঘৃণ্য লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। ইসলাম যুদ্ধনীতির সংস্কার করেছে। যুদ্ধের কারণসমূহ বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। জাতীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ করেছে। তাতে জনগণের ন্যায্য ও অভিন্ন অধিকার স্বীকার করেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল ঘোষণা করেছে, সূদ ও সর্বপ্রকারের শোষণ হারাম করেছে। এসব ক্ষেত্রে কি কোন গোত্রীয় বা আঞ্চলিকতার গন্ধ পাওয়া যায়? এ পর্যায়ে কুরআনুল হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করে দেখা যাকঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - (النحل - ٩٠)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সুবিচার, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্যায় , পাপ, নির্লজ্জতা ও যুলুম-অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে এসব উপদেশ দিচ্ছেন শুধু এই আশায় যে, তোমরা তা গ্রহণ করবে।

কুরআনের এই বিধান কি সাধারণভাবে সর্বজন গ্রহণীয় নয়? নয় কি তা সকল মানুষের জন্য সাধারণভাবেই পরম কল্যাণের ধারক? এ ব্যাপারে কি দেশ, উপমহাদেশ আর মহাদেশজনিত কোন ভৌগলিক পার্থক্য ও তারতম্যের একবিন্দু প্রভাব আছে?

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ـ (النساء ـ ٥٨)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ সে সবের প্রকৃত পাওনাদার মালিক বা সেসব পাওয়ার উপযুক্তদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আর তোমরা যখন লোকদের পরস্পরের মধ্যে কোন ফয়সালা করবে—রায় বা হুকুম দিবে—তখন তোমরা অবশ্যই ন্যায়পরতা ও ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে।

কুরআনের ন্যায়পরতা ও সুবিচারের নির্দেশ ছিল একান্তভাবে নৈর্ব্যক্তিক, সর্বোতোভাবে নিরপেক্ষ এবং তা এমন প্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছিল যখন প্রভাবশালী ইয়াহুদী সমাজ এই পক্ষপাতদুষ্ট নীতির উপর অবিচল ছিল যে, আরবের উম্মী লোক—মুসলমান এবং অ-ইয়াহুদী লোকদের প্রতি ন্যায়বিচারের কোন বাধ্য-বাধকতাই তাদের উপরে নেই, তা কেবল ইয়াহুদীদের প্রতিই করণীয়, অন্যদের প্রতি নয়। তাদের এইরূপ নীতি গ্রহণের মূলীভূত কারণ এই ছিল যে, তাদের ধারণা ছিল তাদের ধর্ম গোত্র-ভিত্তিক অর্থাৎ কেবল তাদেরই জন্য। অন্য কারোর কোন অধিকার নেই তাতে। কিন্তু ইসলাম ছিল সার্বজনীন দ্বীন। নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় ও প্রয়োগযোগ্য বিধানই ইসলাম দিয়েছে। মুসলিম ও অমুসলিমের ব্যাপারে তাতে কোন পার্থক্যই বরদাশ্‌ত করা হয়নি।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ ال عمران ـ ١٠٤

তোমাদের মধ্য থেকে একটি জনগোষ্ঠি অবশ্যই এমন বের হয়ে আসতে হবে, যারা সার্বিক কল্যাণের দিকে আহবান জানাতে থাকবে, আদেশ দিতে থাকবে ন্যায়ের এবং নিষেধ করতে থাকবে সকল অন্যায় কাজ থেকে।

কেবলমাত্র নমুনা স্বরূপ এই ক'টি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা হল, যদিও বিষয়টি শুধু এই ক'টি আয়াতের মধ্যেই সীমিত নয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে গ্রহণীয় আরও অনেক উন্নত মানের নৈতিক বিধান উপস্থাপন করেছে কুরআন। সেই সবগুলোকে তো আর এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়।

ইতিবাচকভাবে কেবল ভাল ভাল চরিত্রের কথাই নয়, চরিত্রের খারাপ দিকগুলোকেও কুরআনুল করীম তুলে ধরেছে এবং তা পরিহার করে চলতে নির্দেশ দিয়েছে এই জন্য যে, তা করলে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ ঘটে এবং স্বয়ং ব্যক্তি ও সমষ্টিরও ঘটে নৈতিক পতন ও বিপর্যয়। আর এই উভয় ধরনের আদেশ-উপদেশ পালন করে কেবল মুসলিমরাই উপকৃত হয়নি, অমুসলিমগণও তার সাধারণ কল্যাণ

থেকে বঞ্চিত থাকেনি। অতএব ইসলাম যদি আঞ্চলিক ধর্ম বা জীবন বিধান হত কিংবা হত বিশেষ সময়-কাল ও শতাব্দীর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, তাহলে তদ্দ্বারা সকল দেশের, সকল সময়ের, সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর হত না।

ইসলামী বিধানের ভিত্তি মানব প্রকৃতিঃ তারই প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম এবং ইল্‌ম ও আমল সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান মানব প্রকৃতির ভিত্তিতে রচিত। সে প্রকৃতিতে সকল দেশের ও সকল কালের মানুষই সর্বতোভাবে সমান। তওহীদী আকীদা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, গণ-অধিকার স্বীকৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তৃতি, সকল হীনতা-নীচতা ও ঘৃন্য-জঘন্য কার্যাদি পরিহার, হিংস্রতা, লালসা, জিঘাংসা, পুরাতনের নির্বিচার অনুসরণ, মিথ্যা কুসংস্কার, বৈরাগ্যবাদ ও সংসার-গার্হস্থ্য জীবন এড়িয়ে চলা-প্রভৃতি পর্যায়ের শত-সহস্র নিষেধসূচক বিধি-বিধান সর্ব মানুষের জন্য প্রভূত কল্যাণ উদ্ভাবক। তা সবই নির্বিশেষে সকল মানুষেরই স্বভাব প্রকৃতির চাহিদা বা দাবি।

সমস্ত মানুষের প্রকৃতি এক, তার দাবিও অভিন্ন। আর ইসলামের বিধান তারই প্রেক্ষিতে—তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করেই রচিত। ফলে তা বিশেষ কোন জাতি বা লোক-সমষ্টির জন্য কল্যাণবহ হবে এবং অন্যদের জন্য হবে ক্ষতিকর এমনটা কখনই হতে পারে না। একথাও বলা সঙ্গত হতে পারে না যে, ইসলামের বিধান কুরআন ও সুন্নাতের সীমিত পরিবেষ্টনীতে আবদ্ধ আর মানবীয় সমস্যা পরিবর্তনশীল, নিত্য নবসংঘটিত ও উদ্ভুত, ফলে ইসলাম মানবীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে না—পারলেও এক অঞ্চলে বা এক সময়ে পেরেছিল, অন্য অঞ্চলে বা অন্য সময় তা পারে না। ইসলামের সার্বজনীন ও সর্বকালীন বিশেষত্ব সম্পর্কে যাদের একবিন্দু ধারণা নেই, কেবল সেই লোকদের মনেই এ ধরনের কথা বাসা বাঁধতে পারে, কিংবা যারা এককালে ইসলামের মহাকল্যাণ ও অবদানের কথা স্বীকার করে মুসলিম যুবকদের নতুন ও ভিন্নতর কোন মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারাই এ ধরনের কথা বলে বা বলছে। প্রকারান্তরে তাও ইসলামের সাথে এক মহা শত্রুতা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা সাধারণভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, ইসলাম যদি অতীতের কোন এক সমাজে বা এককালে মানবতার কোন কল্যাণ সাধন করেই থাকে, তাহলে বর্তমানেও দুনিয়ার সকল দেশে সেই ইসলামই কেন প্রযোজ্য বা অনুসরণযোগ্য হবে না, কেন কল্যাণ করতে পারবে না? দ্বীন-ইসলামে যেমন কোন পরিবর্তন হয়নি, তেমনি একবিন্দু পার্থক্য তো দেখা দেয়নি বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানুষের মৌলিক স্বভাবে?

ইসলাম প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিপন্থী

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম এক বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন দ্বীন। সকল প্রকারের ভৌগলিক আঞ্চলিকতা ও কাল বা

সময়ের সীমাবদ্ধতার সমস্ত বেড়াজালকে তা ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

গোত্র, বর্ণ, বংশ বা জাতি প্রভৃতি ধরনের যাবতীয় সংকীর্ণতাকে ইসলাম পূর্ণ সাফল্যের সাথে এড়িয়ে গেছে। কোনরূপ বস্তুগত বা কালগত পার্থক্যকেই ইসলাম স্বীকার করেনি। তবে সে মানুষে মানুষে পার্থক্যের একটি মাত্র ভিত্তিকেই স্বীকার করেছে, তা হচ্ছে তাক্ওয়া—আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার পবিত্র ভাবধারার দিক দিয়ে কে অগ্রসর আর কে পশ্চাদবর্তী। এই একটি মাত্র প্রশ্নে যে অগ্রসর তাকে ইসলাম অগ্রাধিকার দিয়েছে; যে তা নয়, তাকে অগ্রাধিকার দিতেও সে রাযী হয় নি।

মানুষে মানুষে পার্থক্যের এই ভিত্তি পুরাপুরি গুণগত ব্যাপার। এ গুণটিও কারোর পক্ষে অর্জনীয়, কারোর পক্ষে নয়, এমন নয়; বরং নির্বিশেষে সকল মানুষই এ গুণ নিজের মধ্যে অর্জন করতে পারে এবং পারে এ গুণের বলে অধিক মর্যাদাবান হতে।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের উদাত্ত ঘোষণা হচ্ছেঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ

لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۔ (الحجرات-١٣)

হে মানুষ আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, এর মাধ্যমে তোমরা পারস্পরিক পরিচিতি লাভ করবে। তবে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্ওয়াধারী।

এ আয়াত দুনিয়ার সকল প্রকার বংশ–গোত্র–জাতিভিত্তিক হিংসাদ্বেষ ও আত্মম্ভরিতাকে ভেঙ্গে ফেলেছে। বিশ্বমানবতার প্রতি এটা ইসলামেরই অবদান। এর পূর্বে অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদই এই উদার মানবিকতার আদর্শ পেশ করতে বা গ্রহণ করতে পারেনি। ইসলামের পক্ষে তা পেশ করা সম্ভব হয়েছে তার তওহীদী আকীদার কারণেই। এ আকীদা অনুযায়ী বিশ্বস্রষ্টা যেমন এক আল্লাহ, তেমনি বিশ্বমানবতাও একই পিতা–মাতা উৎসারিত, সর্বতোভাবে অভিন্ন। সকল মানুষ একই পিতা–মাতার সন্তান, সকলের দেহে একই পিতা–মাতার রক্ত। এ পর্যায়ে স্বয়ং রাসূলে করীম (স)–এর ঘোষণাবলীও অত্যন্ত উদাত্ত ও বলিষ্ঠ। এখানে তাঁর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَهَا اَلَا اِنَّكُمْ

مِنْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ طِيْنٍ اَلَا اِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللّٰهِ عَبْدٌ اتْقَاهُ ۔

(سيرة ابن هشام ج ٢ ، ص ٤١٢)

হে মানুষ! আল্লাহ্ তোমাদের থেকে জহিলিয়তের যাবতীয় আত্মম্ভরিতা ও তা নিয়ে গৌরব–অহংকার দূর করে দিয়েছেন। তোমরা সকলেই তো আদম সন্তান এবং আদম মাটি থেকেই সৃষ্ট। তবে আল্লাহ্র বান্দাগণের মধ্যে সব চেয়ে ভালো সেই বান্দাহ যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ–ভীরু।

اَلَا اِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بِاَبٍ وَالِدٍ وَلٰكِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ فَمَنْ قَصَّرَ عَمَلُهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ حَسَبُهُ ـ

জেনে রাখ, আরব হওয়াটা কোন পিতার দ্বারপথ নয়, তা কথা বলার বিশেষ একটা ভাষা মাত্র। তাই যার আমল অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ, তার বংশ এবং বংশীয় মর্যাদা তা পূরণ করতে অক্ষম।

اِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ اٰدَمَ اِلٰى يَوْمِنَا هٰذَا مِثْلُ اَسْنَانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى ـ

সমস্ত মানুষ আদমের সময় থেকে এই দিন পর্যন্ত চিরুনীর কাঁটাসমুহের মত সমান। আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই অনারবের উপর, গৌর বর্ণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই কৃষ্ণাঙ্গের উপর—কেবল তাকওয়ার দিক দিয়েই পার্থক্য হতে পারে।

اِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللّٰهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللّٰهِ ـ

মানুষ চরিত্রের দিক দিয়ে দুই পর্যায়ে বিভক্ত। এক পর্যায়ের মানুষ ঈমানদার, আল্লাহ্–ভীরু, আল্লাহ্র নিকট সম্মানার্হ। আর এক পর্যায়ের মানুষ পাপী–নাফরমান, দুশ্চরিত্র, আল্লাহ্র নিকট একেবারেই সম্মানহীন।

ইসলামের সার্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা প্রমাণকারী উপরোদ্ধৃত অকাট্য দলীল–প্রমাণ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের ইসলাম–দুশমন প্রাচ্যবিদ (Orientalist) স্যার উইলিয়াম মূয়র বলতে দ্বিধা করেন নি যে, 'ইসলামের বিশ্বজনীনতার ধারণা পরবর্তী কালে সৃষ্ট। এ পর্যায়ের বহু–শত আয়াত ও হাদীস থাকা সত্ত্বেও এমনকি মুহাম্মদ (স·)ও নিজ সম্পর্কে তা চিন্তা করেন নি। তিনি চিন্তা করেছিলেন, একথা মেনে নিলেও তাঁর চিন্তা ছিল প্রচ্ছন্ন। আসলে তার চিন্তার জগত ছিল শুধু আরবদেশ। তাঁর উপস্থাপিত দ্বীন কেবল আরবদের জন্যই রচিত। আর মুহাম্মদ তাঁর দাওয়াত নবুয়্যত লাভের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল আরবদের সম্মুখেই পেশ করেছেন, অন্য কারোর জন্য নয়।

স্পষ্ট মনে হচ্ছে, ইউলিয়াম মূয়র নিতান্ত অন্ধ বলেই ইসলামের বিশ্বজনীনতা দেখতে পাননি, তার দৃষ্টি সংকীর্ণতা ও দৃষ্টিভ্রমই এর একমাত্র কারণ।

মনে হচ্ছে তিনি একজন ইতিহাসবিদ হয়েও তদানীন্তন আরবের বিশ্ব-বানিজ্য পরিক্রমা সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত ছিলেন না। হযরত মুহাম্মদ (স·) আরবের বাইরের দেশসমূহ সম্পর্কে জানতেন না, নবুয়্যত লাভ করার পরও তিনি সমগ্র দৃষ্টি কেবল আরবদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন—এ ধরনের কথা ইতিহাসের দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কে না-জানে, তিনি নবুয়্যত লাভের পূর্বেও আরবদেশের বাইরে ব্যবসায় উপলক্ষে যাতায়াত করেছেন? তা সত্ত্বেও একথা কি বলা যেতে পারে যে, তিনি আরব দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশ সম্পর্কে জানতেন না? অথচ তাঁর দ্বীনী দাওয়াতের প্রথম পর্যায়েই তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন হাবশার বেলাল, রোমের সুহাইব এবং পারস্যের সালমান। এসব দেশ তো আরবের বাইরে অবস্থিত; তাছাড়া কুরআনের বাণীই তাঁকে ও তাঁর দাওয়াতকে বিশ্বজনীন সার্বজনীন বানিয়েছে — বানিয়েছে সর্বকালীন। কেননা কুরআন দাবি করছেঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ - (النحل-৮৯)

হে নবী! তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা সবকিছুর ভাষ্যকার মুসলিমদের জন্য হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ।

এই 'মুসলিম' দুনিয়ার যে কোন মানুষ-ই হতে পারে, হতে পারে ইসলাম কবুল করলেই। প্রথম পর্যায়েই মুহাম্মদ (স·) প্রচারিত দ্বীন সার্বজনীন ও সর্বজাতীয়—আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই পর্যায়ের ইতিহাসই তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

সার্বজনীনতা-বিরোধী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ও কুরআন-ভিত্তিক বিশদ আলোচনার দ্বারা আমরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছি যে, বিশ্বনবী (স)-এর নবুয়্যাত ও রিসালাত বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। তবে কুরআন মজীদে এমন কিছু আয়াতও দেখা যায়, যা থেকে এর বিপরীত কথা প্রমাণিত হওয়ার ধারণা জাগে। একারণে এপর্যায়ে সেই ধরনের আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করে সে সবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা জরুরী মনে করছি।

১. সতর্ককরণ ও ভয় প্রদর্শনের আয়াতঃ

কয়েকটি আয়াতে রাসূলে করীম (স)-কে তাঁর নিজের দেশস্থ জনগণকে সতর্ককরণ ও ভয় প্রদর্শনের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔

(القصص: ٤٦)

বরং এটা শুধু তোমার রব্ব-এর নিকট থেকে পাওয়া রহমত বিশেষ, (যে, তোমাকে এইসব তথ্য জানিয়ে দেয়া হচ্ছে) যেন তুমি সেই লোকদেরে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী—ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। আশা করা যাচ্ছে যে, তারা হয়ত দাওয়াত গ্রহণ করবে।

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ۔ (السجدة: ٣)

বরং কুরআন তোমার রব্ব-এর নিকট থেকে আসা সত্য কিতাব, যেন তুমি এমন লোকদের সতর্ক করতে ও ভয় প্রদর্শন করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনসতর্ককারী—ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি।

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ (يس: ٦)

যেন তুমি এমন লোকদের সতর্ক—ভয় প্রদর্শন করতে পার যাদের পূর্ব-পুরুষদের মাত্রই সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা হয়নি। ফলে তারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অসতর্ক ও অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۔ (مريم، ٩٧)

হে নবী। এই কালামকে তোমার মুখে সহজ পাঠ্য বানিয়ে দিয়েছি যেন তুমি তদ্বারা তাকওয়ার গুণসম্পন্ন লোকদেরে সুসংবাদ দিতে পার এবং নিজদের বশবর্তী লোকদেরে সতর্ক করতে পার।

এই আয়াত ক'টি এবং এই ধরনের আরও যত আয়াত কুরআন মজীদে রয়েছে, সেই সব থেকে প্রতিয়মান হয়, নবী করীম (স) বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর জন্য সতর্ককারী—ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং কেবল এ উদ্দেশ্যেই তাঁকে কুরআন দেয়া হয়েছিল।

জবাব

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, প্রথমে রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়্যাত-রিসালাতের সার্বজনীনতা প্রমাণকারী যে সব আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে সে সবের প্রেক্ষিতে এসব আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা দান খুবই সহজ এবং এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা এক'টি আয়াতে রাসূলে করীম (স)-কে বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর জন্য সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শক নিযুক্ত করার কথা বলা হয়ে থাকলেও তার তুলনায় রাসুলের সার্বজনীনতা প্রমাণকারী পূর্বোদ্ধৃত আয়াতসমূহ অধিক স্পষ্ট এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

দ্বিতীয়ত, উপরে সূরা ইয়াসীন-এর যে আয়াতটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে নবী করীম (স)-কে কেবল আরবদের জন্য ভয় প্রদর্শক বলা হলেও সেই সূরার-ই অপর একটি আয়াত তার সার্বজনীনতা প্রমাণ করে। তা হচ্ছেঃ

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۔ (يس، ٧٠)

যেন সে ভয় দেখায় এমন প্রত্যেকটি মানুষকে যে জীবিত আছে এবং কাফিরদের ব্যাপারে বলা কথা সত্য প্রমাণিত হয়।

এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, রাসূলে করীম (স) জীবিত থাকা সকল মানুষের জন্যই সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শক। আর 'জীবিত থাকা সকল মানুষ' বলতে নিশ্চয়ই বিশেষ জনগোষ্ঠীর লোকদেরই বুঝায় না, বুঝায় সারা দুনিয়ার জীবিত থাকা মানুষকে। এই প্রসঙ্গে এ আয়াতাংশও স্মরণীয়, যাতে বলা হয়েছেঃ

وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۔ (الكهف، ٤)

যারাই বলেছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তান আছে, তাদের সকলকেই সে ভয় প্রদর্শন করবে।

'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন' (নাউযুবিল্লাহ), এই কথা বলত ইয়াহুদীরা যেমন, তেমনি খৃষ্টানরাও। ফলে এ আয়াত অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (স) সারা দুনিয়ার

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তওহীদী দাওয়াত প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন, একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। রাসূলে করীম (স)–এর নবুয়্যাত ও রিসালাতের সার্বজনীনতা প্রমাণকারী এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

তার অর্থ এই দাড়ায় যে, যে আয়াত রাসূলে করীম (স)–কে বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসূল ছিলেন বলে আভাস দিচ্ছে, আসলে তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সার্বজনীন নবী ও রাসূল ছিলেন না। তাহলে কথাটি ওভাবে বলার কারণ কি? কারণ শুধু এতটুকুই যে, ওই কথা ক'টি বিশেষ প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল। আর এটা উন্নতমানের কালামের অলংকার–বিশেষত্ব (بلاغت)। যেখানে যে রূপ ভাষা ও ভঙ্গীতে কথা বলা প্রয়োজন বোধ হবে, সেখানে কথা বলায় সেই ভাষা ও ভঙ্গী ব্যবহার করা অলংকার–বিশেষত্ব রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ নবী করীম (স) মূলতঃ সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবী ও রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই তিনি যে সময় যাদের প্রতি এ দায়িত্ব পালনে রত ছিলেন, সেই সময় তিনি ঠিক সেই লোকদের জন্য বিশেষ নবী ও রাসূল ছিলেন। কিন্তু তার অর্থ কখনই এই হয়না যে, তিনি কোন বিশেষ মূহূর্তে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হলে অন্যান্য মানুষের প্রতি তাঁর দায়িত্ব খতম হয়ে গেছে এবং তিনি কেবল সেই লোকদেরই নবী–রাসূল হয়ে গেছেন চিরকালের জন্য। যেমন এই আয়াতটিঃ

قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ـ (الانبياء ٤٥)

এদের জানিয়ে দাও, আমি তো ওহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। কিন্তু বধির লোকেরা কোন ডাক শুনতে পায়না যখন তাদেরকে সতর্ককারী কথাবার্তা বলা হয়।

আয়াতটিতে 'তোমাদেরকে' শব্দ দ্বারা রাসূলের ভয় প্রদর্শন কার্যটিকে কেবল সম্মুখবর্তী লোকদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অপর আয়াতে সেই ভয় প্রদর্শনকে সাধারণভাবে সর্বমানুষের জন্য নির্বিশেষ করে দেয়া হয়েছেঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ ـ (يونس ٢)

লোকদের জন্য এ ব্যাপারটি কি বিস্ময় উদ্রেককারী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা তাদের মধ্য থেকে কোন এক ব্যক্তির প্রতি এই বলে ওহী পাঠিয়েছি যে, তুমি জনগণকে সতর্ক কর?

২. কিছু সংখ্যক আহলি কিতাবকে নেক্‌কার লোক বলাঃ

কুরআনের কোন কোন আয়াতে আহলি কিতাব সমাজের কিছু লোককে صالحين 'নেক্‌কার' বা 'সদাচারী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন এ আয়াতটিঃ

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ - يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ وَأُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - (ال عمران: ١١٣-١١٤)

সমস্ত আহ্‌লি কিতাব একই ধরনের লোক নয়। ওদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা সত্য-সঠিক পথে স্থির হয়ে আছে। তারা রাত্রি বেলা আল্লাহ্‌র আয়াত তেলাওয়াত করে এবং তার সমুখে সিজদায় অবনত হয়। আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি তাদের ঈমান আছে, নেক ও সৎ কাজের তারা আদেশ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কর্মকান্ডে তারা তৎপর থাকে। এরা সৎ ও নেক লোক।

এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে, রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়্যাত ও রিসালাত যদি বিশ্বজনীন হত, তাহলে দুনিয়ার সব মানুষের এবং অন্যান্য আসমানী ধর্ম পালনকারীদের কর্তব্য হত তাঁর উপস্থাপিত দ্বীন ও শরীয়তকে গ্রহণ ও অবলম্বন করা। আর তা-ই যদি হত তাহলে তো যারা তা গ্রহণ করেনি তাদেরকে 'নেককার' লোক বলে অভিহিত করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

আমাদের জওয়াব এই যে, উদ্ধৃত আয়াতের প্রেক্ষিত সামনে রাখলেই তার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা কুরআন তো বারবার ঘোষণা দিয়েছে যে, আহলি কিতাবের অধিকাংশ লোক-ই ফাসিক। যেমনঃ

وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ -

(ال عمران: ١١٠)

আহলি কিতাব লোকেরা যদি [মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি] ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য খুবই কল্যাণ-কর হত। ওদের মধ্যে মুমিন লোক আছে বটে; তবে ওদের অধিকাংশই ফাসিক।

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ -

(ال عمران: ١١١)

ওরা কস্মিনকালেও তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে কষ্ট দিতে পারবে বটে। আর ওরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতঃপর ওরা সাহায্যকৃত হবে না।

ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ۔ (آل عمران: ۱۱۲)

ওরা যেখানেই থাকুক, ওদের উপর লাঞ্ছনা–অপমান স্থির করে দেয়া হয়েছে।

কুরআন স্বীকার করেছে যে, আহলি কিতাবের মধ্যে কিছু লোক এমন অবশ্যই রয়েছে, যারা নেককার– সদাচারী, যদিও সংখ্যায় তারা খুবই নগণ্য; বরং ওদের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই হচ্ছে ফাসিক, লাঞ্ছিত। অর্থাৎ তারা সবাই এক ও অভিন্ন নয়। ওদের মধ্যে খুব সামান্য লোক এমন রয়েছে, যারা ওদের পৈতৃক দ্বীনের উপর অবিচল হয়ে আছে; তারা আল্লাহ্র আদেশ পালনে দৃঢ়, স্থির। ওরা আল্লাহ্র আয়াতও পাঠ করে। এই কারণে তারা 'নেককার'—সদাচারীরূপে গণ্য। তার অর্থ, ওদের দিল কলুষতামুক্ত। ফলে ওদের অবস্থা ভালো, ওদের আমল–আখলাকও উত্তম।

ওদের মধ্যকার এই অল্প সংখ্যক লোককে 'ভালো' বা 'নেককার' বলা হয়েছে। তবে ওদের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই ফিসক, নাফরমানী, সীমালংঘন, নবী হত্যা ইত্যাকার কঠিন অপরাধে অপরাধী বলে চিহ্নিত হয়েছে।

ফলে এই 'ভালো' বলাটা আসলে আপেক্ষিক ব্যাপার। তাতে একথা বুঝায় না যে, ওরা যে ওদের প্রাচীন ধর্মমতে স্থির হয়ে আছে, তার যথার্থতা কুরআন স্বীকার করে নিচ্ছে। তাছাড়া ইসলাম আগমনের ফলে ওদের সে ধর্ম বাতিল হয় নি, তদনুযায়ী আমল করলেই ওরা মুক্তি পাবে, এমন কথা কিন্তু বলা হয় নি; বরং উপরে উদ্ধৃত আলে ইমরান সূরার ১১০ আয়াতে ওদের প্রকৃত কল্যাণ যে দ্বীন–ইসলামের প্রতি ঈমান গ্রহণেই নিহিত,তা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। কাজেই ওদের মধ্যকার অতি নগণ্য সংখ্যক লোকের 'নেককার' হওয়ার কথা বলায় হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর নবুয়্যাত ও রিসালাতের সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি, তার বিপরীত কথাও বলা হয়নি।

অপর একটি জবাব

মুফাস্সিরগণ অবশ্য উক্ত প্রশ্নের ভিন্ন একটি জওয়াব দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যখন ইসলাম কবুল করেছিলেন তখন ইয়াহুদী সমাজের পণ্ডিত–পুরোহিতরা চারদিকে প্রচার করে দিয়েছিল যে, আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে দুষ্ট ও খারাপ লোকটি ইসলাম কবুল করেছে, কোন সৎ ব্যক্তি করেনি। এই কথার জওয়াব স্বরূপই উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এবং তা বলতে চেয়েছিল যে, সে তো ইয়াহুদী সমাজের স্বল্প সংখ্যক 'নেককার' লোকদের একজন, সে দুষ্ট বা খারাপ লোক ছিলনা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও ইবনে জুরাইজ প্রমুখ থেকে এইরূপ কথা

বর্ণিত হয়েছে। অপর কয়েকটি তাফসীরে বলা হয়েছে, নাজরানবাসীদের ৪০ জন, হাবশাবাসীদের ৩২ জন এবং রোমানদের আট ব্যাক্তি সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল এবং তাদেরকে 'নেককার' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের মতে এর কোনটিকেই যথার্থ বলে মনে করা যায়না। কেননা আলে-ইমরান সূরা'র পূর্বোদ্ধৃত আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের সাথে এ ব্যাপারে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়ই তারা 'নেককার' ছিল বলে স্পষ্ট মনে হয়, কুরআন তারই স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। বলেছে, সব আহলি কিতাব লোকই সমান নয়। অর্থাৎ সকলেই খারাপ নয়, ওদের মধ্যেও ভালো লোক আছে, তাদের সংখ্যা যতই স্বল্পতম হোক-না- কেন। আহলি কিতাব সমাজের যে সব লোক মুসলিম হয়েছিলেন, তাঁদেরকেই যদি এই আয়াতের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করা হত তাহলে কথাটি এরূপ ভাষায় বলার প্রয়োজন ছিলনা, সেজন্য ভিন্নতর ভাষা অবশ্যই গ্রহণ করা যেত। আর তাঁদের সম্পর্কে যে বলা হয়েছে যে, 'তাঁরা রাত্রি কালে তাঁদের নিকট রক্ষিত আল্লাহ্‌র আয়াত তেলাওয়াত করে, তা আমাদের ব্যাখ্যার সাথে কিছুমাত্র সাংঘর্ষিক হয় না। কেননা তাঁদের নিকট দোয়া-মুনাজাতের অনেক কিছু মওজুদ ছিল, বিশেষ করে হযরত দায়ূদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ জাবুর কিতাব, যাতে বেশীর ভাগ দোয়া-ই উল্লেখিত রয়েছে।

৩. মক্কা ও সন্নিহিত এলাকাবাসীদের বিশেষভাবে সতর্ক-করণের নির্দেশঃ

কুরআন মজীদে কতিপয় আয়াত এমন রয়েছে, যাতে 'উম্মুলকুরা' অর্থাৎ মক্কা ও তার সন্নিহিত এলাকাবাসীদের সতর্ককরণের নির্দেশ মুহাম্মাদ (স)-কে দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ.

(الانعام:٩٢)

(সেই কিতাবের ন্যায়) এও এমন একখনি কিতাব যা আমরা নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ, এর পূর্ববর্তী গ্রন্থাদির সত্যতা প্রমাণকারী। তা এ উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে যে, এর সাহায্যে তুমি জনপদ-সমূহের কেন্দ্র-মক্কা-ও তার চারপাশের অধিবাসীদের সতর্ক ও সাবধান করবে। যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হিফাযত করে।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيْهِ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ - (الشورى، ٧)

হ্যা, হে নবী। এভাবেই এই আরবী ভাষার কুরআনকে আমরা তোমার প্রতি ওহী করেছি, যেন তুমি সব জনপদের কেন্দ্রস্থল—মক্কা নগর—এবং তার আশেপাশের বসবাসকারীদেরকে সতর্ক করে দাও আর একত্রিত হওয়ার দিন (কিয়ামতের দিন) সম্পর্কে তাদের ভয় দেখাও, যার আগমনে কোনই সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে যাবে, অপর একদল যাবে জাহান্নামে।

এ দু'টি আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, মক্কা ও তার আশেপাশের বসবাসকারীদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই রাসূলে করীম (স)-কে পাঠানো হয়েছে, কুরআন তাঁর প্রতি এজন্যই নাযিল করা হয়েছে। এদের ছাড়া অপর কাউকে সাবধাণ, সতর্ক করবার কোন দায়িত্ব যেন তাঁর উপর নেই।

জবাব

আয়াত দুটির বক্তব্য সম্পর্কে যে ধারণা উপরে ব্যক্তি করা হয়েছে, বাহ্যতঃ তা মনে করা গেলেও প্রকৃত তাৎপর্য তা নয় আদৌ; বরং এ একটি আয়াতের অংশ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ 'যারাই পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তারাই তার (রাসূলের) প্রতিও ঈমানদার'। এই ঈমানদার লোকদের সতর্ক করাও রাসূলে করীম (স)-এর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এ পর্যায়ের লোক কেবল মক্কায়ই অবস্থান করে না, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানেরও অধিবাসী তারা। কাজেই নবী করীম (স) কেবল মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদের জন্য সতর্ককারী নবী ছিলেন, একথা যথার্থ নয়। এ থেকেও তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাতের সসীমতা ও সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। এথেকে শুধু এটুকুই বুঝা যায় যে, এ ছিল তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের দায়িত্বের একটি দিক মাত্র। এটাই তাঁর দায়িত্বের সামগ্রিক রূপ নয়। মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদের সতর্ক করলেই তাঁর দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালিত হয় না। তারপরও তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বমানবকে সতর্ক করা।

সূরা আল-আনআম-এর যে আয়াতটি উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, যা থেকে তাঁর সতর্কিকরণ দায়িত্বের সসীমতা বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে, সেই সূরারই অপর একটি আয়াতের উপরও আমাদের নজর রাখতে হবে। তা হচ্ছেঃ

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ -

তাদের জিজ্ঞাসা কর, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য? বল, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্-ই হচ্ছেন প্রকৃত সাক্ষ্যদাতা। আর এই কুরআন আমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যার নিকটই তা পৌছবে, তাদের সকলকে সতর্ক করি।

এ আয়াত স্পষ্ট করে বলছে যে, রাসূলে করীম (স) এই কুরআন দ্বারা তাকেই সতর্ক করেন, যার নিকটই তা পৌছায়। তারা আরবী ভাষাভাষী হোক, কি অ-আরবী ভাষাভাষী, প্রাচ্যদেশী হোক, কি পাশ্চাত্য দেশীয়। একই সূরা'র এ আয়াত দুটির তাৎপর্য অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, পরস্পর সাংঘর্ষিক হতে পারে না। বস্তুতঃ এদ'টি আয়াতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। আর এই পারস্পরিক বৈপরীত্য না থাকাই কুরআনের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার একটি অন্যতম অকাট্য প্রমাণও বটে। বলা হয়েছেঃ

قُلْ لَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا - (النساء: ٨٢)

বলে দাও, কুরআন যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর নিকট থেকে এসে থাকত, তাহলে লোকেরা তাতে বিপুল পরিমাণ স্ববিরোধিতা দেখতে পেত।

বস্তুতঃ রাসূলে করীমের দাওয়াতে নবুয়্যাতী দায়িত্বের দিক দিয়ে অপরাপর নবী-রাসূলগণ থেকে ভিন্নতর কোন ভাবধারা ছিলনা। তিনি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মতই তাঁর দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত ঈসা মসীহ (আ) আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন বনী-ইসরাঈল থেকেও এক বিরাট-বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বনী-ইসরাঈলীদের প্রতি প্রেরিত বলেই পরিচিত হয়েছেন। অথচ তিনি যেমন তাদের প্রতি প্রেরিত ছিলেন, তেমনি তাদের ছাড়া অন্যান্য লোকদের প্রতিও প্রেরিত ছিলেন। তাঁর আহ্বান ছিলঃ

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ - (الصف، ٦)

হে ইসরাঈলীরা, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত, আমার সমুখবর্তী তওরাতের সত্যতা প্রতিষ্ঠাকারী এবং আমার পরে আসবে আহমাদ নামের সেই রাসূলের আগমনের শুভ সংবাদদাতাও।

এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ) বনী-ইসরাঈলীদের সম্বোধন করেছেন, যদিও তিনি কেবল তাদের প্রতি প্রেরিত ছিলেন না, অন্যদের জন্যও তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন। আর তাঁর বনী ইসরাঈলীদের প্রতি প্রেরিত হওয়াটা অন্যদের প্রতিও প্রেরিত হওয়ার পরিপন্থী নয়। এই দু'য়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কোন আদেশ কোন কিছুর প্রতি

প্রদত্ত হলে একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে আদেশ অন্য কিছুর প্রতি প্রদত্ত হতে পারে না।

ইসলামের নবীও ঠিক অনুরূপ কাজই করেছেন। তিনি সর্বকালের সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত রাসূল হওয়া সত্ত্বেও এবং কুরআনের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করার নির্দেশ আল্লাহ্র নিকট থেকে পেয়েও তিনি নির্দেশিত হয়েছিলেন যে, মক্কা ও তার আশপাশের লোকদেরকে সতর্ক কর। অর্থাৎ মক্কার ও তার নিকটবর্তী এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হওয়া এবং সমগ্র মানবতার প্রতি প্রেরিত হওয়ার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য বা বৈপরীত্য নেই—নেই কোন সাংঘর্ষিকতা।

রাসূলে করীম (স) বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই করেছেন। তিনি তাঁর নিকটবর্তী বংশের লোকদের সতর্ক করার জন্য আদিষ্ট হয়ে তাদেরকে নিজের ঘরে একত্রিত করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেনঃ

إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً -

আমি আল্লাহ্ প্রেরিত তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণভাবে।

রাসূলে করীম (স)–এর জীবন–সাধানার এ–ই ছিল অনুসৃত ধারা। তাঁর পূর্ববর্তী নবী–রাসূলগণও এই ধারায়ই চলেছেন। তাঁরা তাঁদের তওহীদী দাওয়াতকে অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করেছেন, দাওয়াত পৌছানোর যাবতীয় শর্তের প্রতি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য রেখে। যখন বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর সমুখে দাওয়াত পেশ করার সুযোগ এসেছে, তখন তা–ই করেছেন। আবার যখন নির্বিশেষে সমস্ত মানবতাকে সম্বোধন করার প্রয়োজন হয়েছে বা তার সুযোগ এসেছে, তখন ঠিক সেই প্রেক্ষিতেই কথা বলেছেন।

রাসূলে করীম (স)–এর নিম্নোদ্ধৃত কথাটি থেকে তা–ই প্রমাণিত হয়। বলেছেনঃ

بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لِيْ فَإِلَى الْعَرَبِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لِيْ فَإِلَى قُرَيْشٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لِيْ فَإِلَى بَنِيْ هَاشِمٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لِيْ فَإِلَيَّ وَحْدِيْ -

الطبقات الكبرى - ج١ - ص ١٩٢

আমি তো সমগ্র মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তারা আমার দাওয়াত গ্রহণ না করলে সমগ্র আরবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তারা তা গ্রহণ না করলে কুরাইশ বংশের লোকদের প্রতি, তারা গ্রহণ না করলে তারই অংশ বনু হাশিমের প্রতি। আর তারাও গ্রহণ না করলে আমি একা আমার প্রতিই প্রেরিত হয়েছি।

আর একটি জবাব

'যেন তুমি উম্মুল কুরা' ও তার আশেপাশের অধিবাসীদের সতর্ক কর' কথাটিই শামিল করে দুনিয়ার সমস্ত নগর–জনপদকে। কেননা 'কারিয়াতা' (বহু বচনে 'কুরা') নগর–শহর–জনপদ মাত্রকেই বলা হয়। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ - (يوسف ٨٢)

আপনি সেই বসতির লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যেখানে আমরা ছিলাম। সেই কাফেলার নিকট জিজ্ঞাসা করুন যাদের সাথে আমরা এসেছি। আমরা ঠিক সত্য কথাই বলছি।

এ আয়াতে যে 'কারিয়া' বা জনপদের কথা বলা হয়েছে, তা ছিল 'মিশর'। সেকালে মিশর একটি বড় ও বিশাল নগর ছিল। তার বিভিন্ন ও বহু সংখ্যক দ্বার–পথ ছিল, যেমন উক্ত সূরার ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়, বহু সংখ্যক সহীহ্ বর্ণনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ্ সর্বপ্রথম পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ ও সমতল বানিয়েছিলেন মক্কার নিম্নদেশ থেকে। এর অর্থ, মক্কাই পৃথিবীর প্রথম ভূ–খন্ড যা পানির গভীর তল থেকে ভেসে উঠেছিল। পরে তার অপরাপর অংশ জেগে উঠেছিল ক্রমাগতভবে। এই কারণেও মক্কা পৃথিবীর সমস্ত অংশের জন্য মা'র স্থলাভিষিক্ত। এটিই হল পৃথিবীর সমস্ত জনপদের মূল ও কেন্দ্র–বিন্দু প্রকৃতিগতভাবে।

আর এই হিসাবে মক্কা যখন 'উম্ম্' বা 'মা' হল, তখন 'উম্মুল কুরা' বলতে তা–ই হল পৃথিবীতে বর্তমান সমস্ত জনপদের কেন্দ্রভূমি। আর 'তার আশেপাশে' বলতে মক্কার বাইরে পৃথিবীর অপরাপর অংশকে বোঝানো হয়েছে। ফলে রাসূলে করীম (স)–এর নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র হয়ে গেল সারা পৃথিবীর সমস্ত জনপদ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতাংশের এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। অতএব এ আয়াতটি থেকেও প্রমাণিত হল যে, রাসূলে করীম (স)–এর নবুয়্যাত ও রিসালাত ছিল সার্বজনীন।

আরবী ভাষাবিদ ইমাম ইবনে ফারেস এর ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'উম্মুল কুরা' বলতে আল্লাহ্ মক্কাকেই বুঝিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি নগরই তার আশেপাশের জনবসতিসমূহের জন্য উম্মুল কুরা, কেবল মক্কাই সমগ্র পৃথিবীর জন্য উম্মুল কুরা নয়। একথার প্রমাণ হিসাবে তিনি কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি পেশ করেছেনঃ

وَمَا رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ اُمِّهَا رَسُوْلًا - (القصص: ٥٩)

তোমার রব্ব কোন জনপদের ধ্বংসকারী হন না যতক্ষণ না তার কেন্দ্রস্থলে তিনি একজন রাসূল পাঠান।

এ হচ্ছে আল্লাহ্র সুন্নাত। আল্লাহ্দ্রোহী জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার ব্যাপারে এ হচ্ছে আল্লাহ্র সাধারণ নিয়ম। এ নিয়ম কেবলমাত্র মক্কা ও তার আশেপাশের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বা কার্যকর নয়। মোট কথা, প্রত্যেকটি নগর-ই তার চতুর্পার্শ্বস্থ জনপদের জন্য 'মা' সমতুল্য।

প্রত্যেক নবী তাঁর জনগণের ভাষাভাষীই হয়েছেন

এ-ও আল্লাহ্ তা'আলার একটি স্থায়ী সুন্নাত যে, তিনি যে জনগোষ্ঠীর প্রতিই কোন নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন, তাদেরই ভাষাভাষী একজনের উপর নবুয়্যাত বা রিসালাতের দায়িত্ব অর্পন করেছেন। তিনি যদি বিশেষভাবে সেই জনগোষ্ঠীর মুক্তি বিধানের দায়িত্বসহ প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে তখনই উপরিউক্ত নীতির বাস্তবতা প্রতিপন্ন হবে। আর যদি বিশেষ জনগোষ্ঠী সহ অন্যান্য মানুষের প্রতিও তাঁকে নবী বা রাসূল করে পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে সেই সকল মানুষের বিভিন্ন বিচিত্র ভাষায় কিতাব নাযিল করার কোন প্রয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে তরজমা বা অনুবাদ মূলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়াবে অন্য ভাষাভাষীদের বেলায়। মূল কিতাব নবীর নিকটবর্তী জনগণের ভাষায় অবতীর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা নবী বা রাসূলকে সর্বপ্রথম তো তাঁর নিকটবর্তী লোকদেরই আহবান জানাতে হবে। তাদের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে বা ভ্রূক্ষেপ না করে—তাদের এড়িয়ে গিয়ে অন্যান্য দূরবর্তী লোকদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা প্রথমেই শুরু করে দেয়া যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

নবীর প্রথম দাওয়াত যাদের সমুখে উপস্থাপন করা হয়, তাদের বা তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোকের ঈমান গ্রহণ দূরবর্তী লোকদের সে দাওয়াত কবুলের যেমন কারণ বা উদ্বোধক-উদ্দীপক হতে পারে, তেমনি তাদের পর্যন্ত দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যম বা বাহনও হতে পারে এই নিকটবর্তী প্রথম দাওয়াত গ্রহণকারী লোকেরা। পক্ষান্তরে তাঁর প্রথম দাওয়াত শ্রবণকারী লোকদের সকলেই যদি সে দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসে, তাহলে তা দূরবর্তী লোকদের মনে সে দাওয়াত কবুলের আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়ার কারণ হতে পারে। তারা বলতে পারে, নবীর নিজস্ব—বা প্রথম দাওয়াতের লোকেরা—কিংবা তাঁর নিজের ভাষাভাষী লোকেরাই যখন তা কবুল করেনি, তখন আমরা তা কেন কবুল করতে যাব। এমতাবস্থায় দূরবর্তী লোকদের নিকট সে দাওয়াত পৌঁছানোর বা বহন করে নিয়ে যাওয়ার বাহনও কেউ হয় না।

নবীর প্রতি যদি তাঁর আপন লোকদের ভাষায় কিতাব নাযিল না করা হত, করা হত দুনিয়ার অন্যান্য লোকদের কোন একটি ভাষায়, তাহলে তাঁর আপন লোকদের মন

সেদিকে কিছু মাত্র আকর্ষন বোধ করত না, তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করত না। এ বিষয়ে আল্লাহ্ নিজেই বলে দিয়েছেনঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ - فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ -

(الشعراء : ١٩٨ - ١٩٩)

আমরা যদি এই কিতাব কোন অনারব লোকের উপর নাযিল করতাম এবং সে তাদেরকে এই (সুন্দরতম আরবী কালাম) পড়ে শোনাত, তাহলেও তারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণ করত না।[১]

ঠিক এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)–কে নবী ও রাসূল নিযুক্ত করে তাঁর নিজস্ব জনগণের ভাষায়—আরবীতে—এই কিতাব নাযিল করেছেন। ফলে এই লোকদের আর কোন ওযর–আপত্তির কারণ থাকল না তা বুঝতে ও তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করতে।

বস্তুতঃ এই সামষ্টিক নিগূঢ় তত্ত্বের দৃষ্টিতে নবী করীম (স)–এর জন্য সর্বাধিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল তাঁর নিজের লোকদেরকে হেদায়েত করার জন্য সর্বাধিক দৃষ্টিদান ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা–প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার—তাদেরকে জাহিলিয়াতের কবল থেকে উদ্ধার করার, যেন তারাই অন্যান্য লোকদের হেদায়েতের কারণ ও মাধ্যম হয়ে দাঁড়াতে পারে। যাবতীয় মানবীয় ব্যাপারে এটাই হয়ে থাকে স্থায়ী কর্মপন্থা, নিছক সাধারণ মূলনীতি মাত্র নয়। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি সেদিকে ইঙ্গিত করছেঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

(ابراهيم:٤)

আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাঁকে তার জনগণের ভাষাভাষী করেই পাঠিয়েছি, যেন সে তাদের নিকট সব কিছু খুলে প্রকাশ করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা গুমরাহ করবেন আর যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দিবেন। তিনি তো মহাশক্তিধর, দুর্জয়, মহাবিজ্ঞানী।

আয়াতটির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল প্রেরণে কোন অস্বাভাবিকতা ও বিস্ময়করতার প্রশ্রয় দেননি। রাসূলগণের উপর কোন লোকের প্রকৃত হেদায়েত প্রাপ্তি বা গুমরাহ হওয়ার দায়িত্বও তিনি চাপিয়ে দেন নি। তিনি তাঁদের পাঠিয়েছেন তাঁদের ভাষাভাষী করে, যেন তাঁরা জনগণের সাথে মাতৃভাষায় কথা বলতে পারেন। ওহীর মূল লক্ষ্যকে তাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে ও তা স্পষ্ট ও প্রকট করে তুলতে পারেন।

১. কেননা তখন তারা এই কথা বলত যে, এই অনারব ব্যক্তি কেমন করে এমন উন্নত ভাষার আরবী কিতাব পাঠ করছে?- নিশ্চয়ই তার উপর কোন জ্বিন ভর করেছে। (তাফহীমুল কোরআন)

ফলে তাঁদের দায়িত্ব হয় শুধু বর্ণনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার। তবে তাঁদের পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য যে হেদায়েত দান, তা কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার হাতেই রেখে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল তাঁর সাথে বিন্দুমাত্রও শরীক নন। শরীক নয় অন্য কোন লোকও।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাসূল যাদের প্রতি প্রেরিত হন, তাঁকে বিশেষভাবে কেবল তাদের ভাষাভাষীই হতে হবে এবং তাঁর দাওয়াত কেবল তাদের জন্যই সংরক্ষিত ও নির্দিষ্ট হতে হবে, এমন কথা আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায় না। আয়াতটি থেকে এ–ও বুঝা যায় না যে, রাসূল যে সমস্ত লোকের জন্য প্রেরিত হন, সেই বিচিত্র–বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সকলের ভাষার সাথে তাঁর (রাসূলের) ভাষার একত্ব বা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। ভাষার এই অভিন্নতা হতে হবে কেবল তাঁর নিজস্ব জনগণের ভাষার সাথে, অন্য সকলের ভাষার সাথে নয়। ফলে এটা খুবই সম্ভব যে, রাসূল নিজস্ব জনগণের বাইরের লোকদের প্রতিও প্রেরিত হয়ে থাকবেন। তিনি যাদের সাথে ভাষার দিক দিয়ে অভিন্ন কেবল তাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন, অন্য ভাষাভাষীদের প্রতি নয়, এ কথা উদ্ধৃত আয়াতটি থেকে আদৌ বুঝা যায় না, তা প্রমাণিতও হয়না। বহু সংখ্যক নবী–রাসূল সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। হযরত ইবরাহীম (আ) হিজাজের আরবদেরকে হজ্জ করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। তাঁর নির্মিত কাবার জিয়ারতে লোকদের পাঠানোরও আহ্বান দিয়েছিলেন। ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ)–কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমাদের নবী–রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরও তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন। ফলে তাদের মধ্য থেকে অনেকেই সে আহবান গ্রহণ করেছিলেন।

প্রসংগত উল্লেখ্য, কেউ কেউ আয়াতটি থেকে উল্টা অর্থ গ্রহণ করতে চেষ্টা পেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন, আয়াতটি যখন স্পষ্ট ভাষায়ই বলছে যে, রাসূলকে অবশ্যই তাঁর নিজস্ব লোকদের ভাষাভাষী হতে হবে, অন্য ভাষাভাষীকে পাঠানো আল্লাহ্র নিয়ম নয়, তাহলে তো সে রাসূল কেবল সেই ভাষাভাষীদের জন্য, অন্য ভাষাভাষীদের জন্য তিনি রাসূল হতে পারেন না। এমনকি, আমাদের রাসূল (স) যদি সমগ্র বিশ্ব–মানবের প্রতি রাসূল হওয়ার দাবি করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্র উপরোক্ত ঘোষণানুয়ায়ী তাঁকে 'আল্লাহ্ প্রেরিত'ই মনে করা যায় না। কেননা তিনি তো সমগ্র বিশ্ব–মানবের ভাষাভাষী ছিলেন না।

আমরা বলব, আয়াতটির তাৎপর্য সঠিক রূপে না বুঝা—বরং ভুল বুঝার দরুণই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কেননা আয়াতটি এ দাবি করছে না যে, রাসূল যাদের প্রতি প্রেরিত তাদের সকলের ভাষাভাষী হতে হবে তাঁকে, বরং তাঁর নিজস্ব লোকদের—যাদের নিকট তিনি প্রথম দাওয়াত পেশ করবেন. কেবল তাদেরই ভাষাভাষী হতে

হবে তাঁকে। অন্যদেরও ভাষাভাষী হতে হবে, তা আয়াতটি বলছে না, বরং যারা অন্য ভাষাভাষী লোক, তাদের প্রতিও তিনি প্রেরিত হয়ে থাকতে পারেন। তাঁর নিজস্ব লোকদের ভাষাভাষী হওয়ার দরুণ অন্য ভাষাভাষীদের প্রতি তাঁর প্রেরিত হওয়ার পথে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। তিনি নিজ জনগণের ভাষাভাষী হয়েও অন্যান্য ভাষাভাষীদের প্রতিও প্রেরিত হতে পারেন। ইসলামের নবীর কিতাবের ভাষা ও তাঁর দাওয়াতের ভাষা তাঁর নিজ লোকদের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া আবশ্যক মাত্র।

আয়াতে যে قوم শব্দটি এসেছে, তারা সেই লোক, যাদের মধ্যে রাসূল জন্মগ্রহণ করেছেন, লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছেন; তাঁর প্রাথমিক জীবন তিনি যাদের মধ্যে যাপন করেছেন। তাদের সকলকে তাঁর বংশের লোক হতে হবে, তা-ও নয়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে 'কালাদা' থেকে মৃত সাগর উপকূলের অধিবাসী (المؤتفكات) দের প্রতি হিজরাত করে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ 'কালাদাহ' অধিবাসীরা ছিল সুরিয়ানী ভাষাভাষী এবং মৃতসাগর উপকূলে বসবাসকারীরা ছিল ইবরানী (হিব্রু) ভাষাভাষী। আর উভয় ভাষাভাষী লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর قوم বলে অভিহিত করেছেন এবং এই দুই ভিন্ন ভিন্ন লোকদের জন্যই তিনি রাসূল ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূল যাদের প্রতি প্রেরিত তাদের সকলেরই ভাষাভাষী হতে হবে সে রাসূলকে, এমন কথা কিছুই নেই।

নূহ, মূসা ও ঈসা (আঃ)–এর নবুয়্যাত কি বিশ্বজনীন ছিল?

পূর্ববর্তী দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর নবুয়্যাত ও রিসালাত ছিল বিশ্বজনীন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—সমগ্র পৃথিবীর মানুষের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন।

তবে এই আলোচনার পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তি পর্যায়ে তিনজন নবী–রাসূল সম্পর্কেও আলোচনা প্রয়াজন বোধ হচ্ছে। তাঁরা হলেন হযরত নূহ, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)। এঁদের নবুয়্যাতও কি বিশ্বজনীন ছিল কিংবা ছিল তাঁদের সময়কার নিজস্ব জনগণের প্রতি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এবং যেসব এলাকায় তাঁরা এসেছিলেন সেই সব এলাকার মধ্যে সীমিত?

আমরা যেহেতু কেবল মাত্র কুরআনের ভিত্তিতে আলোচনা করছি, তাই তওরাত, ইনজীল–কিংবা 'ধর্মপুস্তক' নামে প্রচলিত 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট' ও 'নিউ টেষ্টামেন্ট'–এ কি বলা হয়েছে, সেদিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাইনা। কেননা কুরআন–ই হচ্ছে বিশ্ব–মানবের প্রতি নাযিল করা মহান আল্লাহ্র সর্বশেষ কালাম। অতএব সকল বিষয়ে কুরআনের ঘোষণাই আমাদের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত।

হযরত নূহ (আ)—এর নবুয়্যাত

এ পর্যায়ে প্রথম কথা, হযরত নূহ (আ)–এর নবুয়্যাত তাঁর নিজস্ব ও তৎসময়কার লোকদের জন্য ছিল, অন্যদের জন্য নয়। এই মতটি গ্রহণ করা যায় নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ (نوح-١)

আমরা নূহকে তার জনগণের প্রতি পাঠিয়েছি।

সূরা 'হূদ'–এর ২৫ ও ৪৮ আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত নূহ বিশেষভাবে তাঁর জনগণের জন্য প্রেরিত নবী ও রাসূল ছিলেন।

তবে তূফানের পর তাঁর নবুয়্যাত বিশ্বজনীন রূপ লাভ করে শুধু এই জন্য যে, তূফান–উত্তর কালে কেবলমাত্র তাঁর প্রতি ঈমানদার তাঁর সঙ্গী–সাথীরাই বেঁচে ছিলেন। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য সব মানুষই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল একটা বিশেষ অবস্থার অনিবার্য পরিণতি; এতে তাঁর বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য নবী হওয়ার দিকটিতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠেছে, এই তুফানটি কি সমগ্র বিশ্বে হয়েছিল এবং বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষই কি তাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? যদি তা–ই হয়, তাহলে তাঁকে নবীরূপে স্বীকার না করার অপরাধ করে থাকলে তাঁর নিজের জনগণ করেছিল—তিনি তো কেবল তাদের জন্যই নবী ছিলেন, তাহলে তাদের অপরাধের দরুণ সৃষ্ট আযাবে সারা দুনিয়ার মানুষ ধ্বংস হল কেন? — এটা তো আল্লাহ্র ঘোষিত চিরন্তন নীতির পরিপন্থী। এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, তিনি বিশ্বনবী ছিলেন? — অথবা সে তুফান হয়েছিল কেবলমাত্র সেই স্থানে যেখানে নূহ (আ)–এর জনগণ বাস করত, সে তুফান সারা বিশ্বে সংঘটিত হয়নি? কুরআনের আয়াত থেকেও তা–ই প্রমাণিত হয়। বলা হয়েছেঃ

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ـ

(هود - ٣٦،٣٧)

নূহের প্রতি ওহী পাঠানো হল যে, তোমার জনগণের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া অন্য কেউ–ই কক্ষণো ঈমান আনবে না। অতএব তাদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত হবে না এবং আমাদের পর্যবেক্ষণাধীন ও আমাদের ওহী অনুযায়ী তুমি নৌকা নির্মান শুরু কর। মনে রেখো, যারা জুলুম করেছে তাদের পক্ষে তুমি যেন আমার নিকট কোন দোয়া না কর। ওরা সকলেই নিমজ্জিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ রিসালাত সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন হওয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর সর্বত্র—সকল দেশের জনগণের নিকট তার দাওয়াত পৌছানো সম্ভব করে তোলার উপায়, পন্থা ও উপকরণের। কিন্তু হযরত নূহ (আ)–এর সময়ে তা আদৌ ছিল না। তাহলে তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাতকে বিশ্বজনীন বলা যাবে কি করে?

তবে কোন কোন তাফসীরকার হযরত নূহের কুরআনে উদ্ধৃত দোয়া ও কথার ভিত্তিতে তাঁকে বিশ্বজনীন নবী ও রাসূল প্রমাণ করতে চেষ্ট করেছেন। কেননা তাঁর একটি দোয়া ছিল এইঃ (نوح: ٢٦) رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

হে আল্লাহ্! তুমি এই কাফিরদের মধ্য থেকে একজনকেও ভূ–পৃষ্ঠে বাঁচিয়ে রেখোনা।

তুফানের দিন তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ـ (هود - ٤٣)

আজকের দিনে আল্লাহ্র ফয়সালা থেকে কারোরই রক্ষা নেই। কেবল তারাই রক্ষা পাবে যাদের প্রতি (আল্লাহ্) রহমাত করবেন।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্ বলেছেনঃ (الصفت-٧٧) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ -
এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদেরই আমরা অবশিষ্ট রেখেছি পরম্পরানুযায়ী।

এ পর্যায়ে কিছু হাদীসেরও উল্লেখ হয়েছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'নূহ সর্বপ্রথম রাসূল, আল্লাহ্ তাঁকে পৃথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেছেন'। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সারা পৃথিবীবাসীদের প্রতিই রাসূল ছিলেন। কিন্তু এ হাদীসকে রদ্দ্ করা হয়েছে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত অপর একটি কথা দ্বারা। তিনি বলেছেনঃ

وَكَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً -

পূর্বে সব নবীই তাঁদের স্ব স্ব জনগণের প্রতি বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছেন। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানুষের প্রতি সর্বাত্মক ও সাধারণভাবে।

তূফান সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ–ও বলা হয়েছে যে, তাতে যে الارض শব্দটি রয়েছে তা সমগ্র পৃথিবী বুঝায় না, বুঝায় কেবল সেই স্থান বা এলাকা যেখানে হযরত নূহ এবং তাঁর জনগণ বসবাস করত। কুরআনে الارض শব্দটি বিশেষ ভূ–খন্ড বোঝার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ফিরাউন হযরত মূসা ও হারুন (আ) সম্পর্কে বলেছিলঃ

وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ - (يونس-٧٨)

আর যমীনে তোমাদের দুইজনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব কায়েম হবে?

এ আয়াতে الارض শব্দটি নিশ্চয়ই সমগ্র পৃথিবী বোঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, এ শব্দ দিয়ে শুধু মিশর—ফিরাউন শাসিত ভূ–খন্ডই বোঝানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে হযরত নূহ–এর দোয়ায় ব্যবহৃত الارض শব্দটির অর্থ হবেঃ 'আমার জনগণের মধ্যে একজন কাফিরকেও পৃথিবীতে বসবাসকারী রেখোনা।' আর তাঁর ঘোষণা এবং পরবর্তী আল্লাহ্র ঘোষণায়ও কেবল তাঁর নিজস্ব লোকদের কথাই বলা হ য়েছে।

তবে কোন কোন তাফসীর লেখক এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত নূহ (আ) এমন সময় এসেছিলেন যখন পৃথিবীতে মানুষের বসতি কেবল সেই স্থানেই সীমিত ছিল যেখানে তিনি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তূফানও কেবল সেই এলাকাতেই এসেছিল। পরবর্তী কালে সেই লোকদের বংশধররাই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তূফানের কথাও সারা দুনিয়ার মানুষের নিকট পৌরাণিক কাহিনী হিসাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে। অতএব কেবল এই হিসেবেই তাঁর নবুয়্যাত ও রিসালাতকে বিশ্বজনীন বলা চলে। আর এটা যে বিশেষ অবস্থার পরিণতি, বিশ্বনবী রূপে প্রেরিত হওয়ার পরিণতি নয়, তা শুরুতেই আমরা বলে এসেছি।

হযরত মূসা (আ)–এর নবুয়্যাত

অতঃপর হযরত মূসা (আ)–এর নবুয়্যাত ও রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করব। এ আলোচনা দু পর্যায়ে হবেঃ

প্রথম, তওহীদের প্রতি তাঁর সাধারণ দাওয়াত এবং

দ্বিতীয়, তাঁর পেশকৃত শরীয়াতের সাধারণত্ব ও আইন–বিধানের ব্যাপকতা।

তাঁর দাওয়াতের সাধারণত্ব বলতে আমরা বুঝি তাঁর তওহীদী দাওয়াতের কথা। তিনি বনী–ইসরাঈল ও অন্যান্যদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন বলে তাঁর তওহীদী দাওয়াত সকলের প্রতি ছিল সাধারণ ও নির্বিশেষ। সকল মূর্তি ও প্রতিকৃতি চূর্ণ করার ব্যাপারে তাঁর দাওয়াত ছিল সকলেরই জন্য সমান।

আর তাঁর শরীয়াতের ব্যাপকতা বলতে আমরা বুঝতে চেয়েছি, হযরত মূসা (আ) তওরাত কিতাবের মাধ্যমে যেসব আইন–বিধান উপস্থাপন করেছিলেন, তা সবই বনী–ইসরাঈল ও অন্যান্য সকলের জন্যই গ্রহণযোগ্য ছিল। তবে তওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাধারণত্ব তাঁর শরীয়াতের ব্যাপকতার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। এ কারণেই আমরা এ আলোচনাকে দু'পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় তওহীদ কবুল ও সকল প্রকারের মূর্তি–প্রতিকৃতির অস্বীকৃতি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছেঃ

হযরত মূসা কলীমুল্লাহ (আ)–এর তওহীদী দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল মাত্র বনী ইসরাঈল বংশের লোকদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন ঃ

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ـ

(البقرة ـ ٩٢)

হে ইসরাঈল বংশের লোকেরা, তোমাদের নিকট মূসা অকাট্য দলীল–প্রমাণ লয়ে এসেছে। তারপরও তোমরা বাছুরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ, আর তা করে তোমরা হয়েছ জালিম।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ـ

(الصف ـ ٥)

মূসা যখন বলল তার জনগণকে, হে আমার জনগণ! তোমরা কেন আমাকে নিপীড়ণ কর, অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল।

এই দুটি এবং এই ধরনের আরও কতিপয় আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ) কেবলমাত্র বনী–ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে এসেছিলেন; এসব আয়াত থেকে যদিও এটা বুঝা যায় না যে, বনী–ইসরাঈল ছাড়া অন্যদের প্রতি তিনি প্রেরিত ছিলেন না। যেমন হযরত শুয়াইব (আ) মাদইয়ানবাসীদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সেই লোকদেরকে সম্বোধন করে দাওয়াত দিয়েছিলেনঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ (الاعراف-٨٥)

হে জনগণ! তোমরা এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ্ নেই।

অবশ্য হযরত শুয়াইব (আ) সেই সাথে 'আইকা'বাসীদের প্রতিও প্রেরিত হয়েছিলেন। কেননা তিনি তাদেরও দাওয়াত দিয়েছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ـ (الشعراء-١٧٦-١٧٧)

আইকা'র অধিবাসীরা নবী–রাসূলকে অমান্য করল। যখন শুয়াইব তাদের বললঃ তোমরা কি ভয় পাও না?

বলা যেতে পারে, হযরত মূসা (আ) কিবৃতী লোকদেরকেও তওহীদী আকীদা গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন আর তারা ছিল বনী–ইসরাঈলের বাইরের লোক; তারা তো আর বনী–ইসরাইল বংশের লোক ছিল না। তাতে মনে করা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র বনী–ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত নবী–ই ছিলেন না। এছাড়াও কুরআনের আরও এমন বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তাঁর দাওয়াত ছিল সাধারণ ও সর্বজনীন। যেমন বহু সংখ্যক আয়াত থেকেই জানা যায় যে, তিনি ফিরাউন ও তার দলবলের প্রতিও প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমনঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

(الزخرف: ٤٦)

এবং আমরা নিঃসন্দেহে মূসাকে আমাদের আয়াতসমূহ সহ ফিরাউন ও তার দলবলের নিকট পাঠিয়েছি। সে বলল, আমি নিশ্চয়ই সারে জাহানের রব্–এর রাসূল হয়ে এসেছি।

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ـ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ـ (المزمل: ١٥-١٦)

তোমাদের নিকট আমরা তেমনিভাবে একজন রাসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা করে পাঠিয়েছি, যেমন করে আমরা ফিরাউনের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। পরে ফিরাউন সেই রাসূলকে অমান্য করল। তখন আমরা তাকে শক্ত করে পাকড়াও করলাম।

কুরআনের এ দুটি আয়াতের উদ্ধৃতি এবং এ ধরনের আরও বহু সংখ্যক আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে,হযরত মূসা (আ)–এর দাওয়াত ছিল আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুলের

এবং সকল প্রকার মূর্তি–প্রতিমা পূজার শির্ক পরিহার করার। আর তা যেমন ছিল বনী–ইসরাঈলের প্রতি, তেমনি মিশরের কিবৃতীদের প্রতিও। ফিরাউন হযরত মূসা (আ)–এর দাওয়াত অস্বীকার করে তাঁর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং তাঁর সাথে মুকাবিলা করার জন্য চতুর্দিক থেকে যাদুকরদের একত্রিত করেছিল। যাদুকররা তাঁর নিকট পরাজিত হয়ে সিজদায় পড়ে গিয়েছিল এবং স্বীকার করেছিল যে, তারা মূসা ও হারুন (আ)–এর রব্–এর প্রতি ঈমান এনেছে। (সূরা ত্বহা, ৪২–৭০ আয়াত)

এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিবৃতীরাও হযরত মূসা (আ)–এর তওহীদী দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ফিরাউন ও তার দলবলকেও মানুষের দাসত্ব অস্বীকার ও এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুলের দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নির্দেশিত ছিলেন। তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ফিরাউন যখন ডুবে মরছিল, তখন সে বলছিলঃ

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - (يونس-٩٠)

আমি ঈমান আনছি যে, বনী–ইসরাঈলীরা যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই এবং আমি একজন আত্মসমর্পনকারী;

কিন্তু মৃত্যু মূহূর্তের ঈমান তো কোন কাজে আসে না, আল্লাহ্–ও তা কবুল করেন না। এ কারণে ঠিক তখনই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জওয়াব এসেছিলঃ

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ - (يونس-٩١)

এখন ঈমান আনছ? অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করেছ এবং একজন বিপর্যয়কারী লোক ছিলে।

কিন্তু এসব থেকে কি সত্যই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ) সার্বজনীন নবী ছিলেন? এ পর্যায়ের আয়াতসমূহের তো একটা ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যাও হতে পারে।

প্রথম কথা, তিনি মূলতঃ ও প্রধানতঃ বনী–ইসরাঈলীদের প্রতিই নবী ও রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল তাদেরকে ফিরাউন ও তার দলবলের অধীনতা ও দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করা। কিন্তু এই কাজটি নির্ভরশীল ছিল তাঁর নবুয়্যাত প্রমাণিত করার—একথা প্রতিষ্ঠিত করার উপর যে, তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশিত ও প্রেরিত। এ কারণেই তিনি ফিরাউনের সাথে কথা বলতে এবং সেজন্য তাকে রাযী করতে চেষ্টা করেছিলেন, যেন সে বনী–ইসরাঈলীদের মুক্ত করে দেয়। তাদের মুক্তি যদি এই কথোপকথনের উপর নির্ভরশীল না হত, তাহলে তিনি কখনই তা করতেন না। এর প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াতটি উল্লেখ্যঃ

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ

هُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ـ (القصص-٤)

নিশ্চয়ই ফিরাউন (মিশরের) ভূমিতে সীমালংঘন ও বিদ্রোহ করেছে। সেখানকার অধিবাসী জনগণকে দল–উপদলে বিভক্ত করেছে। তম্মধ্যে একদলকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছিল। তাদের পুত্র–সন্তানদের সে হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত থাকতে দিত। আসলে সে ছিল অত্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মধ্যের একজন।

এ আয়াতটির অব্যবহিত পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ـ

(القصص-٥)

এবং আমরা চাই, মিশর ভূমিতে দুর্বল–অক্ষম বানিয়ে রাখা লোকদেরকে অনুগ্রহীত করব এবং তাদেরকে ইমাম বানাব—তাদেরকে বানাব উত্তরাধিকারী।

এ থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে,হযরত মূসা (আ)–কে ফিরাউনের নিকট প্রেরণের মৌল উদ্দেশ্য ছিল, দুর্বল– অক্ষম–নিপীড়িত হয়ে থাকা বনী–ইসরাঈলীদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন করা। আর ফিরাউনের ও তার দলবলের সাথে তাঁর কথাবার্তা বলা এবং তার ও তার দলবলের বিরুদ্ধে তাঁর মাথা তুলে দাঁড়ানো, তাঁর মু'জিজা ও যুক্তি–প্রমাণ সমূহ তার সমুখে উপস্থাপন ছিল বনী–ইসরাঈলীদের মুক্তকরণ কার্যের প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। এ সব না করেও যদি তা সম্ভব হত তাহলে তিনি কখনই তার সমুখে দাঁড়াতেন না, তাদের সাথে কোন কথাও বলতেন না।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মূসা (আ) ফিরাউনের নিকট যখন দাবি করলেন যে, তিনি রব্বুল আলামীন–এর রাসূল, قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ আমি তোমাদের রব্–এর নিকট থেকে অকাট্য প্রমাণসহ এসেছি।' সাথে সাথে তিনি এও বললেনঃ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (الاعراف) বনী–ইসরাঈলীদের আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ـ (طه-٤٧)

তোমরা দু'জনই ফিরাউনের নিকট উপস্থিত হও এবং অতঃপর তোমরা দু'জনই বল যে, আমরা তোমার রব্–এর প্রেরিত। অতএব আমাদের সাথে বনী–ইসরাঈলীদের পাঠিয়ে দাও এবং তুমি তাদের নিপীড়ন করোনা।

এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, মূসা (আ)–কে ফিরাউনের নিকট প্রেরণের মূল লক্ষ্যই ছিল বনী–ইসরাঈলীদের মুক্ত করা আর সে কাজ যেহেতু ফিরাউনের সাথে কথা বলার উপর নির্ভরশীল ছিল, তিনি যে আল্লাহ্র রাসূল—আল্লাহ্

প্রেরিত, তা প্রমাণ করাও অপরিহার্য ছিল, এই কারণে—শুধু এই জন্যই তিনি ফিরাউনকে নিজের নবী হওয়ার কথা বলেছেন।

ওদিকে মূসা (আ) বনী-ইসরাঈলীদের বললেন, আল্লাহ্র নিকট মুক্তির জন্য সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ কর। যমীন তো আল্লাহ্র, তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী বানান। (আল-আ'রাফ-১২৮)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনী লোকদের উপর উপর্যুপরি কয়েক বছরকাল ধরে দুর্ভিক্ষ ও ফসল ঘাটতির সংকট সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের হুঁশ ফিরে এলনা। যখন ভালো অবস্থা দেখা দিত, বলত, এটাই তো আমাদের প্রাপ্য। আর খারাপ অবস্থা দেখা দিলে মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের উপর দোষ চাপাত। বলত, তোমাদের কারণেই এসব হচ্ছে। (ঐ-১৩১) পরে তাদের উপর আরও কঠিন আযাব নাযিল হলে তারা বললঃ

يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ـ (الاعراف-١٣٤)

হে মূসা ! তুমি আমাদের জন্য তোমার পদমর্যাদার বলে তোমার রব্-এর নিকট দোয়া কর। এইবার যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এই বিপদ দূর করে দিতে পার, তাহলে আমরা তোমার কথা মেনে নেব এবং বনী-ইসরাঈলদের তোমার সাথে পাঠিয়ে দেব।

মূসার প্রতি তাদের কথিত ঈমানের অর্থ হচ্ছে, তিনি যে আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রেরিত এবং বনী-ইসরাঈলের হেদায়েত করার ও আযাব থেকে নিষ্কৃতিদানের জন্য প্রেরিত, এই কথা বিশ্বাস করা। তিনি মিশরের কিবৃতী লোকদের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল রূপে প্রেরিত, এই কথার প্রতি ঈমান গ্রহণ নয়। তাই কিবৃতীদের প্রতি তিনি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হন নি, তিনি বনী-ইসরাঈলেরই নবী ছিলেন মাত্র।

প্রশ্ন উঠতে পারে, হযরত মূসা (আ) যদি ফিরাউন ও তার লোকজনের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ও তাঁর ভাই হারুনকে কেন নির্দেশ দিলেন এই বলেঃ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ـ (طه-٤٤)

অতঃপর তোমরা দু'জন তাকে খুব নম্র কথা বলবে, সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা সে ভয় পেয়ে যাবে।

— এই বলেঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى - فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى - وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى -

(النزعت ١٧-١٩)

তুমি ফিরাউনের নিকট যাও। কেননা সে সীমালংঘন করেছে, বিদ্রোহ করেছে। অতঃপর তুমি তাকে জিজ্ঞেস করঃ তুমি কি পবিত্রতা গ্রহণ করতে প্রস্তুত? এবং আমি কি তোমাকে তোমার রব্‌–এর দিকে পথ দেখাব, যেন তুমি তাঁকে ভয় করতে থাক?

এ থেকে তো মনে হয়, তিনি তাদের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তওহীদী দ্বীন কবুলের আহ্বানই তিনি দিয়েছিলেন।

এর জওয়াবে বলা যেতে পারে যে, তাঁর ফিরাউনের নিকট যাওয়া ও তাকে ভয় দেখানো শুধু এই জন্য যে, ফিরাউন যেন জানতে ও বুঝতে পারে যে, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত তাঁর জনগণ—বনী–ইসরাঈলীদের—মুক্তিদানের লক্ষ্যে; যেন সে তাদেরকে তাঁর সাথে যেতে দেয়, যেতে বাধা না দেয়। (এই পর্যায়ে সূরা ত্ব–হ'র ৪৩–৪৭ পর্যন্তকার আয়াত দ্রষ্টব্য)

এই কথার সমর্থনে বলা যায়, হযরত মূসা (আ) যখন বনী–ইসরাঈলীদেরকে ফিরাউনের অধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারলেন না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অস্বাভাবিক উপায়ে মুক্ত করার ও বের করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সেই কথা–ই বলা হয়েছে এ আয়াতটিতেঃ

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى -

(طٰه - ٧٧)

আমরা মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, এখন রাতারাতি আমার বান্দাহগণকে লয়ে চলতে শুরু কর এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে শুষ্ক পথ বানিয়ে লও। পিছন থেকে কেউ তোমাদেরকে খোঁজ করে পেয়ে যাবে সে ভয় করো না। আর না সমুদ্রের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে যেতে কোন রূপ ভয় পাবে।

বলেছেনঃ

فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ - وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۭ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ -

(الدخان - ٢٣-٢٤)

এখন তাহলে তুমি রাতের মধ্যেই আমার বান্দাহগণ—বনী–ইসরাঈলীদের—কে সঙ্গে লয়ে চলতে শুরু কর; তোমাদেরকে পিছন থেকে ধাওয়া করা হবে। সমুদ্রকে

তার নিজ অবস্থায় প্রবহমান ছেড়ে দাও, এই ধাওয়াকারী গোটা বাহিনীই নিমজ্জিত হবে।

এ দু'টি আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ)-কে প্রেরণের আসল ও মূল লক্ষ্যই ছিল বনী-ইরাঈলীদের মুক্ত করা, ফিরাউন ও তার লোকজনকে হেদায়েত করা নয়—নয় তাদেরকে তওহীদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ - ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ - (يونس-٧٤-٧٥)

নূহ-এর পর আমরা বিভিন্ন নবী-রাসূলকে তাদের নিজেদের লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট-অকাট্য নিদর্শনাদি লয়ে এল। কিন্তু যে জিনিসকে তারা পূর্বে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল, তা তারা মেনে নিলনা। সীমালংঘনকারী লোকদের দিলের উপর আমরা এমনিভাবেই মোহর এঁকে দেই।

এরপর আমরা মূসা ও হারুনকে আমাদের নিদর্শনাদি সহ ফিরাউন ও তার সমাজের লোকদের প্রতি পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করল; তারা তো ছিল অপরাধকারী লোক।

এ আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, নূহ ও মূসা (আ) এই দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এমনকি হযরত ইবরাহীম-ও সেই রূপ বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত রাসূল ছিলেন। হযরত মূসা (আ)-ও সেই রূপই রাসূল ছিলেন, যদিও তিনি ফেরাউনের নিকটও প্রেরিত হ য়েছিলেন।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট-অকাট্যভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা (আঃ) প্রমুখ সকলেই এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদের কারোরই নবুয়্যাত ও রিসালাত বিশ্বজনীন—সার্বজনীন ছিল না, ছিল না সর্বকালীন।

ঈসা (আ)র নবুয়্যাত কি বিশ্বজনীন ছিল?

পূর্ববর্তী দীর্ঘ আলোচনায় কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ)–এর নবুয়্যাত এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য নিয়োজিত ছিল; যদিও তাঁর আনীত শরীয়াত তাঁর পরে প্রেরিত বহু সংখ্যক নবী–রাসূলেরও অনুসৃত ও আচরিত শরীয়াত ছিল। কিন্তু তাঁরাও ঠিক সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন, যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন স্বয়ং হযরত মূসা (আ)। অতঃপর আমরা হযরত ঈসা (আ)–এর নবুয়্যাত সম্পর্কে পর্যালোচনায় ব্যাপৃত হচ্ছি।

কোন কোন আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর রিসালাতও বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বনী–ইসরাঈলীদেরই প্রতি বিশেষভাবে। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ۔ (الصف-٦)

আর স্মরণ কর, মরিয়াম পুত্র ঈসা যখন বলল, হে ইসরাঈল বংশের লোকেরা, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার সমুখে যে তাওরাত রয়েছে তার সত্যতা ঘোষণাকারী।

বলেছেনঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۔ (الزخرف-٥٧)

আর যখনই মরিয়াম পুত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হল, তোমার জাতির লোকেরা হট্টগোল করে উঠল।

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۔ (الزخرف-٦٣)

আর যখন ঈসা অকাট্য যুক্তি–প্রমাণ লয়ে এল, বললঃ আমি তোমাদের নিকট অকাট্য যুক্তি–প্রমাণ লয়ে এসেছি, এসেছি এজন্য যে, আমি তোমাদের জন্য পারস্পরিক মত–বিরোধীয় বিষয়ের কতক সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দেব। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ ـ (المائدة ـ ٤٤)

আমরা তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে হেদায়েত ও অন্ধকার দূরকারী আলো ছিল। সমস্ত নবী—যারা ছিল মুসলিম—তদনুযায়ী ইয়াহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা করত। রব্বানী ও আহবারগণ–ও (এরই ভিত্তিতে ফয়সালা করত)।

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ـ (المائدة ـ ٧٢)

এবং মসীহ বলল, হে বনী–ইসরাঈলীরা, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার কর, যিনি আমার রব্, তোমাদেরও রব্।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ـ (ال عمران ـ ٤٩)

এবং (আমরা মসীহকে) বনী–ইসরাঈলীদের প্রতি রাসূল রূপে পাঠিয়েছি; সে বলল, আমি তোমাদের রব্ এর নিকট থেকে একটি নিদর্শন তোমাদের নিকট লয়ে এসেছি। তা হচ্ছে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতির মত (একটি জিনিস) তৈয়ার করি।

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ـ (المائدة ـ ٧٠)

আমরা বনী–ইসরাঈলীদের নিকট থেকে চুক্তি গ্রহণ করেছি এবং তাদের প্রতি বহু সংখ্যক রাসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট তাদের প্রবৃত্তির বিপরীত কোন বিধান লয়ে এসেছে, তখনি তারা এক দলকে অসত্য মনে করে অগ্রাহ্য করেছে এবং অপর এক দলকে হত্যা করেছে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ - (المائدة - ٧٢)

নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে যে, মরিয়াম পুত্র মসীহ–ই হচ্ছে আল্লাহ্। অথচ মসীহ বলেছে, হে বনী–ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল কর; তিনিই আমার রব্, তোমাদেরও।

এসব আয়াত থকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে,হযরত ঈসা (আ) বনী–ইসরাঈলীদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। এভাবে আরও অনেক রাসূল তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। এদের মধ্য থেকে যারাই বলেছে যে,মসীহ–ই হচ্ছে আল্লাহ্, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কাফির হয়ে গেছে। কেননা মসীহ তো স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবেই তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুলের জন্য দাওয়াতও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর সে দাওয়াত কবুল না করে উল্টো তাঁকেই আল্লাহ্ রূপে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। আর একারণেই তাদেরকে কাফির বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উপরন্তু হযরত মসীহ (আ) তাঁর সমস্ত তওহীদী দাওয়াতকে বনী–ইসরাঈলীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

অবশ্য একটি আয়াত থেকে কারো কারো মনে ধারণা জন্মাতে পারে যে, তাওরাত ও ইনজীল কিতাব বুঝি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নাযিল হয়েছিল। আয়াতটি এইঃ

وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ - (آل عمران ٣-٤)

এবং আল্লাহ্ পূর্বে নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল জনগণের হেদায়েতের বিধান হিসাবে এবং তারপর কুরআন নাযিল করেছেন।

কিন্তু আয়াতে জনগণ বলতে নিশ্চয়ই সারা দুনিয়ার ও সর্বকালের মানুষ বুঝায় না, বুঝায় এ সব কিতাব যে যে নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, কেবল তাঁদের নিজস্ব লোকজন।

তাহলে হযরত ঈসা মসীহ (আ) সর্বসাধারণ মানুষের জন্য নবী ছিলেন, একথা প্রমাণিত হল না। তা প্রমাণ করার কোন একটি আয়াতও কুরআন মজীদে নেই।

হযরত ঈসা (আ) যে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত নবী ও রাসূল ছিলেন, সার্বজনীন ও সর্বকালীন নবী ছিলেন না, তা প্রমাণের জন্য এখানে আরও কিছু কথা বলা হচ্ছেঃ

(১) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্ব-পুরুষ, বনু হাশিম গোত্র ও পরিবার এবং তদানীন্তন জজীরাতুল আরব-এর ন্যায়বাদী মানুষেরা ইবরাহীমী দ্বীনের উপর অবিচল ছিলেন। তাঁরা ইয়াহুদী ধর্ম বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। কোন ঐতিহাসিকই তেমন কোন কথার উল্লেখও করেন নি।

ইমাম জুরকানী উল্লেখ করেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে সমস্ত আরব ইবরাহীমী দ্বীনেরই অনুসারী ছিল। তাদের কোন একজন লোকও কাফির হয়ে যায়নি। শেষ পর্যন্ত আমর ইবনে লুহাই আরবে মূর্তি পূজার প্রচলন করে, ইবরাহীমী দ্বীনে পৌত্তলিকতার প্রচলন করে। হযরতের দাদা কিনানা পর্যন্ত এই অবস্থাই চলতে থাকে।[১]

(২) হযরতের জন্মের কিছুকাল পূর্বে সংঘটিত হাতী বাহিনীর আক্রমণ কালে আবদুল মুত্তালিব ও তার সঙ্গী-সাথীদের আচরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তারা সাধারণভাবে সকলেই খৃষ্টানদের ঘৃণা করত, তাদের থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করত। আক্রমণকারী বাহিনীর নেতা আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ করে সে কাবা ধ্বংস থেকে বিরত থাকবেনা বুঝতে পেরে ফিরে এসে তিনি কাবা ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'ওদের ক্রুশ কখনই এই ঘরকে বিজিত করতে পারবে না'।

(৩) ইমাম বুখারী নবী করীম (স)-এর এই কথাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকেই দেয়া হয়নি– আমাকে শাফায়াত করার সুযোগ দান করা হয়েছে। পূর্বে নবী তার 'কাওম'-নিজস্ব জনগণের প্রতিই প্রেরিত হতেন। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সাধারণভাবে সমস্ত বিশ্ব-মানবের প্রতি।[২]

অপর একটি বর্ণনায় কথাটি এ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছেঃ

وَكَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ ،

প্রত্যেক নবী-ই তাঁর নিজ কাওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন আর আমি প্রেরিত হয়েছি লাল-সাদা সব বর্ণের মানুষের প্রতি।

হাদীস-ভিত্তিক এ আলোচনা থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবী ছিলেন না, তাঁর পূর্ববর্তী ইবরাহীম ও নূহ (আ)-এর সেরূপ নবী হওয়া তো দূরের কথা। তাঁদের সকলেরই দাওয়াত ও নবুয়্যাত বিশেষ জনগোষ্ঠী কিংবা বিশেষ অঞ্চলের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট ছিল। সর্বকালের

১. سيرة ابن هشام ج ١ ص ٧٩

২. صحيح البخاری فی مختلف كتبه ، التيمم الباب الاول الفصل الباب ٣٦

সর্বসাধারণ মানুষের জন্য নবুয়্যাত ছিল কেবলমাত্র খাতামান্নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। তা হচ্ছে, হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর পূর্ববর্তী কোন নবী–রাসূলই যদি সার্বজনীন না হয়ে থাকেন, এবং আঞ্চলিক বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তাহলে কুরআনে কয়েক জন নবী–রাসূল কে اولوالعزم 'উচ্চ সংকল্পসম্পন্ন' বলে অভিহিত করা হয়েছে (সূরা আল–আহকাফ ৩৫ আয়াত) কেন? তাতে তো মনে হয়, এই গুণে অভিহিত নবী–রাসূলগণ হয়ত বিশ্বজনীন হবেন এবং তাঁরা পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়ে থাকবেন?

এই প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার জন্যই আমাদের পরবর্তী আলোচনা।

'দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন রাসূল' বলতে কি বুঝায়?

কুরআন মজীদে কয়েকজন বা সকল রাসূলকেই 'দৃঢ় সংকল্পসম্পন্ন' বলে অভিহিত করা হয়েছে, একথা সত্য। বলা হয়েছেঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ

لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ - (الاحقاف-٣٥)

অতএব হে নবী! তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেভাবে উচ্চ-দৃঢ় সংকল্পসম্পন্ন রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছেন। আর লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা। যেদিন এই লোকেরা সেই জিনিস দেখতে পাবে যে-বিষয়ে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা দুনিয়ায় দিনের একটি ক্ষণ সময়ের অধিক অবস্থান করেনি। কথা তো পৌঁছিয়ে দেয়া হল। এখন নাফরমান লোকদের ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি?

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (স)-কে শত্রুদের শত্রুতা ও জ্বালা-যন্ত্রণার মুখে পরম ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন যেমন করে দৃঢ়-উচ্চ মানের ধৈর্য ধারণ করেছিলেন আল্লাহ্র অন্যান্য রাসূলগণ প্রতিপক্ষের শত্রুতা ও জ্বালা-যন্ত্রণার মুকাবিলায়। এক্ষণে আমাদের জানা প্রয়োজন, এই দৃঢ়-উচ্চমানের ধৈর্যের গুণে রাসূলগণকে অভিহিত করার প্রকৃত তাৎপর্য কি। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম العزم 'দৃঢ়-উচ্চ সংকল্প' বলতে আল্লাহ তা'আলা কি বুঝিয়েছেন, তা বুঝা দরকার।

(১) ইবনে ফারেস-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এই শব্দটির অর্থ একটিই এবং তা হচ্ছে ছিন্নকরণ, যুক্তকরণের বিপরীত। অর্থাৎ তা বিস্ময়, বিভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয়কে ছিন্ন করে। তা দৃঢ়তা ও কর্তনও বুঝায়। আর খলীল (আভিধানিক) বলেছেনঃ কোন কাজ করার জন্য অন্তর যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে, যা না করে ছাড়বে না বলে দৃঢ়তা ও অবিচলতা গ্রহণ করা হয়, তা-ই এই শব্দটি দ্বারা বুঝায়। আবরীতে বলা হয়, مالفلان عزيمة 'অমুক ব্যক্তির কোন বিষয়ে দৃঢ়তা বা অবিচলতা নেই।' অর্থাৎ কোন ব্যাপারে সে স্থির নয়। তার মধ্যে রয়েছে ইতস্তঃতা, সংকল্পে চরম দুর্বলতা।

এ প্রেক্ষিতে اولوالعزم من الرسل 'উচ্চ সংকল্পসম্পন্ন রাসূল' বলতে আল্লাহ্ সেই রাসূলগণকে বুঝিয়েছেন, যাঁরা যে সব লোকের প্রতি তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের

মধ্যে যারা তাঁদের প্রতি ঈমান গ্রহণ করেনি, তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। যেমন হযরত নূহ (আ)। তিনি বলেছিলেনঃ

لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ـ

হে আল্লাহ্, যমীনের বুকে কাফিরদের একজনকেও জীবিত রেখো না!

নবী করীম (স) কাফিরদের সাথে নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহ্ নিজেই তাঁকে তাদের থেকে নিঃসম্পর্ক বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে তাদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার নির্দেশও দিয়েছিলেন।

(২) ইমাম রাগিব ইসফাহানী العزم শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প মনের বন্ধন ও দৃঢ়তা বলে। শব্দটির উৎপত্তি কিসে থেকে—যার দরুণ এ অর্থ গ্রহণ করা হল, সেদিকে—তিনি কোন ইঙ্গিত করেন নি। তিনি বলেছেনঃ العزم والعزيمة عقد القلب على امضاء الامر 'কোন কার্য সম্পাদনের জন্য অন্তরের দৃঢ়তা গ্রহণ।' আল্লাহ্র কথা فاذا عزمت فتوكل على الله 'যখন তুমি কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলে তখন তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।'

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ (البقرة ـ ٢٣٥)

আর বিয়ের বন্ধনের সিদ্ধান্ত করবে না—

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ (البقرة ـ ٢٢٨)

আর যদি তালাক দেওয়ার দৃঢ় সংকল্পই গ্রহণ করে তারা—

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ (لقمٰن ـ ١٧)

নিঃসন্দেহে এটা ব্যাপারসমূহে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ পর্যায়ের কাজ —

وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ـ (طٰه ـ ١١٥)

(বৃক্ষ থেকে আহার গ্রহণে বিরত থাকার ব্যাপারে) আমরা তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্প পাইনি।

অর্থাৎ আল্লাহ্র নিষেধের উপর অবিচল থাকতে ও নিজেকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতে তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের অভাব ছিল।

আর عزيمة শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি আশ্রয়ও বটে।

(৩) ফীরোজাবাদী এই বলে ব্যাখ্যা করেছেনঃ কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ, কোন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ এবং তার উপর অবিচল হয়ে থাকা, দৃঢ়তা গ্রহণ। তিনি উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ 'আর দৃঢ় সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী রাসূলগণ, যাঁরা আল্লাহ্র বিধানের উপর অবিচল হয়ে আছেন, আল্লাহ্র অর্পিত দায়িত্ব পালনে রয়েছেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ'। আল্লামা জামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ 'দৃঢ় সংকল্প, স্থিতি ও ধৈর্যধারণকারী রাসূল'।

পূর্ববর্তী আলোচনার সারকথা হল العزم শব্দটির অর্থ কর্তন, মিলনের বিপরীত। পরে তা প্রেক্ষিত অনুযায়ী অন্তরের দৃঢ়-স্থির সিদ্ধান্ত, স্থিতি-অবিচলতা ও ধৈর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কুরআনের আয়াতসমূহে এ শব্দটি মনের দৃঢ়-স্থির সিদ্ধান্ত-সংকল্প অর্থেই অধিক ব্যবহৃত। (সূরা মুহাম্মাদ-২১, আলে-ইমরান-১৫৯, আল-বাকারা -২২৭, ২৩৫ এবং আলে-ইমরান ১৮৬ আয়াত দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ ধৈর্য ও সতর্কতা এমন ব্যাপার, যার নির্ভুলতা যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট। অতএব দৃঢ়-সংকল্প অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, অন্তর-মনকে তার উপর দৃঢ় করে রাখতে হবে। আর জীবন-সংগ্রামে স্থিতির জন্য ধৈর্য অনিবার্য। অতএব ধৈর্য এই عـــزم এর একটি অবিচ্ছিন্ন গুণ। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۔ (لقمٰن-١٧)

এবং ধৈর্য ধারণ কর তোমার উপর যত বিপদই আসুক না কেন। নিশ্চয়ই এটা সমস্ত ব্যাপারের অবিচলতা।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۔ (الشورى-٤٣)

যে লোক ধৈর্য ধারণ করল ও ক্ষমা করল—নিশ্চয়ই এই ধৈর্যধারণ ও ক্ষমা প্রদান সমস্ত ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ পর্যায়ের।

এই শেষোক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এই ধারণা স্পষ্ট হয় যে, صبر-عزم এর সমার্থবোধক শব্দ নয়। তাই এর অর্থ হবে, ধৈর্য অত্যন্ত উচ্চ ও দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপার, যা জীবনের সুদীর্ঘ পথে স্বীয় মনের দৃঢ় সংকল্প সংরক্ষণ স্থিতি, দৃঢ়তা ও সকল বিরুদ্ধতা-শত্রুতা বরদাশ্‌ত করে নেয়া ছাড়া সম্ভব হতে পারে না।

এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের العزم অর্থ দৃঢ় ইচ্ছা-সংকল্প, যা কখনই নিঃশেষ

বা বিলীন হয় না, যা কর্মে উদ্বুদ্ধ করে ও আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।

এই দৃঢ় উচ্চ সংকল্পধারী রাসূল কারা?

প্রথম পর্যায়ে হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সারা দুনিয়ার জ্বিন ও মানুষ—সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। যাঁদের রাসূল রূপে প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছে, তাঁরা সকলেই এই গুণের অধিকারী। কিন্তু পূর্বে আমরা দেখিয়েছি, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) কেবলমাত্র বনী-ইসরাঈলের প্রতি বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন, সর্বকালের সারা পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রেরিত ছিলেন না; তাই তাঁরা দুজন এই পর্যায়ে পড়েন না। আর তাঁরাই যখন সেরূপ নন, তখন নূহ্ ও ইবরাহীম (আ)-এর সেরূপ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না

দ্বিতীয় পর্যায়ে সকল রাসূলকেই বুঝতে হবে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এমন রাসূল একজনও পাঠাননি, যিনি দৃঢ়-উচ্চ মনোভাব, সংকল্প ও অবিচলতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন না।

একটি আয়াত এই মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায়। আয়াতটি এইঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى
بْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا - (الاحزاب-٧)

স্মরণ কর, আমরা যখন নবীগণ থেকে তাদের দৃঢ় চুক্তি-প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি, তোমার থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়াম পুত্র ঈসা থেকেও, এবং তাদের নিকট থেকে অত্যন্ত দৃঢ়-শক্ত চুক্তি-প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি।

আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলছে যে, নবীগণের নিকট থেকে তাঁদের নবী হওয়া অবস্থায় দৃঢ়-চুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে। এ চুক্তি কিন্তু সেই চুক্তি নয় যা আদম সন্তান হওয়ার দরুণ রুহ্-এর জগতে গ্রহণ করা হয়েছিল সকল মানুষের নিকট থেকে। নবীগণের নিকট থেকে সধারণভাবেই চুক্তি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই চুক্তি গ্রহণ থেকে যদিও দৃঢ় সংকল্প প্রমাণিত হয় না; কিন্তু তাঁরা কেউ-ই এই চুক্তি ভঙ্গ করেছেন এমন কথা কুরআনে কোথাও বলা হয়নি। তাঁরা সকল গুনাহ্-নাফরমানী থেকে মুক্ত পবিত্র, তাই তাঁরা সকলেই সেই চুক্তির উপর অবিচল ছিলেন বুঝতে হবে। আর তা-ই হচ্ছে দৃঢ়-উচ্চ সংকল্প, শক্তিশালী ইচ্ছা, যার জন্য ধৈর্য ও স্থিতি অপরিহার্য।

তবে আয়াতে মাত্র পাঁচজন নবীর উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, তাঁদের মর্যাদা, সম্মান অত্যন্ত উঁচু। কেননা তাঁদের উপর শরীয়াত নাযিল হয়েছে, কিতাবও এসেছে। উক্ত গুণটি কেবল এই ক'জনের ছিল, অন্য নবীদের ছিলনা, সেজন্য নয়। অপর আয়াতে তো সকল নবীর নিকট থেকেই দৃঢ়–শক্ত চুক্তি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا ـ (آل عمران ـ ٨١)

স্মরণ কর, আল্লাহ্ নবীগণের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব এবং বিজ্ঞান–কর্মকৌশল ও বুদ্ধি–প্রজ্ঞা দিয়ে ধন্য করেছি; কারণ অপর কোন নবী–রাসূল যদি তোমাদের নিকট ঠিক সেই শিক্ষা লয়েই আসে যা তোমাদের নিকট পূর্ব থেকেই বর্তমান, তাহলে তার প্রতি তোমাদের অবশ্যই ঈমান আনতে হবে এবং তার সাহায্যে তোমাদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। এইকথা বলে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি এই কথার অঙ্গীকার করছ?

এ আয়াতটির এক সাথে দুটি তাৎপর্য।

প্রথম, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের নিকট থেকে দৃঢ় চুক্তি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই চুক্তির আনুসঙ্গিক কথা কিছুই বলা হয়নি। 'আজ আমি তোমাদেরকে— দিয়ে ধন্য করেছি' কথাটি চুক্তি গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ফলে নবীগণের নিকট থেকে গৃহীত চুক্তিটি সম্ভবতঃ দ্বীনের কালেমার একত্ব রক্ষা এবং তাতে কোনরূপ মতপার্থক্য সৃষ্টি না করার প্রসংগেই সম্পাদিত হয়েছিল। সূরা আশ্–শু'রার এ আয়াতাংশ সেদিকেই ইঙ্গিত করছেঃ

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ـ (الشورى ـ ١٣)

তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে তোমরা ছিন্নভিন্ন ও দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়োনা।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা জনগোষ্ঠীসমূহের নিকট থেকে নবীগণের ব্যাপারে এই চুক্তি গ্রহণ করেছেন যে, তারা তাঁদেরকে সত্য বলে মেনে নিবে, তাঁদের

অনুসরণ ও আনুগত্য করে চলবে। এরূপ তাৎপর্যে আয়াতটি বর্তমান আলোচনার আওতা-বহির্ভূত হয়ে পড়ে। তবে প্রথমোক্ত তাৎপর্যটিই অধিক যথার্থ।

তৃতীয় পর্যায়ে আয়াতের من শব্দটি 'কতক' বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'উলুল আযম' বলতে কিছু সংখ্যক নবী বুঝায়, সকল নবী নয়। বলা হয়েছে; তাদের প্রথম হচ্ছেন হযরত নূহ; কেননা তিনি তাঁর জনগণের নিপীড়নে অসীম ধৈর্য অবলম্বন করেছিলেন। তারা তাঁকে এমন মার মেরেছিল যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয় হযরত ইবরাহীম; (আ)-লোকেরা তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল এবং তিনি নিজেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজ পুত্রকে যবেহ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তৃতীয় হযরত ইসমাঈল; কেননা তিনি যবেহ হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন ও নিজেকে ছুরির তলে সমর্পিত করেছিলেন। চতুর্থ হযরত ইয়াকূব; তিনি স্বীয় প্রিয় পুত্র ইউসুফকে হারিয়ে পরম ধৈর্যধারণ করেছিলেন। তাঁর চোখ দৃষ্টিশক্তি হারালেও তিনি কোনরূপ ধৈর্যহীনতা দেখাননি। পঞ্চম হযরত ইউসুফ; তিনি কূপে নিক্ষিপ্ত, ক্রীতদাসরূপে বিক্রী হতে ও কারাবরণ করতেও সন্তুষ্ট চিত্তে রাযী হয়েছিলেন। ষষ্ঠ হযরত আইয়ুব (আ); কেননা তিনি কঠিন দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা অকাতরে ভোগ করেছিলেন। সপ্তম হযরত মূসা (আ); তাঁর জনগণ তাঁকে ধরে ফেলতে চেয়েছিল। জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, আমার রব্ আমার সাথে রয়েছেন, তিনি আমাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন। অষ্টম হযরত দায়ুদ (আ); তিনি তাঁর নীতি-বিচ্যুতির জন্য ক্রমাগত চল্লিশটি বছর ধরে কেঁদেছিলেন। নবম হযরত ঈসা (আ); তিনি একখানা ইটের উপর আর একখানা ইট রাখেননি সারা জীবনে। (অর্থাৎ নিজের জন্য ঘর নির্মান করেননি।)

আর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) সম্পর্কে নিজেই বলেছেনঃ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا - (طه، ١١٥)

আমরা আদমকে তাকীদ করে দিয়েছিলাম; কিন্তু পরে সে ভুলে গিয়েছিল। অবশ্য তার মধ্যে আল্লাহ্র নাফরমানী করার দৃঢ় সংকল্প দেখতে পাইনি।

আর হযরত ইউনুস (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَهُوَ مَكْظُومٌ -

তোমরা মাছওয়ালার মত হয়োনা। তার রব্ যখন তাকে ডাক দিয়েছিলেন, তখন সে ভয়ানক দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় পড়েছিল।

ফলে এ দু'জন 'উলুল-আযম' নবীগণের পর্যায়ে গণ্য হননা।

এ প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, عزم শব্দের অর্থ হচ্ছে, দৃঢ় সংকল্প, পরম ধৈর্য–সহিষ্ণুতা, স্থিতি ইত্যাদি। (কয়েকজন মুফাস্‌সির এ মত প্রকাশ করেছেন।) আর 'উলুল আযম' বলতে সে সব নবীকে বুঝতে হবে যাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশ ও প্রদর্শনে পূর্বাপর অন্যান্য নবীগণকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁরা জনগণ কর্তৃক অস্বীকৃত ও নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও পরম ধৈর্য ধারণ করেছেন। দ্বীন ও দ্বীনের দাওয়াত প্রচারে তাঁরা সুদৃঢ় মন–মানসিকতা ও বলিষ্ঠতা প্রর্দশন করেছেন। এ প্রেক্ষিতেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)–কে দ্বীনী দাওয়াত প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অতীব ধৈর্যশীল হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে 'উলুল আযম' বলতে সেই পাঁচজন নবী–রাসূলকে বুঝায়, যাঁদের উপর এমন শরীয়াত নাযিল হয়েছিল যা তার পূর্ববর্তী শরীয়াতকে নাকচ করে দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন হযরত নূহ (আ)। তাঁর পরে হযরত ইবরাহীম, তাঁর পরে হযরত মূসা, তাঁর পরে হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁর পরে হযরত মুহাম্মাদ (স)। এঁরাই হচ্ছেন নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নবীগণের সরদার। নবুয়্যাতের চাকা এঁদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তবে এঁদের প্রত্যেকের নিয়ে আসা শরীয়াত তার পূর্ববর্তী শরীয়াতকে নাকচ করেছে, এমন কথা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণিত নয়, একমাত্র শেষ নবী ছাড়া। যেমন হযরত ঈসা (আ) তাঁর নিজের নবুয়্যাতের লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করেছিলেনঃ

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ـ (الزخرف ـ ٦٣)

নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট 'হিকমাত' লয়ে এসেছি; এজন্য এসেছি যে, আমি তোমাদের পারস্পরিক মতবিরোধের কতক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করব।

এ থেকে বুঝা যায়, তিনি এমন শরীয়াত নিয়ে আসেননি, যা পূর্ববর্তী শরীয়াতকে নাকচ করেছে।

পঞ্চম পর্যায়ে 'উলুল আযম' হচ্ছেন সেসব নবী ও রাসূল, যাঁদেরকে জিহাদ ও সশস্ত্র যুদ্ধ চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল দ্বীন–ইসলামের জন্য।

এই কথাটি পূর্বোক্ত কোন কোন কথা—বিশেষ করে তৃতীয় পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

ষষ্ঠ পর্যায়ে العزم অর্থ কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, নিশ্চয়তা, চূড়ান্ততা। আর 'উলুল আযম' হচ্ছেন সে সকল রাসূল, যাঁরা শরীয়াতের বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, জনগণকে তা মেনে চলতে বাধ্য করেছেন, সে শরীয়াত ছাড়া অন্য কোন আইন–বিধান সম্পূর্ণ পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বর্ণনা মতে তাঁরা হচ্ছেনঃ হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)।

এই তাৎপর্যের দৃষ্টিতে العزم শব্দের অর্থ হচ্ছে আইন ও শাসন, তা রুখসুত দানের বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক। এই নবীগণকে 'উলূল আযম' বলা হয়েছে এজন্য যে, তাঁরা ছিলেন দৃঢ় সংকল্প ও সুপ্রতিষ্ঠিত শরীয়াতী বিধানের ধারক। ওদিকে হযরত নূহ থেকে পরবর্তী সব ক'জন নবীই তাঁর প্রচারিত শরীয়াত ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির অনুসারী কিতাবের অধীন ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত।

সপ্তম পর্যায়ে 'উলূল আযম' বলতে আঠারজন রাসূলকে বোঝানো হয়েছে, যাঁদের নাম এ আয়াতটিতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ - وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ - وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ -

(الانعام - ۸۳ - ۸۶)

এটাই ছিল আমাদের সেই যুক্তি–প্রমাণ যা আমরা ইবরাহীমকে তার জনগণের মুকাবিলা করার জন্য দিয়েছিলাম। আমরা যাকে যাকে চাই, উচ্চ মর্যাদা দান করি। বস্তুতঃ তোমার রব্ নিরতিশয় জ্ঞানী, সুবিজ্ঞ। তারপর আমরা ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকূবের ন্যায় সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি। সেই সঠিক পথ যা এর পূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। এবং তারই বংশ থেকে আমরা দায়ূদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (হিদায়ত দান করেছি)। এভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের প্রতিফল দেই। (তাদেরই বংশধর থেকে) যাকারিয়া ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলইয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি) তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নেককার ছিল। তারই বংশে ইসমাইল, আল–ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)। এদের প্রত্যেককেই আমরা দুনিয়া জাহানের সব কিছুর উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি।

এ কথার দলীল হিসাবে বলা যায়, এই নবীগণের নাম উল্লেখের পর আল্লাহ্ তা'আলা একটি কথা ইরশাদ করেছেনঃ

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ -

(الانعام - ۸۸)

এদেরকে আমরা বাছাই করে নিয়েছি এবং তাদেরকে সঠিক-নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ - (الانعام-٩٠)

এরা তারাই, যাদেরকে আমরা কিতাব, প্রশাসন ও নবুয়্যাত দিয়েছি।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ - (الانعام-٩١)

এরা সেই লোক, যাদের আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন। অতএব তুমি তাদের হেদায়েতকে অনুসরণ করে চল।

অতএব এঁরা সকলেই 'উলুল আযম' নবী-রাসূল হবেন, এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তাঁদের মোট সংখ্যা কত, তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সংখ্যা নিয়ে কোন বিতর্ক না করাই ভাল। আসল হচ্ছে গুণ-পরিচিতি। কুরআনে তাঁদের গুণ-পরিচিতি হচ্ছে এই যে, তাঁরা সকলে পরম ধৈর্য অবলম্বন করেছেন তাঁদের উপর ন্যস্ত রিসালাতের সঠিক দায়িত্ব পালনের পথে, আল্লাহ্র দ্বীন ও তাঁর দাওয়াত সকল মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য।

আল্লাহ্ এই গুণের নবী-রাসূলগণকে যথার্থ মর্যাদা দান করুন।

কুরআনে নবুয়্যাত শেষের উল্লেখ

১. আল্লাহ্র নাযিল করা শরীয়াত মৌলিকভাবে এক ও অভিন্ন, পথ ও পন্থার দিক দিয়ে বিভিন্ন

২. রাসূলে করীমের মাধ্যমে নবুয়্যাত খতমের কুরআনী ঘোষণা

৩. 'খাতাম' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য—অভিধান ও কুরআনে

৪. আয়াতটির প্রামাণিকত্য পর্যায়ে সংশয় ও জওয়াব

৫. খতমে নবুয়্যাতের পরিণতি—খতমে রিসালাত

৬. খতমে নবুয়্যাত পর্যায়ে কুরআনের অন্যান্য আয়াত

৭. নবী করীম (স) সমগ্র বিশ্ব-জাহানের জন্য ভয় প্রদর্শক, 'আল-আলামীন' শব্দের অর্থ

৮. কুরআনে কোন বাতিল না সমুখ থেকে আসতে পারে, না পিছন থেকে

৯. মহানবী কুরআন দ্বারাই তাঁর ভয় প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন যার কাছেই তা পৌছায়

১০. রাসূলে করীম (স) সমগ্র মানুষের প্রতি প্রেরিত

১১. কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের মূল বক্তব্যের সংরক্ষক

কুরআনে খতমে নবুয়্যাত

মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি 'খাতামান্নাবীয়ীন' এবং 'খাতামুল মুরসালীন'। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। কুরআনের পর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আর কোন কালাম বা কিতাবও কারো প্রতি নাযিল হবে না। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবী ও রাসূল হওয়ার পর নবুয়্যাত ও রিসালাতের দ্বার চিরদিনের তরে রুদ্ধ হয়ে গেছে, কোনদিনই সে দ্বার উন্মুক্ত হবে না, রিসালাত ও নবুয়্যাত চিরদিনের জন্য খতম হয়ে গেছে।

দুনিয়ার মুসলিমগণ শুরু থেকেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে,হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রচারিত দ্বীন-ইসলাম আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশেষ, চিরন্তন ও শাশ্বত দ্বীন। এই দ্বীন নাযিল হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল দ্বীন সম্পূর্ণ রূপে বাতিল হয়ে গেছে। এই দুনিয়ায় জীবন যাপন, উন্নতি-অগ্রগতি ও সৌভাগ্য-উৎকর্ষ লাভের জন্য এই দ্বীন সকল মানুষের জন্যই সর্বশেষ ও একমাত্র অবলম্বন। এই দ্বীন সর্বতোভাবে সুসম্পূর্ণ, কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি একে স্পর্শমাত্র করতে পারে নি। এই দ্বীন মানুষের জীবনকে সর্বদিক দিয়েই পরিচালিত করতে এবং প্রয়োজনীয় আইন-বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি দিতে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম। মানব জীবনের কোন একটি দিকও এর আওতার বাইরে নয়। জীবনের সমগ্র দিকে একসাথে পথ-নির্দেশ করতে এই দ্বীনের একবিন্দু অক্ষমতার কোন প্রশ্নই কোন দিন উঠতে পারে না।

তাই নতুন করে আর কোন নবুয়্যাত ও রিসালাত কিংবা কিতাবের প্রয়োজন নেই এ দুনিয়ার মানুষের জন্য। দ্বীন-ইসলাম ও আল-কুরআন কিয়ামত পর্যন্তকার সকল দেশের, সকল মানুষের জন্য সর্বতোভাবেই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সত্য দ্বীন ও নির্ভুল শরীয়াত নাযিল করতে শুরু করেছেন পৃথিবীতে মানুষের প্রথম পদার্পণের পর পরই; তা শেষ হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি নাযিল হওয়া দ্বীন ও শরীয়াতের দ্বারা। এই দ্বীন ও শরীয়াতসমূহের মধ্যে মৌলিকভাবে কোনই পার্থক্য নেই। বলা যেতে পারে, প্রথম নাযিল হওয়া শরীয়াত যেন একটি বীজ; তা ক্রমশঃ বিকশিত ও প্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায় ও অধ্যায় অতিক্রমণের মাধ্যমে তা-ই পূর্ণত্ব প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে কালের অগ্রগতির সাথে সাথে এবং মানব সভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতির সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে। শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত এসে তা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। আর পূর্ণত্ব প্রাপ্ত কোন

জিনিসেরই বিকল্প কিছু হতে পারে না। তাই দ্বীন–ইসলামেরও কোন বিকল্প নেই, প্রয়োজন নেই নতুন কোন নবুয়্যাত বা কিতাবের। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি এ তত্ত্বই আমাদের সমুখে উদঘাটিত করেঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ (الشورى ـ ١٣)

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য (হে মুসলিমগণ) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন সেই সত্য বিধান যার হুকুম দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা (হে নবী) তোমার প্রতি নাযিল করেছি, আর যার বিধান দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। তা হচ্ছে, তোমরা সকলে মিলিত হয়ে দ্বীন কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়োনা।

এ আয়াত অনুযায়ী হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)–কে এবং সর্বশেষে হযরত মুহাম্মাদ (স)–কে এক ও অভিন্ন দ্বীন প্রদান করা হয়েছিল। তা ছিল তওহীদী দ্বীন—শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। উন্নতমানের চরিত্রের দাওয়াত রয়েছে তাতে। নৈতিক অপরাধসমূহের শাস্তির বিধান ও তার কারণসমূহ দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা রয়েছে তাতে।

এই বর্ণনা থেকে শরীয়াতের মৌলিক অভিন্নতা প্রমাণিত হয়। এ কারণেই আল্লাহ্র এ ঘোষণা শাশ্বতঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ (آل عمران ـ ١٩)

আল্লাহ্র নিকট দ্বীন হিসাবে একমাত্র ইসলামই গ্রহণীয়।

এ ছাড়া আর কিছুই নেই, নয়, ছিলনা প্রথম মানবতা থেকে এ পর্যন্ত। এই জন্যই আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ـ (آل عمران ـ ٨٥)

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন যে লোক চাইবে বা পছন্দ করবে তার নিকট থেকে তা কক্ষণই গ্রহণ করা হবে না।

ইয়াহুদারা এই ইসলামকে পরিহার করে ইয়াহুদী ধর্মমত গ্রহণ করেছে, খৃষ্টানরা গ্রহণ করেছে খৃষ্টান ধর্ম। ইয়াহুদীরা দাবি করেছে, ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলেন, খৃষ্টানরা দাবি করেছে ইবরাহীম ছিলেন খৃষ্টান। এই দুটি কথারই প্রতিবাদ করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

(ال عمران ـ ٦٧)

ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিল না, নাসারাপন্থীও নয়। সে ছিল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্মুখী, একান্ত অনুগত ও সমর্পিত। সে কখনই মুশরিক ছিল না।

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ই ইয়াহুদী ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্মকে শিরকী ধর্মরূপে চিহ্নিত করেছেন।

উপরের তিনটি আয়াতে 'ইসলাম' শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্র নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা আর মুসলিম অর্থ পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী; আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধসমূহ যথাযথভাব পালনকারী। এর দ্বারা নাম-সর্বস্ব ইসলাম ধর্ম বোঝানো হয়নি, যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম। হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ

الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين ـ (نهج البلاغة ـ ص١٢٥)

ইসলাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ। আর এই আত্মসমপর্ণ হয় দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহায্যে।

এ আত্মসমর্পণের অর্থ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধসমূহ মান্য করা; আল্লাহ্কে আন্তরিকভাবে ভয় করা ও ভালোবাসা। এ অর্থের আলোকে পাদ্রী-পুরোহিত বা ধর্মীয় ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছামত কিছু বললে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হালাল হারাম নির্ধারণ বা ঘোষণায়ও তাদের বিশেষ কোন অধিকার থাকতে পারে না।

এই কারণে রাসূলে করীম (স) কাইজারের নিকট ইসলাম কবুলের দাওয়াত পত্রে লিখেছিলেন কুরআনের এই আয়াতঃ

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط

(ال عمران ـ ٦٤)

আস এমন একটা সিদ্ধান্তের দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সর্বতোভাবে সমান ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছেঃ আমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই ইবাদত

করব না, তাঁর সাথে আমরা এক বিন্দু শির্‌ক করব না এবং আমাদের কেউ-ই অপর কাউকেই রব্‌ রূপে গ্রহণ করব না আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে।

অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলে করীম (স)-কে ইয়াহুদী সমাজ তথা সমগ্র মানুষকে ইবরাহীমী মিল্লাত বা আদর্শ অনুসরণের আহবান জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই ভাষায়ঃ

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - (ال عمران - ৯৫)

তোমরা সকলে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ কর সম্পূর্ণরূপে একমুখী হয়ে এবং সে তো মুশরিক ছিল না।

আল্লাহ্‌ তা'আলা এ-ও স্পষ্ট করে বলেছেন যে,যখনই কোন নবী এসেছেন অপর নবীর পরে, সে নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীর সত্যতাকে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন; তাঁর প্রচারিত দ্বীনকে সত্য দ্বীন রূপে চিহ্নিত করেছেন। হযরত ঈসা (আ) তাঁর পূর্ববর্তী নবীর সত্যতা ঘোষণাকারী যেমন, তেমনি হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর পূর্ববর্তী নবী ও কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী ও তার সংরক্ষক। বলেছেনঃ

وَقَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ -

এই নবীগণের পরে আমরা মরিয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তাওরাতের যা কিছু তার সমুখে ছিল, সে ছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী।

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ -

হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি পরম সত্যতা সহকারে। আল-কিতাবের যা কিছু তার সমুখে বর্তমান আছে এটি তার সত্যতা প্রমাণকারী, তার হিফাযতকারী ও সংরক্ষক।

এইসব আয়াত থেকে অবিসংবাদিতভাবে জানা যায় যে, শরীয়াতসমূহের মৌলনীতি ও সে সবের শিকড় ও সার-নির্যাস ছিল সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন।

তাহলে বলা যায়, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসা সকল রিসালাত এক ও অভিন্ন সত্যের ধারক ও বাহক। যুগের পর যুগ ও কালের পর কাল পরিক্রমায় তা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। সকল নবী ও রাসূল বিশ্ব-মানবতার নিকট একই রিসালাত নিয়ে

এসেছেন তাদেরকে পূর্ণত্বের উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করার লক্ষ্যে, তাদেরকে নির্ভুল জীবন যাপন পদ্ধতি ও পবিত্র নৈতিকতার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে।

সন্দেহ নেই, মানুষ দুনিয়ায় প্রথম পদার্পণের পর খুবই সাধারণ ও সাদাসিধা জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের ছিল সম্পদের প্রাচুর্য্য, শান–শওকত ও উপায়–উপকরণের বাহুল্য; তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগও ছিল খুব বিরল ও দুর্বল প্রকৃতির। সে কারণে তাদের জ্ঞান–বুদ্ধিরও যে খুব একটা বিকাশ, উৎকর্ষ বা অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি, তাতেও সংশয় নেই। তাদের কাছে নবীগণ প্রদত্ত শিক্ষা ও শরীয়াতের আইন–বিধানই ছিল একমাত্র সম্বল। উত্তরকালে তারা যখন ক্রমশঃ উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে, তাদের জীবনে সমস্যার প্রাবল্য দেখা দেয়, দিন দিন নতুন নতুন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এবং সে সবের সমাধান করা হয় শরীয়াতের আলোকে। ফলে শরীয়াতের বৃত্ত সম্প্রসারিত হয়, অবস্থায় তাগীদে শরীয়াত নাযিল হতে থাকে ও তা পূর্ণত্বের দিকে এগিয়ে যায়। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'দ্বীন এক, শরীয়াত বিভিন্ন' এই মত সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়ে কুরআনের নিকট স্বীকৃত নয়। আবার সকল শরীয়াতই এক ও অভিন্ন, এই মতও যথার্থ বলে প্রমাণিত নয়। কেননা আল্লাহ্ বলেছেনঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ۔ (الحج-٦٧)

প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমরা একটি ইবাদত পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা তারা অনুসরণ করে চলে; অতএব হে নবী, তারা যেন এই ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়।

কাজেই এ ব্যাপারে মাঝামাঝি মত গ্রহণ করাই উত্তম। তবে পূর্ণাঙ্গ সর্বোত্তম ও সার্বিক কল্যাণময়, সর্বকাল ও সকল স্থানের জন্য উপযোগী এবং যাবতীয় সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানকারী শরীয়াত হচ্ছে তা–ই যা সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) নিয়ে এসেছেন।

দ্বীন এক অথচ শরীয়াত বিভিন্ন, এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتٰكُمْ (المائدة-٤٨)

আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই একই উম্মাত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান বলেই এইরূপ করেছেন।

কেননা একই প্রকৃতি, যোগ্যতা ও অভিন্ন অবস্থার লোকদের জন্য একই শরীয়াত উপযোগী হতে পারে, যেমন দুনিয়ার বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে রয়েছে–যথা পাখী, পিপিলিকা ও মৌমাছি ইত্যাদি। কিন্তু সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট প্রজাতি এই মানুষ তো জীবনে ক্রমাগত বিকাশ ও বিবর্তন লাভ করে। তাদের গতি ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। তাই জীবনের সকল পর্যায় ও স্তরে একই শরীয়াত উপযোগী হতে পারে না। আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাবসমূহের ক্ষেত্রেও আমরা এরই সাথে সঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি। ইনজীল কিতাবের বিধান ছিল পরহেজগারী, সাধুতা ও দুনিয়া ত্যাগের কঠোরতার ধারক। সকল শাসকের নিকট বিনয় প্রকাশ ও সকল সীমালংঘনকারীর আনুগত্যের শিক্ষা রয়েছে তাতে। কিন্তু এই শিক্ষা বর্তমান কালে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাওরাত কিতাবেও অনুরূপ কঠোর ও পালন অযোগ্য আইন–বিধান রয়েছে, যা এযুগের মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

নবী–রাসূলগণ এসেছেন এক এক সময়, একের পর এক। নবুয়্যাতের বৃত্ত অতীত অধ্যায়সমূহে পর পর এসেছে। এই ধারাবাহিকতা চলেছে হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত। তাঁকে পাঠিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বমানবতার প্রতি দেয় এই নিয়ামতকে সম্পূর্ণ ও নিঃশেষ করেছেন। এখানেই দ্বীন–ইসলাম পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর বিশ্বমানবতা এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের ছায়ার অধীন এসে গেছে। মানবতা পেয়েছে একখানি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। ফলে এরপর নবুয়্যাত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর আর কোন নবী ও রাসূলের আগমনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকল না বিশ্ব–মানবতা। কেননা আল্লাহ্র নিকট থেকে যে পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত আসার প্রয়োজন ছিল মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের কথা জানার এবং তাদের জীবন পরিচালনার জন্য, তা আল্লাহ্র শেষ কিতাব কুরআন মজীদ দ্বারাই সম্পূর্ণ হতে পারছে। কুরআন মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে, প্রতিটি ক্ষেত্র ও বাঁকে, প্রতিটি সমস্যার সমাধানে যথাযথ ও পুরোপুরি পথনির্দেশ দিতে পারছে। অতঃপর বিশ্ব–মানবতার যত বিকাশ ও সম্প্রসারণই হোক, কোন পর্যায় ও স্তরেই কুরআন মানুষের জন্য অ–যথেষ্ট প্রমাণিত হবেনা। এই কুরআনই কিয়ামত পর্যন্তকার মানুষের জন্য একমাত্র অবলম্বন। ফলে হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর রিসালাত চিরন্তন, শাশ্বত কিয়ামত পর্যন্ত।

খতমে নবুয়্যাত পর্যায়ে কুরআনী দলীল

কুরআন মজীদ নবুয়্যাত–রিসালাত সমাপ্ত (খতম) হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ঘোষণা দিয়েছে। সে ঘোষণা যেমন সকল সন্দেহ–সংশয় থেকে মুক্ত, তেমনি অ–প্রতিবাদ্য। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য কুরআনের প্রথম ঘোষণা হচ্ছেঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ (الاحزاب ـ ٤٠)

মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারোরই পিতা ছিল না; বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নবীগণের সমাপ্তিকারী। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

নবী করীম (স) নবুয়্যাত লাভের পূর্বে জায়দকে পালিত পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তদানীন্তন আরবে পালিত পুত্রকে ঔরসজাত পুত্র গণ্য করা হত এবং বৈবাহিক দিক দিয়ে ঔরসজাত পুত্রের ব্যাপারে বৈধতার যে ধারণা রাখত, পালিত পুত্রের বেলায়ও তা–ই প্রয়োগ করত। এটা ছিল জাহিলিয়তের একটা প্রচন্ড রসম। আল্লাহ্ এই রসমকে বাতিল করবার ইচ্ছা করলেন। হযরত জায়দ (রা) রাসূলে করীম (স)–এর আত্মীয়া হযরত জয়নব (রা)–কে বিয়ে করার পর তালাক দিলেন। তখন আল্লাহ্ রাসূলে করীম (স)–কে নির্দেশ দিলেন জায়নব (রা)–কে বিয়ে করার। তিনি যখন তাঁকে বিয়ে করলেন, তখন মুনাফিকরা রাসূলে করীম (স)–এর বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা প্রচারণার মহা সুযোগ পেয়ে গেল। তারা সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগল, 'মুহাম্মাদ তাঁর পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন।' আল্লাহ্ তা'আলা এরই প্রতিবাদে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ তখন নবী করীম (স)–এর কোন পুত্র সন্তান বেঁচে ছিলেন না। ফলে তিনি নিজ ঔরসজাত কোন পুত্র বা পুরুষের পিতা ছিলেন না। হযরত জায়দ (রা)–এর তিনি পালক পিতা ছিলেন মাত্র, জন্মদাতা পিতা নন। উপরন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন বলে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশই অমান্য করতে পারেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন নবীগণের সমাপ্তিকারী। তাঁর পরে আর কোন নবী–রাসূল আসবে না। অতএব যত প্রকারের মারাত্মক ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে,তার অবসান ঘটানোর কাজ তাঁকেই সম্পন্ন করতে হবে। তাই পালিত পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে বিয়ে করে এই দায়িত্বটি তিনি পালন করেছেন মাত্র। এই কাজটি তিনি না করলে কিয়ামত পর্যন্ত এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচলন বিশ্ব–মানবকে কঠিন সমস্যায় জর্জরিত করতে থাকত।

'খাতাম' শব্দের তাৎপর্যঃ

শব্দটি 'খাতাম' হতে পারে, হতে পারে 'খাতেম'ও। তা ক্রিয়াবাচক হতে পারে, হতে পারে 'শেষ' অর্থে নাম ও পদ। যা দিয়ে শেষ করা হয়, এটি তা–ও বোঝাতে পারে। অর্থাৎ তা দিয়ে নবুয়্যাতের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যেমন পত্র লেখা শেষ করে খাম বন্ধ করে উপরে গালা লাগিয়ে সীল মেরে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, যেন

প্রাপক ছাড়া আর কেউ তা খুলতে না পারে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত আয়াতের 'খাতাম' শব্দটির একটিই অর্থ হতে পারে। আর তা হচ্ছে, তা এমন যে, তার দ্বারা নবুয়্যাতের দুয়ার চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতএব তাঁর পর আর কোন নবুয়্যাতও নেই— নেই কোন রিসালাত।

এই যা কিছু বলা হলো তা হচ্ছে চৌদ্দশ বছরকালীন অভিধান, তাফসীর ও ইতিহাসের সার–নির্যাস। এ ব্যাপারে দুজন ব্যক্তিও ভিন্ন মত প্রকাশ করেননি।

আমাদের এই আলোচনায় আমরা প্রথমতঃ কুরআনের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই শব্দটি বা তার রূপান্তর কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা সর্বপ্রথম কুরআনেই অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে চেষ্টা করব।

এ পর্যায়ের আয়াতসমূহঃ

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ـ (المطففين ، ٢٥)

তাদেরকে (জান্নাতী লোকদেরকে) উত্তম–উৎকৃষ্ট মুখবন্ধ শরাব পান করানো হবে।

অর্থাৎ এমন শরাব যা খাঁটি, যাতে কোনরূপ মাদকতা নেই। তার পাত্রের মুখ মিশ্‌ক সুগন্ধির আবরণ দ্বারা বন্ধ করা হবে। (অথবা তার মুখ মোম ধরনের জিনিস দ্বারা বন্ধ রাখা হয় বলে তা খাঁটি থাকে।)

خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ـ (المطففين ، ٢٦)

তার উপর মিশ্‌ক–এর সীল লাগানো। যেসব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে ইচ্ছুক, তারা যেন এ জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ـ (الشورى ـ ٢٤)

এই লোকেরা কি বলে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা অভিযোগ রচনা করেছে? আল্লাহ্ চাইলে তোমার দিলের উপর সীল (মহর) মেরে দিবেন।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ـ (يس ـ ٦٥)

আজকের দিনে তাদের মুখের উপর সীল (মহর) মেরে দেব এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে।

মুখের উপর সীল (মহর) মেরে দিলে মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, মুখ দিয়ে কথা বলতে পারবে না। তখন তাদের হাতসমূহ কথা বলবে।

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط

–তুমি কি কখনও এই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ, যে লোক নিজের নফসের খাহেশকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ্ জেনে–শুনেই তাকে গুমরাহীর মধ্যে ফেলে রেখেছেন, তার শ্রবণ শক্তি ও দিলের উপর সীল (মহর) মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছেন?

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ـ (البقرة ـ ٧)

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দিলসমূহ ও শ্রবণ শক্তির উপর সীল (মহর) মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিসমূহের উপর আবরণ রয়েছে।

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ (الانعام ـ ٤٦)

বল, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, আল্লাহ্–ই যদি তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিতেন এবং তোমাদের দিলসমূহের উপর সীল (মহর) মেরে দিতেন, তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া এমন ইলাহ কে ছিল যে তোমাদেরকে সেসব ফিরিয়ে দিত?

বস্তুতঃ কাফিররা যখন কুফরির নীতি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে নিল, আল্লাহ্ জানতে পারলেন যে, ওরা আর কখনই ঈমান আনবে না, তখন তিনি তাদের দিলসমূহের উপর সীল (মহর) মেরে দিলেন, যেমন করে কোন বোতলের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় মোম দিয়ে বা মাটি দিয়ে। ফলে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর কোন জিনিসই তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তার মধ্য থেকে কোন জিনিস বাইরে বের হয়েও আসতে পারে না। ঠিক তেমনি কাফিরদের দিলকে মহরাঙ্কিত করে দিলে তাতে ঈমান প্রবেশ করতে পারে না, তার মধ্য থেকে কুফর বের হয়েও যেতে পারে না।

তাহলে কোন জিনিসের উপর خَتَمَ অর্থাৎ 'মহর' অঙ্কিত করে দেয়া হয়েছে বলা হলে বুঝতে হবে, সে জিনিস শেষ হয়ে গেছে। তার মধ্যে আর কিছুই করার নেই, কিছু করার একবিন্দু অবকাশও নেই। 'দিলের উপর মহর' মানে দিলের চূড়ান্ত অবস্থা

প্রাপ্তি এবং তা কুফর ও নাস্তিকতার ভাবধারায় সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে যাওয়া, তাতে এক বিন্দু স্থানও অবশিষ্ট না থাকা সত্যের নূর প্রবেশের জন্য। ঠিক তেমনি কোন চিঠি লিখে খামে ভরে তার উপর সীল (মহর) মেরে দেওয়ার অর্থ, চিঠি শেষ হয়ে গেছে, যা কিছু লেখার তা সবই শেষ বারের তরে লিখে দেয়া হয়েছে, অতঃপর লিখবার আর কিছু নেই, তার সুযোগও নেই। সব বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সে চিঠিতে পুরোপুরি ব্যক্ত হয়েছে এবং বলার ও লেখার যা কিছু ছিল, তা সব-ই সে চিঠিতে শেষ করে দেয়া হয়েছে। কিছুই আর বাকী নেই।

নবুয়্যাত এর উপর 'মহর' লাগানোর অর্থ হচ্ছে, নবুয়্যাতের দুয়ার ও সম্ভাবনা সবই চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার দুয়ারের উপর সীল (মহর) মেরে দেয়া হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত সে দুয়ার তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে। কোনদিনই সে তালা খোলা হবে না।

মোটকথা 'খাতাম' শব্দের অর্থ একটা-ই হতে পারে। আর তা হচ্ছে সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। চিঠির মুখ বন্ধ করে তার উপর গালা দিয়ে সীল মারার পর যা হয়, তা-ই হয়ে গেছে।

আরবী অভিধানের ইমাম ইবনে ফারেস লিখেছেনঃ

اَلْخَتْمُ لَهٗ اَصْلٌ وَّاحِدٌ وَّهُوَ الْبُلُوْغُ اٰخِرَ الشَّيْءِ يُقَالُ خَتَمْتُ الْعَمَلَ وَخَتَمَ الْقَارِئُ السُّوْرَةَ

'খাতম'-এর মৌল একটাই। আর তা হচ্ছে জিনিসের সর্বশেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া। যেমন বলা হয়ঃ 'আমি কাজ শেষ করেছি' এবং 'পাঠক সূরাটি শেষ করেছে।'

এই خَتْم -এর আর একটি অর্থ হচ্ছে 'মহর' বা সীল মারা। চিঠি লেখা শেষ করে খামের মধ্যে ভরে মুখ বন্ধ করে দেয়া। কেননা চিঠি লেখা শেষ না করে তা কেউ খামে ভরে না, তার মুখও আটকিয়ে দেয় না خَاتَم এই শব্দ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা তার দ্বারাই শেষ করা হয়।

হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বশেষ নবী—নবীগণের শেষ। কেননা তিনি সর্বশেষে এসেছেন, তাঁর পর আর কোন নবী আসবার নয়।

ভাষা বিশারদ আবুল বাকা' আল-আকবরী বলেছেনঃ খাতাম (خَاتَم) অর্থ খতম করা। আর অন্যরা বলেছেনঃ নবীগণের শেষ। কেউ কেউ বলেছেনঃ তাঁর দ্বারা নবীগণের আগমন শেষ করা হয়েছে, যেমন করে 'মহর' লাগিয়ে চিঠি শেষ করা হয়। আর 'খাতিম' ও পড়া যায়। তার অর্থ হবে, নবীগণের শেষ।[১]

জাওহারী বলেছেন خَتَمَهُ يَخْتِمُهُ، خَتْمًا، خِتَامًا এই সবের অর্থ, দিলের উপর সীল (মহর) মারা। বুঝবার শক্তি নিঃশেষ হওয়া, ভেতর থেকে কিছু বের হতে না

১. التبيان في اعراب القرآن ج٢ ص ١٠٠

পারা। কোন জিনিসের 'খাতম' অর্থ, তার শেষে পৌঁছে যাওয়া। 'খিতাম' অর্থ মাটি, যা দিয়ে কোন জিনিসের মুখ বন্ধ করা হয়। আর 'খাতাম' অর্থ যা বন্ধ মুখের উপর রাখা হয়। আংগুলে পরা অংগুরীয়–ও তার অর্থ হতে পারে।

ফীরোজাবাদী লিখেছেনঃ خَتَمْتُ الشَّيْءَ خَتْمًا কোন জিনিস আমি শেষ করেছি অর্থাৎ তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। خَتَمْتُ الْقُرْاٰنَ 'আমি কুরআন পাঠ শেষ করেছি' অর্থাৎ কুরআন পড়তে পড়তে একেবারে শেষে গিয়ে পৌঁছিয়েছি। এই দৃষ্টিতে خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ অর্থ মুহাম্মাদ (স) নবীগণের শেষকারী। ختام অর্থ সেই মাটি যা দিয়ে শেষ করা হয়, মুখ বন্ধ করা হয়। خِتَامُهٗ مِسْكٌ আল্লাহ্র এই কথাটির অর্থঃ তার সর্বশেষ হচ্ছে মিশক। কেননা সর্বশেষে যার সুগন্ধি পাওয়া যায় তা হচ্ছে মিশ্‌ক। (আল–কামুস)

ইবনে মনযুর লিখেছেনঃ ختام القوم অর্থ জনগণের সর্বশেষ ব্যক্তি। এই দিক দিয়ে মুহাম্মাদ (স) নবীগণের শেষ। নবীর নামসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে; خاتم। আর উক্ত আয়াতে 'খাতাম' অর্থ নবীগণের শেষ।

বায়যাবী তাঁর তাফসীরে লিখেছেনঃ

وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ اٰخِرُهُمُ الَّذِىْ خَتَمَهُمْ۔

'খাতামান্নাবীয়ীন' অর্থ , তাঁদের সর্বশেষ জন, যাঁর দ্বারা তাঁদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।' (লিসানুল আরব)

তাফসীরে জালালাইন–এ লেখা হয়েছেঃ

وَفِىْ قِرَاْءَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ كَاٰلَةِ الْخَتْمِ اَىْ بِهٖ خُتِمُوْا

'তা–জবর–'খাতাম' অর্থ 'শেষ করার যন্ত্র'। অর্থাৎ তাঁর দ্বারাই তাঁরা শেষ হয়েছেন।

ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ

يطلق الختم على البلوغ الى اٰخر الشئ نحو ختمت القراٰن اى انتهيت الى اٰخره و

خاتم النّبيين لانه ختم النبوة اى تممها بمجيئه ـ

'খাতম' শব্দটি ব্যবহৃত হয় একটা জিনিসের সর্বশেষ প্রান্তে পৌঁছার কথা বোঝাবার জন্য। যেমন 'আমি কুরআন খতম করেছি' অর্থ কুরআনের শেষ পর্যন্ত পড়েছি। আর

'খাতামান্নাবীয়ীন' বলা হয়েছে এজন্য যে, তিনি নবুয়্যাত খতম করেছেন অর্থাৎ তাঁর আগমনের দ্বারা নবুয়্যাতের ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ ও শেষ করে দেয়া হয়েছে।

এইসব কিছু থেকে একটা কথাই প্রমাণিত হয়। আর তা হচ্ছে, শেষ হওয়া। সর্বশেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া।

আংগুলের অলংকার–সৌন্দর্য—অংগুরীয়—অর্থে এই শব্দের ব্যবহার এ কারণে হতে পারে যে, রাসূলে করীম (স)–এর সময়ে চিঠি লেখার পর মুখ বন্ধ করে তার উপর তা দিয়ে মহর লাগানো হত। আর এটাই হত সর্বশেষ কাজ। তা কখনই শুরু করার আগেই লাগানো হত না

ঐতিহাসিক ইবনে সায়াদের বর্ণনা থেকে এটা–ই প্রমাণিত হয়। রাসূলে করীম (স) বিভিন্ন রাজা–বাদশাহ ও শাসকের নিকট চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। তাতে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তখন তাঁকে বলা হলোঃ হে রাসূল। রাজা–বাদশাহরা তো এমন চিঠি পড়েই না যার মুখ মহর লাগিয়ে বন্ধ করা হয়নি। তখন তিনি একটি রৌপ্য অংগুরীয় বানালেন, তার উপর লেখা ছিল 'মুহাম্মাদ–রাসূল–আল্লাহ'। তদ্বারা তিনি চিঠির উপর মহর লাগিয়ে দিতেন।[১]

ইতিহাস–দার্শনিক ইবনে খালদুন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা অংশে (মুকাদ্দামায়) লিখেছেনঃ 'খাতম' রাজকীয় ও বাদশাহী রীতি–নীতির অন্তর্ভুক্ত। চিঠি ও চেকসমূহের উপর 'মহর' লাগানো ইসলামের পূর্ব থেকে চলে আসা একটা সুপরিচিত রীতি বিশেষ। ইসলামের যুগে এবং পরবর্তীতেও তা চালু রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (স) কাইজারের নিকট চিঠি লেখার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো অনারব লোকেরা কোন চিঠিই গ্রহণ করে না যতক্ষণ তা মহর অঙ্কিত না হয়। তখন নবী করীম (স) একটা 'মহর' বানালেন। তাতে অংকিত ছিল 'মুহাম্মাদ–রাসূল–আল্লাহ্'।

বুখারী শরীফে উল্লেখিত হয়েছেঃ উক্ত তিনটি শব্দ তিনটি ছত্রে সাজানো হয়েছিল এবং তা দিয়েই 'মহর' লাগান হত। খালদুন বলেছেন, হযরত আবু বকর, উমার ও উসমান (রা) এই তিনজন খলীফা–ও 'মহর' লাগাবার কাজ করতেন সেই মহর দিয়ে। পরে হযরত উসমানের হাত থেকে সেটি আরীস কূপে পড়ে যায় ——।

তিনি আরও লিখেছেনঃ 'মহর' বা অংগুরীয় একটি যন্ত্র বিশেষ, আংগুলে তা পরা হয় এবং সেটি দিয়েই 'মহর' লাগানো হয় যখন তা পরা হয়। বলা হয়ঃ خَتَمْتُ الْأَمْرَ 'আমি ব্যাপারটি শেষ করে দিয়েছি'। وَخَتَمْتُ الْقُرْآنَ 'আমি কুরআন শেষ করেছি।' যখন তা শুরু থেকে পড়ে শেষ পর্যন্ত পৌছা হয় তখনই এই রূপ কথা বলা হয়। 'খাতামান্নাবীয়ীন' কথাটিও সেই অর্থ বহন করে। অর্থাৎ নবীগণের শেষ।

১. الطبقات الكبرى ج ١ ص ٢٥٨

'খাতাম' শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে বাঁধ, যা দিয়ে কোন কিছুর পথ রোধ করা হয়, স্রোত বা প্রবাহ রুদ্ধ করা হয়।

সংশয়

রাসূলে করীম (স)–এর 'খাতাম' হওয়ার ব্যাপারে আয়াতের তাৎপর্যে দুটি সন্দেহ পেশ করা হয়েছে। কাদিয়ানী ও বাহায়ী মতের লোকেরাই এই সন্দেহ দুটির উপস্থাপক, যদিও এ দুটি গোষ্ঠীর লোকদের আকীদা–বিশ্বাস মোটেই এক নয় বরং অনেক পার্থক্য রয়েছে তাতে। প্রথম সন্দেহটি 'খাতাম' (خاتم) শব্দের তাৎপর্যে, আর দ্বিতীয় সংশয় 'নবীয়ীন' সম্পর্কে। কাদিয়ানীরা বলেছেঃ 'খাতাম' শব্দ দ্বারা নবুয়্যাতের ধারা শেষ হয়ে গেছে রাসূলে করীম (স) দ্বারা, তা বুঝায় না। কেননা 'খাতাম' অর্থ আংটিও হতে পারে, যা সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আংগুলে পরা হয়। তাই এর অর্থ হবে, সৌন্দর্যের দিক দিয়ে নবীর আংটি সদৃশ হওয়া। মুহাম্মাদ (স) পূর্ণত্বের এত উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেছেন যে, তিনি সব নবীর সৌন্দর্য বা অলংকার সদৃশ হয়ে পড়েছেন। ফলে আংগুলে আংটি পরলে যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, তাঁর কারণে নবীগণেরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

এছাড়া আরো একটি অর্থ হতে পারে। তা হচ্ছে, তিনি 'খাতামান্নবীয়ীন' অর্থ, সব নবীর সত্যতা ঘোষণাকারী। তাঁদের প্রতি যে কিতাব, সহীফা ইত্যাদি নাযিল হয়েছে, সে সবেরও সত্যতা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি সর্বশেষ নবী নন।

এর জওয়াবে বলতে হয়, এটা কোন সন্দেহ নয়, সত্য বা যুক্তি–প্রমাণ ভিত্তিক কোন কথাও নয় এটা। এ কথাটি বলে সন্দেহের সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র।

আরবী ভাষা জানে এমন কোন লোকই এই ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলতে পারেনা; বরং সামান্য সততা ও বিচক্ষণতা আছে, এমন যে–কোন লোক প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরবী ভাষা ও কুরআন পারদর্শী মনীষীদের উপরিউদ্ধৃত তাৎপর্যসমূহকে স্বীকার করতে বাধ্য। কেননা 'খাতাম' শব্দটিকে কেউ–ই সৌন্দর্য বা অলংকার মাত্র মনে করেননি রাসূলের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই শব্দটি এ অর্থে কোনদিনই ব্যবহৃত হয়নি; সে রূপ অর্থ গ্রহণের কোন কারণও এখানে নেই। মীর্জা গোলাম আহমাদ নিজেই এই শব্দটিকে প্রথম পর্যায়ে উক্ত অর্থের বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেছে। বলেছেঃ

والصّلوة والسّلام علىٰ سيّد العالم ومربى الامم الذى به انتهت الرّسالة والنبوة

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সারে জাহানের সরদার ও জাতিসমূহের মুরব্বীর প্রতি, যাঁর দ্বারা রিসালাত ও নবুয়্যাত শেষ বিন্দুতে পৌঁছে গেছে।[১]

---

১. اشراقات ص۲۹۲

আর দ্বিতীয় সংশয়ের জওয়াবে বলতে হয়, 'খাতামান্নাবীয়ীন' অর্থ যদি নবীগণের সত্যতা বিধানকারীই হত তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এর চাইতেও স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক শব্দ مصدق النبيين 'নবীগণের সত্যতা ঘোষণাকারী' বললেন না কেন? এটাই তো অধিক প্রযোজ্য শব্দ ছিল?

অতীতের নবীগণের সত্যতা ঘোষণাকারী হওয়া হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর একার কোন বিশেষত্ব নয়। কেননা হযরত ঈসা (আ)ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতা ঘোষণাকারী ছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফাসমূহেরও। আল্লাহ্ নিজেই তার ঘোষণা দিয়েছেন এ আয়াতেঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ - (الصف ٦)

স্মরণ কর, মরিয়াম পুত্র ঈসা যখন বলল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত এবং আমার সমুখে বর্তমান তাওরাতের সত্যতা ঘোষণাকারী ও আমার পরে আসবে এমন এক রাসূলের সুসংবাদদাতা, যার নাম হবে আহমাদ।

'খাতাম' শব্দের অর্থ যদি সত্যতা 'ঘোষণাকারী' হত, তাহলে এ এমন একটা পরিচিতি, যা কেবল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এরই নয়, অন্যান্য নবী রাসূলগণেরও রয়েছে। এতে মুহাম্মাদ (স)-এর কোন বিশেষত্ব দেখানো হল না। তাই বলতে হবে, কাদিয়ানীদের উক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয় সন্দেহ

'নবুয়্যাত' ও 'রিসালাত' এক জিনিস নয়, দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উক্ত আয়াতে নবুয়্যাত খতম হওয়ার কথা বলা হয়েছে মাত্র, 'রিসালাত' খতম হওয়ার কথা বলা হয়নি। আর তা কখনই বন্ধ হবেও না। এটা বাহায়ীদের উত্থাপিত কথা।

এই বিষয়ে সত্য উদঘাটন নির্ভর করে নবী ও রাসূল আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রূপে কুরআন মজীদে কি বলা হয়েছে তা নির্ভুল ও স্পষ্টভাবে জেনে নেয়ার উপর। নবী ও রাসূল-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা আমরা পরে আলোচনা করব। তাতে আমরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব যে, নবুয়্যাত 'খতম' হওয়ার অর্থ রিসালাত-এরও চিরতরে খতম হয়ে যাওয়া।

সে পর্যায়ে আমাদের বক্তব্যের সার নির্যাস হচ্ছে, কুরআনুল করীমের আয়াত ও অভিধানে বিবৃত অর্থের দিক দিয়ে 'নবী' হচ্ছেন এমন ব্যক্তি, যিনি পরিচিত কোন

একটি পন্থায় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী প্রাপ্ত হন। আর 'রাসূল' হচ্ছেন এমন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন কোন কথা পৌছানোর, প্রচারের অথবা বিশেষ কোন কাজ সম্পাদনের জন্য। এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, নবুয়্যাত এমন একটি পদ যা গায়বী জগতের সাথে পরিচিত-অভ্যস্ত কোন একটি উপায়ে সংযোগ স্থাপনের দাবি করে। আর 'রিসালাত' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানব সমাজে কার্যকর করার ও যাদের প্রতি প্রেরিত তাদের প্রতি তা পৌছিয়ে দেয়ার জন্য এক ধরনের দৌত্য বাপ্রতিনিধিত্ব।

তৃতীয় পর্যায়ে নবুয়্যাত হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সংবাদ বহন। আর রিসালাত হচ্ছে বহন করা সংবাদ কার্যকর করণ, সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণ তাবলীগ ও কার্যকর করণের মাধ্যমে।

এ কারণেই কুরআন মজীদে 'নবী' বা 'নবীয়ীন' (نبيّين) শব্দ যেখানেই ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেই ওহী (و حى) শব্দটি এসেছে। যেমন এ আয়াতেঃ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۔ (النساء-١٦٣)

নিঃসন্দেহে আমরা তোমার প্রতি— হে নবী!—ওহী পাঠিয়েছি যেমন ওহী পাঠিয়েছি নূহ এবং তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি।

অবশ্য 'রাসূল' শব্দের পাশেও 'ওহী' শব্দটি এসেছে অপর আয়াতে; অপর প্রেক্ষিতে তা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। যেমন কুরআনে রাসূলকে আল্লাহ্‌র কালাম পৌছে দেয়ার ও তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যথা ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدة-٦٧)

হে রাসূল! তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তোমার রব্-এর নিকট থেকে, তা তুমি পুরোপুরি পৌছিয়ে দাও।

বলেছেনঃ

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۔ (مريم- ١٩)

সে বলল, আমি তোমার রব্-এর প্রেরিত; প্রেরিত হয়েছি এজন্য যে, আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করব।

অতএব 'নবী' শব্দটি সংবাদদাতা বা সংবাদ বাহক অর্থে অথবা আল্লাহ্ সম্পর্কে সংবাদদাতা বা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ প্রচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর

'রাসূল' শব্দটি 'নবী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সংবাদ বহন করে নিয়ে আসেন ওহীর মাধ্যমে, রাসূল তার বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাজেই 'নবুয়্যাত–এর দ্বার রুদ্ধ হলে এবং ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে 'রিসালাত'–এর দ্বারও চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে যায় নিঃসন্দেহে। কেননা 'রিসালাত' বলতে নবী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে যা কিছু বহন করে আনেন বা যার ধারক হন, তার বাস্তবায়ন ও কার্যকরকরণ ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝায় না। ফলে 'ওহী' বন্ধ হয়ে গেলে অথবা প্রথম সূত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে কিংবা সে বিষয়ে অবগতি নিঃশেষ হয়ে গেলে, 'রিসালাত' পর্যায়ের কোন কাজ–ই অবশিষ্ট থাকতে পারেনা। অতএব মুহাম্মাদ (স) যখন 'খাতামান্নাবীয়ীন' (خَاتَمُ النَّبِيِّينَ)–ওহী পাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যক্তি—তখন তিনি 'রিসালাত' ও 'মুরসালীন'–এরও সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের রাসূল হওয়ার অর্থ, ওহী সূত্রে যা কিছু পাওয়া গেছে, তার বর্ণনা দান অথবা কার্যকর করণের দায়িত্বলাভ। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেলে কিংবা তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হলে কারোর পক্ষেই রিসালাত–এর দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না। অতঃপর কারোই আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে থাকার দাবি করাও কোনক্রমেই স্বীকৃতব্য নয়।

অতঃপর আমরা কুরআন মজীদ থেকে সে সব আয়াত উদ্ধৃত করব, যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) 'খাতামান্নাবীয়ীন' সমস্ত নবীর সর্বশেষ নবীই শুধু নয়, তিনি সমস্ত রাসূলেরও 'খাতাম'—সর্বশেষ। তাঁরপর আর কোন রাসূল আসবেন না, হবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ـ (الفرقان ـ ١)

মহান পবিত্র সেই আল্লাহ্, যিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাঁর বান্দাহর উপর, যেন সে সারে জাহানের জন্য সতর্ককারী—ভয় প্রদর্শক হতে পারে।

আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, 'ফুরকান'—অর্থাৎ কুরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন মুহাম্মাদ (স) সমগ্র জাহানের জন্য সতর্ককারী—ভয় প্রদর্শক হতে পারেন। তার অর্থ কুরআন নাযিল হওয়ার সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ—সৃষ্টিকুল থাকবে, তাদের সকলের জন্য একমাত্র ভয় প্রদর্শক—সতর্ককারী হচ্ছেন তিনি এবং তাঁর প্রতি নাযিল হওয়া কুরআন সকলের জন্যই হেদায়েত—ভয়প্রদর্শন–সতর্ককরণের একমাত্র বাহন বা মাধ্যম কিতাব। ফলে এই সময়ের মধ্যে যেমন অপর কোন ভয় প্রদর্শক—সতর্ককারীর আগমন হবে না, তেমনি অপর কোন গ্রন্থও নাযিল করা হবে

ইমাম রাগেব ইসফাহানী লিখেছেন الْعَالَم এক বচন, বহু বচনে الْعٰلَمِيْن অর্থ আকাশমন্ডল এবং তা যা কিছুই গ্রাস করে রেখেছে। আসলে তা হচ্ছে সেই জিনিসের নাম যদ্বারা অন্যকিছু জানা যায়। যেমন 'মহর' ও আংটি। 'মহর' কোন কিছুর উপর লাগানো হয়, আংটি দিয়ে কোন জিনিসে ছাপ দেয়া হয়। এ দুটি জিনিস হাতিয়ার হিসাবেই বানানো হয়। এই বিশ্বলোকও একটি হাতিয়ার বিশেষ, তদ্বারা বিশ্বলোকের স্রষ্টা বা নির্মাতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই 'আলম' (عَالَم) শব্দটিরই বহু বচন (عٰلَمِيْن) এক-একটি প্রজাতি ও জাতি এক-একটি عالم জগত। যেমন বলা হয়, মানবজগত, পশুজগত, পাখীজগত, বৃক্ষজগত ইত্যাদি। এই জগতসমূহের সামষ্টিক রূপই হল সমগ্র বিশ্বলোক—'আলামীন'। সৃষ্টিকুলের এক-একটি শ্রেণী—জাতি বা প্রজাতিকে এক-একটি 'আলম' বা জগত বলা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।

আল্লামা জামাখশারী বলেছেন, 'আল-আলম' বলতে ফেরেশতা, জ্বিন্ ও মানুষ বুঝায়। অন্যরা বলেছেন, যে সৃষ্টি দ্বারাই স্রষ্টাকে বুঝা যায়, তা-ই 'আলম'। শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে সকল জাতি ও প্রজাতি বুঝাবার জন্য।

সে যা-ই হোক, হযরত মুহাম্মাদ (স) 'নযীর'—ভয় প্রদর্শক—সতর্ককারক হচ্ছেন বিশেষভাবে মানবকুলের জন্য অথবা শুধু 'বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি'র জন্য। অতএব বুঝা গেল, রাসূলে করীম (স) 'নযীর' হচ্ছেন নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য। এ মানুষের মধ্যে কোন বিভক্তি বা পার্থক্য নেই, কোন মানুষই বাদ যায় না—তারা সেকালের হোক কি একালের। তাহলে কিয়ামত পর্যন্তকার মানুষের জন্য তিনি 'নযীর'। এর মধ্যে অন্য কারোর 'নযীর' হয়ে আসার অবকাশ নেই, নেই একবিন্দু প্রয়োজন বা সম্ভাবনা। অবশ্য কারো কারো মতে 'আলামীন' বা 'আলামুন' শব্দটি বিপুলজনসমাবেশকেওবুঝায়।[১] আর সে ক্ষেত্রে অবশ্য উপরের বক্তব্য প্রযোজ্য হবে না।

কিন্তু আমরা একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। কেননা আল-আলামীন শব্দটি থেকে প্রচলিত অর্থেও কুরআনে ব্যবহারের দিক দিয়ে উপরে বর্ণিত সাধারণ অর্থই বুঝতে হবে। এ দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টিকুল বুঝাবে। যেমন কুরআনের আয়াতঃ

---

১. যেমন এ আয়াতটিতেঃ

يَا بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ

(البقرة ـ ٤٧)

হে বনী ইসরাঈল, তোমরা স্মরণ কর আমার দেয়া নিয়ামতকে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং বহু মানুষের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ـ

(الشعراء ـ ٢٣ـ٢٤)

ফিরাউন বলল, রাব্বুল আলামীন আবার কি? বললঃ তিনি আসমান যমীনের এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা–ই আছে, সেই সবের রব্ব।

এভাবে আরও বহু সংখ্যক আয়াতে 'আল–আলামীন' শব্দটি সমগ্র সৃষ্টিলোক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফেরেশতা, মানুষ ও জ্বিন সবই তার অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ (البقرة ـ ٢٥١)

বরং আল্লাহ্ তা'আলা অতীব অনুগ্রহশীল সমগ্র জাহানের প্রতি।

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ (ال عمران ـ ١٠٨)

আল্লাহ্ সারে জাহানের উপর জুলুম করার ইচ্ছা করেন না।

'আল–আলামীন' বলতে শুধু মানুষকেও বুঝিয়েছে। যেমন এ আয়াতটিতেঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ (ال عمران ـ ٩٦)

নিশ্চয় মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরটি নির্মিত হয়েছে তা মক্কায় অবস্থিত। তা অতীব বরকতপূর্ণ এবং সমগ্র মানব জাহানের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম।

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ (الشعراء ـ ١٦٥)

তোমরা মানব সমাজ থেকে পুরুষদের নিকট গমন কর?

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ (الاعراف ـ ٨٠)

তোমরা এমন সব নির্লজ্জতার কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ–ই করেনি।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে,'আল–আলামীন' শব্দটির অন্য কোন অর্থ হতে পারে না। অবশ্য কোন কারণ যদি তেমন প্রকট থাকে তাহলে অন্য কথা। কিন্তু এসব আয়াতে তেমন কোন কারণ–ই দেখা যায় না।

তবে আল্লাহ্র কথাঃ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ 'আমি তোমাদেরকে বিপুল মানুষের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি'–এর বাহ্যিক অর্থ ঠিক তা নয় যা আল্লামা জামাখশারী বলেছেন। কেননা তাঁর সময়কার তাফসীর লেখক বড় বড় আলেমগণ উক্ত শব্দের ঐ অর্থ লিখেন নি। তাঁরা ঐ শব্দের অর্থ লিখেছেন, 'সমসাময়িক কালের জনগণ'। যেমন এ আয়াতটি ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ ۔ (ال عمران ٤٢)

আল্লাহ্ তোমাকে উচ্চতর সম্মান দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন ও পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর মহিলাদের উপর প্রধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে নিজের কাজের জন্য মনোনীত করেছেন।

এ আয়াতের 'আল–আলামীন' শব্দের অর্থও সমসাময়িক কালের লোকজন মাত্র, তার অধিক কিছু নয়।

তৃতীয় পর্যায়ে খতমে নবুয়্যাতের অকাট্য দলীল হচ্ছে কুরআন মজীদ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۔ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۔ (حم السجدة ٤١-٤٢)

এরা সেই লোক যাদের সামনে নসীহতের কালাম যখনই আসে, তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। বস্তুতঃ তা একখানি অতীব সম্মানিত শক্তিশালী কিতাব। তাতে বাতিল না সামনের দিক থেকে প্রবেশ করতে পারে, না পেছন দিক থেকে। তা এক মহাজ্ঞানী ও সুপ্রসংশিত সত্তার নাযিল করা কিতাব।

আয়াতের الذكر 'উপদেশের কালাম' বলতে কুরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۔ (ال عمران ۔ ٥٨)

এই যা কিছু আমরা তোমার নিকট উপস্থাপন করেছি, তা আয়াত এবং যুক্তি ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ।

এ আয়াতেও 'যিকরিল হাকিম' বলতে কুরআনকেই বোঝানো হয়েছে।

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ (النحل-٤٤)

এবং আমরা তোমার প্রতি উপদেশ—কুরআন—নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের জন্য নাযিল হওয়া এই উপদেশ—কুরআন—এর ব্যাখ্যা দিতে পার এবং যেন লোকেরা তা গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করে।

উপরোদ্ধৃত প্রথম আয়াতে 'যিকর' অর্থ কুরআন আর তাতে 'বাতিল' প্রবেশ করতে পারবে না কোন একটি দিক দিয়েও। অর্থাৎ তা সর্বপ্রকারের 'বাতিল' থেকে চিরকালই মুক্ত, পবিত্র এবং সুরক্ষিত থাকবে। এ পর্যায়ে কয়েকটি কথাঃ

১. তাতে 'বাতিল' প্রবেশ করতে পারবেনা, অর্থাৎ তা থেকে এক বিন্দু জিনিসও কম হবেনা, তাতে একবিন্দু পরিমাণ কথা বৃদ্ধিও পেতে পারবে না—পরবর্তীতে সংযোজিত হতেও পারবে না।

২. তাতে 'বাতিল' প্রবেশ করতে পারবে না' অর্থ এমন কোন কিতাবও কখনই আসবে না, যা এই কিতাবকে বাতিল করে দিতে ও তাকে 'মনসুখ' করে দিতে পারে, তাকে অকার্যকর ও নিরর্থক বানাতে পারে, অপ্রযোজ্য করে দিতে পারে। অতএব তা চিরন্তন সত্য, সুদৃঢ় ও শাশ্বত কিতাব। তা একবিন্দু পরিবর্তিত হবে না, কাটছাট করা হবে না, পরিত্যক্ত হবে না।

৩. 'তাতে বাতিল আসবে না' অর্থ, অতীত সম্পর্কে কুরআনের দেয়া কোন খবরে এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য পর্যায়ে দেয়া কোন খবরেও বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারবে না, তা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না। অতএব তা সবই পুরামাত্রায় বাস্তব— বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সারকথা, কুরআন সর্বাবস্থায় শাশ্বত, কিয়ামত পর্যন্ত তা স্থায়ী, অপরিবর্তিত থাকবে।

এ আয়াতটিতে আল্লাহর দেয়া গ্যারান্টি তার জন্য রক্ষা ক বচঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ـ (الحجر- ٩)

নিঃসন্দেহে আমরাই এই উপদেশ গ্রন্থ—কুরআন—নাযিল করেছি এবং আমরাই তার সংরক্ষক।

কুরআন নিরংকুশ সত্য। বাতিল কক্ষণই তার সংস্পর্শে আসবে না, আসতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বাতিল–মুক্ত থাকার এই ঘোষণা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন সময়ের সীমাবদ্ধতায় সীমিত নয়, তা বিশেষ কোন সময় বা কাল কিংবা শতাব্দী অথবা বিবর্তনশীল সভ্যতার কোন পর্যায় পর্যন্ত পৌছে কখনই নিঃশেষ বা অপ্রয়োজনীয়, অকেজো কিংবা অপ্রযোজ্য–অনানুসরণীয় হয়ে যাবে না। কেননা নিরংকুশ সত্য ও বাতিল–মুক্ত কিতাবের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, তা চিরকাল–ই মানুষের জীবনে প্রয়োগযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য থাকবে। চিরকাল–ই তা তার সেই কাজ করতে থাকবে, যা এ আয়াতটিতে ঘোষিত হয়েছেঃ

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ـ (الانفال ـ ٨)

যেন সত্য সত্য হয়ে সমুদ্ভাসিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং 'বাতিল'কে বাতিল প্রমাণিত করে দেয়, অপরাধী লোকেরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।

এ প্রেক্ষিতেই বলতে হয়, কুরআন মজীদ যদি নিরংকুশ সত্য কিতাবই হয়, বাতিলের অনুপ্রবেশ থেকে ক্রমাগতভাবে ও চিরকালই সুরক্ষিত থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্তকার মানুষের দ্বারা অনুসৃতব্য —অনুসৃত হতে থাকে, তাহলে রাসূলের রিসালাত এবং তাঁর নবুয়্যাত–ও কিয়ামত পর্যন্তই চলতে থাকবে অব্যাহত ও নির্বিঘ্নভাবে। ফলে তাঁর উপস্থাপিত শরীয়াত–ও অবশ্যই চিরন্তন ও শাশ্বত হবে। আর তা–ই হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর 'খত্‌মে নবুয়্যাত' ও 'খতমে রিসালাতে'র অকাট্য প্রমাণ।

যদি বলা হয়, রাসূলের পরও নতুন শরীয়াত আসবে বা আসতে পারে, তাহলে প্রশ্ন হবেঃ তা কি পুরোপুরিভাবে সত্য ইসলামী শরীয়াতের অনুরূপ হবে, না তা থেকে কিছু–না–কিছু ভিন্নতর? যদি সর্বতোভাবে সত্য ইসলামী শরীয়াত অনুরূপই হয় এবং তাতেও যদি বাতিল প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে বলব, এমন নতুন শরীয়াত আসার কোন প্রয়োজনই নেই, তা সম্পূর্ন অপ্রয়োজনীয়। অতএব তা বাতিল কথা। আর তা যদি বর্তমান শরীয়াতের মতই স্বতন্ত্র সত্য শরীয়াত হয়, তাহলে দুই পরস্পর বিরোধী শরীয়াত হওয়া কিংবা প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির কম সত্য হওয়ার অবস্থা দেখা দিবে। আর এরূপ অবস্থা যে সম্পূর্ন অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

হযরত মুহাম্মাদ (স) চিরদিন–ই তাঁর উপস্থাপিত শরীয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে থাকবেন সেই মহান সত্য কিতাবের সাহায্যে যাতে কোন দিন–ই বাতিল প্রবেশ

করার পথ পাবেনা—ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে থাকবেন তাঁর সুন্নাতের সাহায্যে, যা সুদৃঢ়, সুপরিপক্ক, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া ওহীর সাহায্যে। যেমন কুরআনেই বলা হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوحٰى ۝ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ـ (النجم-٣-٥)

সে নিজ ইচ্ছা মত কথা বলে না, তা তো ওহী, যা তার প্রতি নাযিল হয়। মহাশক্তিমান তাকে শিক্ষা দিয়েছে।

অতএব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, কুরআনের পর শরীয়াত–বাহক অপর কোন কিতাব নাযিল হওয়ার কোন অবকাশই নেই। ইসলাম ছাড়া অপর কোন শরীয়াতও আসতে পারে না আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। কাজেই হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর পর অপর কারো নবী বা রাসূল হওয়ার, কুরআনের পর অপর কোন কিতাবের নাযিল হওয়ার এবং মুহাম্মাদী শরীয়াতের পর অপর কোন শরীয়াতের আগমনের কোন সম্ভাবনা–ই থাকতে পারে না।

'খতমে নবুয়্যাত' সম্পর্কে চতুর্থ পর্যায়ের আয়াতও সে কথাই প্রমাণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۖ (الانعام- ١٩)

ওদের জিজ্ঞাসা কর, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী গণ্য বা গ্রহণীয়? বল, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ হচ্ছেন সাক্ষ্যদাতা। আর এই কুরআন আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যার যার নিকট তা পৌছবে সেই সকলকে ভীত ও সতর্ক করে দেই।

আল্লামা তাবরাসী তাঁর তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ ভাবেঃ 'তা আমার নিকট পাঠানো হয়েছে যেন এই কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত যার যার কাছে পৌছবে তাকে তাকে (পরকাল সম্পর্কে) ভয় দেখাতে পারি'। এই কারণে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ 'যে লোকের নিকট এই খবর পৌছল যে, আমি লা–ইলাহা–ইল্লাল্লাহর দিকে আহবান জানাই, তার নিকটই আমি তা পৌছিয়ে দিলাম।' অর্থাৎ সে আমার দাওয়াত পেয়ে গেল। এখন সে তা গ্রহণ করবে কি করবে না. তা তার দায়িত্ব। আমার

দায়িত্ব পালিত হয়েছে। অতঃপর তার নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছয় নি বলে কোন ওযর করার অবকাশ থাকল না। এতদূর বলা হয়েছে যে, যার নিকট কুরআন পৌছে গেছে, সে যেন মুহাম্মাদ (স)–কে দেখতে পেয়েছে এবং তাঁর মুখেই দ্বীনের দাওয়াত শুনতে পেয়েছে। অতএব কুরআনের কথা হচ্ছে, রাসূলে করীম (স) কিয়ামত পর্যন্তকার মানুষের জন্য দ্বীনের আহবানকারী (داعى) এবং জনগণকে সতর্ককারী, সন্ত্রস্তকারী (نذير)। উপরোক্ত আয়াতের এই তাৎপর্য কুরআনের এ আয়াতটির বক্তব্যের সাথে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্যশীলঃ

وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهُ -

এবং যেন তুমি সতর্ক–ভীত কর মক্কাবাসীদের এবং তার চার পাশে বসবাসকারী লোকদেরকে।

এই পর্যায়ের পরবর্তী আয়াতেঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (سبا - ٢٨)

আর হে নবী! আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভয়–প্রদর্শক (রাসূল) রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অনেকেই তা জানে না।

আয়াতের كَافَّةً শব্দটি الناس এর অবস্থা বা রূপ বর্ণনা করছে। প্রথম শব্দটি দ্বিতীয়টির আগে বসানো হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে তাতে যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়েছে এবং তা এই দাঁড়াচ্ছেঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا لِلنَّاسِ كَافَّةً بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا -

তোমাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক–সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, অন্য কোন রূপে নয়।

কুরআন মজীদে كَافَّةً শব্দটি সমগ্র, সর্বসাধারণ বা পুরাপুরি ইত্যাদি অর্থেই ব্যবহৃতহয়েছে। যেমন–

اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً - (البقرة - ٢٠٨)

ইসলামে পুরাপুরি দাখিল হয়ে যাও।

যেমনঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً - (التوبة-٣٦)

মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে মিলে লড়াই কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে মিলে লড়াই করছে।

অথবা

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً - (التوبة-١٢٢)

ঈমানদার লোকদের সকলেরই এক সাথে বেরিয়ে পড়ার প্রয়োজন ছিলনা।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রথমোক্ত আয়াতটি যেমন প্রমাণ করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর রিসালাত বিশ্বজনীন, তেমনি স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে একথাও প্রমাণ করে যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্তকার সমগ্র মানুষের জন্য প্রেরিত। নতুন করে বা অন্য কাউকে এসময়ে প্রেরণের কোন অবকাশ নেই, তার প্রয়োজনও নেই।[১]

ষষ্ঠ পর্যায়ে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (স)–কে 'খাতামান্নাবীয়ীন এবং তাঁর কিতাব কুরআন মজীদকে 'খাতামুল কুতুব' সর্বশেষ কিতাব যেমন বানিয়েছেন, ঠিক তেমনি সেই কিতাবকে তার পূর্বে নাযিল হওয়া সমগ্র কিতাবের 'ধারক ও সংরক্ষক'ও বানিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ -

---

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদীসটিও ঠিক এ কথাই প্রমাণ করে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

اُرْسِلْتُ اِلَى النَّاسِ كَآفَّةً وَبِىْ خُتِمَ النَّبِيُّوْنَ - (الطبقات الكبرى ج-١، ص-١٩٢)

আমি সমগ্র মানুষের প্রাত প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়েই নবীগণের ধারা নিঃশেষ করা হয়েছে।

عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ - (المائدة : ٤٨)

হে মুহাম্মাদ, আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, তা পরম সত্য বিধানসহ–ই অবতীর্ণ এবং আল–কিতাব থেকে যা কিছু তার সমুখে বর্তমান আছে, সে সবের সত্যতা ঘোষণাকারী এই কিতাব, তার হেফাযতকারী–সংরক্ষক। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নাযিল করা আইন মুতাবিক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা কর। আর যে মহান সত্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে তা থেকে বিরত থেকে তোমাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো না। আমরা তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াতের বিধান ও একটি কর্মপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যদিও আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে একটি উম্মাতের মধ্যে শামিল করতে পারতেন; কিন্তু তিনি ঐ কাজ এজন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সেই ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান।

আয়াতের المهيمن শব্দের অর্থ, অতন্দ্র প্রহরী, সচেতন সংরক্ষক, বিশ্বস্ত আমানতদার। উপরোক্ত আয়াতে কুরআনকে অবতীর্ণ অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থের সংরক্ষক সাক্ষীরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। সকল প্রকার বিকৃতি বা সংযোজন থেকে কুরআন সে সবকে রক্ষা করে ও পরম সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। অন্যান্য কিতাবের প্রতি ঈমানদার লোকেরা তাদের নিজ নিজ কিতাবের সত্য স্পষ্ট বিধান জানতে চাইলে তারা সহজেই কুরআনকে দেখতে পারে, কুরআনেই তা পেতে পারে, কুরআন থেকেই তা জানতে পারে। তাদের নিজেদের কিতাব যথার্থভাবে অন্য কোথাও পেতে পারে না। কেননা তাদেরকে তাদের কিতাবের সম্পূর্ণ জ্ঞান দেয়া হয়নিঃ

أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ - (ال عمران : ٢٣)

কিতাবের একটা অংশমাত্র তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ (المائدة : ١٣)

যা দিয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার একটা অংশ তারা ভুলে গেছে।

আর তারাঃ

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ -

বাক্যসমূহের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে তাকে সরিয়ে বিকৃত করে।

ফলে আহলি কিতাব লোকেরা তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহ অন্য কোথাও-ই পেতে পারে না, তার মূল ও যথার্থ শিক্ষা পেতে পারে কুরআন মজীদে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এই সর্বশেষ কিতাবখানিকে পূর্বে নাযিল করা সব কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী ও সে সবের সংরক্ষক আমানতদার বানিয়ে নাযিল করেছেন।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নাযিল-করা সব কিতাবের তুলনায় কুরআন-ই হচ্ছে সব জিনিসের تبيان 'স্পষ্ট বিশ্লেষণ, বর্ণনা।' সকল প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্তিত মৌলনীতি ও আদর্শকে কুরআনই রক্ষা করেছে। পক্ষান্তরে যে সব খুঁটিনাটি বতিলযোগ্য কিংবা পরিবর্তন-সাপেক্ষ, কুরআন সেগুলিকে মনসুখ্ করে। পরিবর্তনশীল কালের অগ্রগতির ও পূর্ণত্ব প্রাপ্তির দিকের বিবর্তনে যা কিছু সামঞ্জস্যহীন, কুরআন সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে যা কিছু শোভন ও সাযুজ্যপূর্ণ, তা-ই গ্রহণ করেছে। কুরআনেই আল্লাহ্র এই ঘোষণা রয়েছেঃ

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ - (الاسراء : ٩)

নিশ্চয়ই এই কুরআন সর্বাধিক সরল-সোজা-ঋজু-সুদৃঢ় পথ প্রদর্শণ করে।

বলেছেনঃ

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا - (البقرة : ١٠٦)

আমরা কোন আয়াত মনসুখ বা নাকচ করে দিলে তদস্থলে তার চাইতে অধিক ভালো কিংবা তারই মত আয়াত নিয়ে আসি।

উপরের আয়াতের وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 'এবং তার সংরক্ষক-আমানতদার' বাক্যাংশ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ 'কিতাবের যা কিছু সমুখে রয়েছে তার সত্যতা ঘোষণাকারী' বাক্যের পূর্ণতাদানকারী মাত্র। অর্থাৎ পূর্বের যা কিছু বর্তমান তার সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে, তাকে স্পষ্ট করে। তাওরাত ও ইনজীল পূর্ববর্তী এসব কিতাব যে সব বিধিবিধান পেশ করেছে-যে শরীয়াত উপস্থাপন করেছে, কুরআন সেগুলির সত্যতা ও যথার্থতার সাক্ষ্য দেয়; প্রমাণ করে যে, সে সমস্ত আল্লাহ্র নিকট থেকে আসা সত্য শরীয়াত। কুরআন সেগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে তদনুযায়ী আমল

করার কথা কিন্তু বলেনা। সেগুলি বাতিল হয়ে গেছে, যদিও সে সব যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছিল, তখনকার প্রেক্ষিতে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বপর্যন্ত তা একান্তই সত্য বিধান ছিল; কিন্তু কুরআন নাযিল হওয়ার পর সেগুলির বাস্তবতা ও ব্যবহারোপযোগিতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। উপরোদ্ধৃত দীর্ঘ আয়াতের শেষ বাক্যাংশ এই কথাই বলছেঃ 'আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে 'এক অভিন্ন উম্মাত' বানিয়ে দিতেন। কিন্তু এক অভিন্ন উম্মাত বানাননি এজন্য যে,তিনি তোমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়াত ও কর্মপথ দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান।[১]

নবুয়্যাত খতম পর্যায়ে কুরআনী ইঙ্গিতঃ

এতদ্ব্যতীত কুরআন মজীদে এমন বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে যা রাসূলে করীম (স)–এর নবুয়্যাত ও রিসালাতের সর্বশেষ নবুয়্যাত ও রিসালাত হওয়ার দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। তা থেকে একথাও নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, কুরআন মজীদই আল্লাহ্‌র নাযিল করা সর্বশেষ কিতাব, অতঃপর আর কোন কিতাব নাযিল হওয়ার অবকাশ নেই, প্রয়োজন–ও নেই, তার সম্ভাবনাও নেই। অবশ্য সে ইঙ্গিত বুঝার জন্য যথেষ্ট সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও চিন্তা–গবেষণা অপরিহার্য। এ ধরনের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ - وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - (الانعام: ١١٤-١١٥)

অবস্থা যখন এই তখন আমি কি আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ফয়াসালাকারী তালাশ করব? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিতভাবে তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। আর যে সব লোককে (তোমাদের পূর্বে) কিতাব দিয়েছিলাম, তারা জানে যে, এই কিতাব তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পূর্ণ সত্যতা সহকারে নাযিল হয়েছে। অতএব তুমি কোনক্রমেই সন্দেহকারীদের মধ্যে শামিল হবে না। সত্যতা ও ন্যায়পরতার দিক দিয়ে তোমার রব্ব–এর বাণী পূর্ণত্ব লাভ করেছে। তাঁর এই বাণীসমূহ পরিবর্তন করতে পারে এমন কেউ–ই নেই। কেননা আল্লাহ্‌ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

---

১. تفسير الميزان ج ٥ ص ٣٧٨-٣٧٩

'তোমার রব্-এর বাণী পূর্ণত্ব লাভ করেছে সত্যতা ও ন্যায়পরতার দিক দিয়ে। তাঁর আইন বিধানসমূহ পরিবর্তন করতে পারে এমন কেউ নেই' আয়াতাংশ প্রমাণ করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওহীর দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে, ওহীর সূত্র চিরদিনের তরে ছিন্ন হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত সে দ্বার উন্মুক্ত হবেনা, সে সূত্র পুনরায় চালু হবে না। আল্লাহ্র নিকট থেকে নাযিল হওয়া শরীয়াতসমূহ আল্লাহ্র বিভিন্ন নবী-রাসূলের নিকট পৌছেছে। কিন্তু সেই সবের নাযিল হওয়া স্তব্ধ হয়ে গেছে কুরআনের কালাম নাযিল হয়ে যাওয়ার পর এবং সাথে সাথেই। এ আয়াতে ব্যবহৃত 'কালেমা' শব্দটি চূড়ান্ত কালাম, চূড়ান্ত ফয়সালা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কুরআন মজীদে। অর্থাৎ আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফয়সালা হিসাবেই কুরআনের বিধান নাযিল হয়েছে। আর কোন-কিছু সম্পর্কে 'চূড়ান্ত ফয়সালা' হয়ে যাওয়ার পর কিছুই যে বলার থাকেনা কারো, তা অনস্বীকার্য।

আয়াতের 'কালেমা' শব্দটি দ্বারা ইসলামী দাওয়াত কিংবা কুরআন মজীদকে বুঝান হয়েছে। তাতে শরীয়াতের যে হুকুম আহকাম ও বিধান রয়েছে, তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত। পূর্বের কিতাবপ্রাপ্ত ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা যদি খালেস দিলে বিবেচনা করে, তা হলে তারা অবশ্যই স্বীকার করবে যে, কুরআন তাওরাত ও ইনজীল-এর মতই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তা নাযিল হয়েছে পরম সত্যতা সহকারে। কাজেই তা যে সমগ্র মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বমানবতার হেদায়েতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এই কুরআন-ই যে, সর্বতোভাবে যথেষ্ট—তা-ই যে চূড়ান্ত হিদায়েতের কিতাব, তা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষই অস্বীকার করতে পারে না।

উপরিউক্ত আয়াতে আরও বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দ্বীনী ও তাওহীদী দাওয়াতের আত্মপ্রকাশ লাভের পর এবং সমগ্র কিতাবের সংরক্ষক-আমানতদার হিসাবে কুরআনের নাযিল হওয়ার পর—অন্যান্য সব কিতাবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বসার পর আর নতুন কোন নবীর দাওয়াতের কোন অবকাশ থাকতে পারে না, অবকাশ থাকতে পারে না নতুন কোন কিতাব নাযিল হওয়ার। অতীত কালের এক কিতাবের পর অপর কিতাবের নাযিল হওয়া—এক শরীয়াতের পর নতুন এক শরীয়াতের আসার ধারাবাহিকতা এই কুরআন দ্বারাই ছিন্ন হয়ে গেছে।

আর কুরআন যে আল্লাহ্র কালেমা—তাওহীদী দাওয়াত নিয়ে এসেছে, তা পরম সত্য; মিথ্যা তাতে বিন্দু মাত্রও অনুপ্রবেশ করতে পারে না। কুরআন যে হুকুম-আহ্কাম—আইন-বিধান নিয়ে এসেছে, তা-ই হচ্ছে চূড়ান্তভাবে ন্যায়পরতাসম্পন্ন। একবিন্দু 'জুলুম' তাকে স্পর্শও করতে পারে না। আর সে বিধানের এই পূর্ণত্বের কারণেই তার বাক্যসমূহ বা তার উপস্থাপিত আইন-বিধানসমূহ অতঃপর পরিবর্তিতও হতে পারে না।

কতিপয় সন্দেহ এবং তার জবাব

কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে ও আলোকে উপরের দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর নবুয়্যাত ও রিসালাতই সর্বশেষ নবুয়্যাত ও রিসালাত। অতঃপর এই উভয়ের দ্বার চিরদিনের তরে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু বাতিলপন্থীরা এপর্যায়ে নানা সন্দেহ সৃষ্টি করে চলেছে। এপর্যন্ত বাহায়ী ও কাদিয়ানীদের সৃষ্ট সন্দেহই মুসলিম সমাজে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। তাই তাদের সৃষ্ট আরও কতিপয় সন্দেহের উল্লেখ ও তার জবাব দান করা জরুরী বলে মনে হচ্ছে।

প্রথম সন্দেহ

কুরআন মজীদের সূরা আল–আরাফ–এর আয়াত হচ্ছেঃ

يَابَنِيْ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ (الاعراف : ٣٥)

হে আদম বংশধররা, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকেই এমন রাসূলগণ আসবে যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করবে। অতঃপর যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে ও নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই, নেই দুশ্চিন্তার কোন কারণ।

এ আয়াতটি কুরআনের এবং তা হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর কল্‌বে নাযিল হয়েছিল। তা বলছে যে, ইসলামের নবীর পর–ও রাসূল আসতে থাকবেন। يَاْتِيَنَّكُمْ আসবে ও আসছে—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কালকেই বুঝায়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে—রাসূলে করীমের পরও আসবেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে, নবুয়্যাতের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়নি। হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর পরও তা উন্মুক্ত, অবারিত। তাহলে হযরত মুহাম্মাদ (স)কে নবুয়্যাত সমাপ্তকারী—নবীগণের সর্বশেষ এবং তাঁর উপর নাযিল হওয়া কিতাব সর্বশেষ কিতাব কি করে দাবি করা যায়?— কুরআন নিজেই এই দাবির বিপরীত কথা বলছে?

জবাব

সন্দেহের উক্ত কথাটি যেমন হাস্যকর, তেমনি নিতান্তই ভিত্তিহীন। কেবল এই

আয়াতটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতসমূহের প্রতি নজর না দিয়েই এবং সে সবের বক্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করেই উক্ত সন্দেহকে গড়া হয়েছে। আর তদ্বারা দুনিয়াবাসীকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে।

কেননা উদ্ধৃত আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াতটির উপর দৃষ্টিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট হয় যে, উক্ত আয়াতে কুরআন নাযিল হওয়ার কালকে কেন্দ্র করে কথাটি বলা হয়নি। বরং এই কথাটি বলা হয়েছে প্রথম সৃষ্টি কালে, যখন আদমকে সর্বপ্রথম মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। আর সেই সময় থেকেই যে নবী–রাসূলগণ মানব সমাজে এসেছেন তাতো সত্য কথা। ফলে কুরআনের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতটি হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি কুরআন নাযিল হওয়া কাল পর্যায়ে বলা হয়েছিল এবং তাঁর পরও নবী–রাসূল আসবেন, তা কি করে প্রমাণিত হলো?

বিশেষ করে উদ্ধৃত আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আরও তিনটি সম্বোধন এসেছে। সব কয়টি সম্বোধনই يَا بَنِيْ آدَمَ 'হে আদম বংশধরগণ' বলে করা হয়েছে। ২৬ নম্বর আয়াতে মানুষের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। ২৭ নম্বর আয়াতে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণার উল্লেখ করে মানব বংশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আর ৩১ নম্বর আয়াতে প্রত্যেক নামাযে জরুরী পোশাক গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।—এই মোট চারটি সম্বোধনের প্রত্যেকটি কথা–ই সেই প্রাথমিক কালের, যখন আদম দুনিয়ায় বসবাস শুরু করেছিলেন এবং তাঁর বংশে মানুষের বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল। এই কথা বিবেচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে,এর কোন একটি কথাও হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর সময়ে নতুন করে বলা কথা নয়। এ দুনিয়ায় মানুষের প্রথম বসতি শুরু হওয়ার পরই সম্পূর্ণ নবতর হিদায়েত হিসাবে এই কথাগুলি বলা হয়েছিল। কুরআনে সেইগুলির উল্লেখ হয়েছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে। ফলে এই কথা দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর 'খাতামান্নাবীয়ীন' হওয়াকে কখনই মিথ্যা প্রমাণ করা যেতে পারে না। কেননা এ আয়াত–সমূহে হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর পর রাসূল আগমনের কথা আদপেই বলা হয়নি, বলা হয়েছে হযরত আদম (আ)–এর পর নবী–রাসূলগণের আগমনের কথা।

অন্য দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেও উক্ত কথার সত্যতা বুঝা যায় আয়াতের إِمَّا শব্দটি إِنْ ও مَا সংযুক্ত। إِنْ শব্দটি সংশয় উদ্রেককারী এবং তারপর যা উল্লেখিত হয়েছে তার প্রতিবাদকারী। অবশ্য إِذَا শব্দটি দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা বুঝায়। উক্ত আয়াতে রাসূলগণের আগমন সম্পর্কে যদি নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা সহকারে খবর দেওয়াই উদ্দেশ্য হত তাহলে তা নিশ্চয়ই এমন শব্দ প্রয়োগে বলা আবশ্যক ছিল যাতে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা বুঝায়। কেননা নবী রাসূলগণের আগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট ব্যাপার। সে বিষয়ে সংশয়পূর্ণ শব্দ দ্বারা কোন কথা বলা ঠিক নয়। তবে অন্যত্র

যদি বাধ্যবাধকতা বুঝানোর মত কোন আয়াত উদ্ধৃত হয়ে থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন সূরা সাবা'র এ আয়াতটিতে বলা হয়েছেঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عَالِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ۔ (سبا: ٣)

অবিশ্বাসীরা বলেঃ ব্যাপার কি, আমাদের উপর কিয়ামত আসছে না কেন? বলঃ আমার গায়েব–জানা পরোয়ার–দিগারের শপথ, তা তোমাদের উপর অবশ্যই আসবে। এক অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর নিকট থেকে লুক্কায়িত থাকতে পারে না–।

সূরা আন্–নাম্‌ল–এর আয়াতঃ

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ۔ (النمل: ٣٧)

(হে দূত!) যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের নিকট ফিরে যাও, আমরা তাদের উপর এমন সৈন্য বহিনী নিয়ে এসে পৌছাব, যার মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

মোটকথা, যে আয়াতটি দিয়ে খতমে নবুয়্যাতের ব্যাপারটিকে সংশয়পূর্ণ বানাবার চেষ্টা করা হয়েছে, তার সারমর্ম হচ্ছে, কল্যাণ ও হিদায়েত লাভ কেবল তার পক্ষেই সম্ভব যে তার নবীর হিদায়েতকে অনুসরণ করবে এবং রাসূল বৈষয়িক জীবন ও পরকাল পর্যায়ে যে জীবন–পথ নির্ধারিত করে দিয়েছেন,তার বাইরে এক কদমও রাখবেনা। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূল আগমনের ধারাবাহিকতা শুরু হবে, সে কথা বলা এ আয়াতটির আদৌ উদ্দেশ্য নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ আয়াতদ্বয়ের উল্লেখ করা যায়ঃ

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۔ نِ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۔ (الاحزاب، ٣٨-٣٩)

নবীর এমন কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যা আল্লাহ্ তার জন্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যে সব নবী অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র এই সুন্নাত চলে এসেছে। আর আল্লাহ্র হুকুম একটা অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালা বিশেষ হয়ে থাকে। (আল্লাহ্র এ সুন্নাত তাদের জন্য) যারা আল্লাহ্র পয়গামসমূহ পৌছায় ও তাঁকেই ভয় পায় এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকেই ভয় করেনা। বস্তুতঃ হিসাব নেয়ার জন্য আল্লাহ্ একাই যথেষ্ট।

এ আয়াতে 'যারা পৌছায়' কথাটি এমন শব্দে বলা হয়েছে যা সাধারণতঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় কাল–ই বুঝায়। কিন্তু এ আয়াতে এ দুটি কালের কোন একটিকেও বুঝায় না। কেননা উক্ত কথাটি 'যারা অতীত হয়ে গেছে' তাদের পরিচিতি স্বরূপ বলা হয়েছে। যদি কোন বিশেষ কাল বুঝানোই উদ্দেশ্য হত তাহলে বলা হতঃ 'যারা আল্লাহ্র রিসালাত পৌছিয়েছে।' তাতে পরিচিত এবং যার পরিচয় দেয়া হচ্ছে উভয়ের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্য থাকত। আর উদ্দেশ্য যখন পূর্বে এসে চলে যাওয়া রাসূলগণের শুধু পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালনের কথাটুকু বলা, তখন উক্তরূপ উভয় কাল বুঝানোর উপযোগী শব্দ ব্যবহার করা খুবই সহীহ এবং যথার্থ হয়েছে।

ফল কথা, যে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, কুরআনী কালামের ভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যহীন। অতএব গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় সন্দেহঃ

'বাহায়ী' মতের একটি গোষ্ঠী দাবি করেছে যে, 'রিসালাত' খতম হয়নি, শেষও হয়ে যায়নি, তাদের দলীল হচ্ছে এই দ্বিতীয় আয়াতটি। তারা বলতে চেষ্টা করেছে যে, উক্ত আয়াত ভিন্ন কথা প্রমাণ করে। আয়াতটি এইঃ

رَفِيعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ـ (مؤمن : ١٥)

তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, আরশের মালিক। তাঁর বান্দাহগণের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা করেন নিজের নির্দেশে 'রূহ' নাযিল করে দেন, যেন সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

এ আয়াতে يُلْقِى الرُّوْحَ · 'রূহ নাযিল করেন' কথাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল বুঝায়। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'রূহ' অর্থাৎ 'ওহী' নাযিল করার কাজ যা বর্তমানে চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। আর তার অর্থ, রিসালাত খতম হয়ে যায়নি। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্য থেকেও যার প্রতি আল্লাহ্র ইচ্ছা হবে তিনি ওহী নাযিল করবেন।

জবাব

উক্ত সন্দেহের ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য দুটি বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রথমেই দেয়া প্রয়োজনঃ

১. 'রূহ' শব্দের বহ্যিক অর্থ 'ওহী' তাতে সন্দেহ নেই। এ অর্থটি পরোক্ষ। তা এই জন্য যে, 'রূহ' দ্বারা দেহ জীবন্ত হয় যেমন, তেমনি 'ওহী' দ্বারা মানুষের দিল জীবন লাভ করে, মানব সমাজ সজীব হয়ে উঠে। কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও 'রূহ' শব্দটি 'ওহী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ (الشورى : ٥٢)

এমনিভাবেই আমরা তোমার প্রতি 'ওহী' পাঠিয়েছি আমার হুকুমে। তুমি তো জানতেই না কিতাব কি, ঈমান কি। কিন্তু আমরা তাকে নূর বানিয়েছি, তদ্বারা আমাদের বান্দাহগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দেই।

এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআনে যে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কথা বলা হয়েছে, তা প্রকৃত 'ওহী' সম্পর্কেই ছিল। তাই আল্লাহ্ বলেছেনঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۚ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا - (الاسراء : ٨٥)

তোমার নিকট লোকেরা 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও,'রূহ' হচ্ছে সম্পূর্ণতঃ ও একান্তভাবে আমার রব্-এর ব্যাপার। আর তোমাদেরকে খুব সামান্যই ইল্‌ম দেয়া হয়েছে।

২. يَوْمَ التَّلَاقِ সাক্ষাতের দিন। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত হওয়ার দিন। এই দিন বান্দাহ ও মা'বুদের সাক্ষাত ঘটবে। পরবর্তী আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছেঃ

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (مؤمن : ١٦)

সেই দিন যখন সকল মানুষ আবরণশূন্য হবে, আল্লাহ্র নিকট তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। সেই দিন সকলকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ আজকের বাদশাহী—

নিরংকুশ কর্তৃত্ব—কার? সমগ্র সৃষ্টিলোক জবাবে বলে উঠবে, একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র।

لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ 'সাক্ষাতের দিনে যেন সতর্ক ও ভীত করতে পারে' অর্থাৎ সেই দিন যেন আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাহগণের মধ্যে ফয়সালা করতে পারেন। তখন জালিমের বিচার হবে মজলুমের পক্ষ থেকে। নেক আমলকারী ও বদ আমলকারী কর্মফল পাবে। অথবা আল্লাহ্‌ যেন তাঁর বান্দাহগণকে সেই দিনের আযাবের ব্যাপারে সতর্ক ও ভীত করতে পারেন।

এ দু'টি বিষয়ে অবহিতি লাভের পর সৃষ্ট সন্দেহের অপনোদন সহজেই হতে পারে। প্রথম সন্দেহের জবাবে আমাদের বলা কথার আলোকে এই দ্বিতীয় সন্দেহের জবাবে বলা যায়, ওখানে যেমন ক্রিয়া পদগুলি কোন কাল বুঝায় না, এখানেও তেমনি সতর্ককরণের কোন কাল বুঝায় না। এখানে শুধু কাজ হবে, এটুকু বলাই উদ্দেশ্যঃ জানিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, তিনি এই গুণে গুনান্বিত। কিন্তু তিনি তা কখন করবেন, অতীতে না বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে, সে বিষয়ে কোন ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যই নেই এই বক্তব্যে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ এই কাজ করার নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর এই কর্তৃত্বের কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তাঁর ইচ্ছায়ও কেউ বাঁধাদানকারী নেই। 'ওহী'র ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন, আয়ত্তাধীন। তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে কেউ আপত্তি করতে পারে না, প্রশ্ন তুলতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিশেষ ও স্থায়ী গুণ বা ক্ষমতার উল্লেখই শুধু করা হয়েছে।

কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাওয়া হয়েছে, তা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, কুরআন-ভিত্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারাই তার বাতুলতা প্রমাণ করা হলো। কিন্তু কেবল কুরআনই নয়, রাসূলে করীম (স)-এর স্পষ্ট প্রমাণিত হাদীস, চৌদ্দশ' বছরের মুসলিম উম্মাতের ঐকমত্য (إجماع) ও এব্যাপারে রীতিমত সোচ্চার। সকল প্রকারের দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই দুনিয়ার মানুষের প্রতি সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পর এ দুনিয়ায় না কোন নবী আসবে, না কোন রাসূল এবং না নাযিল হবে আল্লাহ্‌র নতুন কোন কিতাব।

তৃতীয় সন্দেহ

সূরা ইউনুস-এর আয়াতঃ

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ـ

(يونس : ٤٧)

প্রত্যেক উম্মাত–জনসমষ্টির জন্য একজন রাসূল রয়েছে। তাদের রাসূল যখন তাদের নিকট এসে যায়, তখন তাদের মধ্যে পূর্ণ ন্যায়পরতা সহকারে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হয় এবং তাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হয়না।

এই সূরার–ই অপর একটি আয়াতঃ

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۔ (يونس: ٤٩)

বল হে নবী। আমি আমার নিজের জন্য না ক্ষতি করতে সক্ষম না কোন উপকার করতে। তবে আল্লাহ্ যা চান। প্রত্যেক উম্মাতের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের সেই মেয়াদ শেষ হয়ে আসবে, তখন এক মূহূর্ত না বিলম্ব করা হবে, না সেই নির্দিষ্ট মূহূর্তের পূর্বে কিছু করা হবে।

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মাতসমূহের জীবনের জন্য সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাতও তারই অন্তর্ভুক্ত। তার জন্যও জীবনের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট রয়েছে। তাহলে মুসলিম উম্মাত কি করে দাবি করতে পারে তারা ও তাদের দ্বীন চিরন্তন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা স্থায়ী ও অক্ষয় হয়ে থাকবে? হাদীসেও তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। রাসূলে করীম (স)–এর নিকট ইসলামী উম্মাতের জীবন–মেয়াদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ

اِنْ صَلُحَتْ اُمَّتِىْ فَلَهَا يَوْمٌ وَّاِنْ فَسَدَتْ فَلَهَا نِصْفُ يَوْمٍ ۔

আমার উম্মাত যদি নেককার হয়, তাহলে তার জীবন–মেয়াদ পূর্ণ একদিন। আর যদি তারা খারাপ হয়, তাহলে অর্ধেক দিন।

জবাব

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের ভিত্তিতে সন্দেহ সৃষ্টিকারীরা বাস্তবিকই কি বলতে চেয়েছে, তা স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। প্রথম আয়াতটি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আল্লাহ্ রাসূল পাঠিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হযরত নূহ্, মূসা ও ঈসা (আ) প্রত্যেকেরই উম্মাত ছিল এবং তাঁরা তাদেরকে

পরম সত্য দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, সিরাতুল মুস্তাকীম-এর দিকে তাদেরকে হিদায়েত করেছেন। তবে রাসূলের মেয়াদ সম্পর্কে আয়াতে কোন কথা-ই বলা হয়নি, সেদিকে ইঙ্গিত মাত্রও করা হয়নি। এ রাসূলগণের রিসালাতকে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়নি। আর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 'খাতামার রাসূল' না হওয়ার কথাও তাতে বলা হয়নি। উক্ত আয়াতের বক্তব্য অন্যান্য আয়াতেও বলা হয়েছে। যেমনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ (النحل: ٣٦)

এবং নিঃসন্দেহে আমরা প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই দাওয়াত প্রদানের দায়িত্বসহ যে, হে মানুষ! তোমরা এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল কর এবং আল্লাহ্‌দ্রোহী—খোদা হয়ে বসা ব্যক্তি ও শক্তিগুলিকে পরিহার কর। অতঃপর (লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে) তাদের কিছু লোককে আল্লাহ্ হিদায়েত দিয়েছেন আর কিছু লোকের উপর গুমরাহী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামের পর শরীয়াতকে সীমাবদ্ধ করার দিকে আয়াতটি ইঙ্গিত করে, এমন কোন কথা জানা যায় কি? তা পাওয়া যায় না, যাবেও না।

আর দ্বিতীয় আয়াতটি সত্য জীবনকে উদঘাটিত করে। তবে 'উম্মাত' শব্দটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেশণ আবশ্যক। কুরআন-হাদীসে এশব্দটির ব্যাপক উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ 'প্রত্যেকটি জনসমষ্টিই উম্মাত তাদের যা-ই একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করুক না কেন। তাদেরকে একত্রিত করার জিনিস দ্বীন হতে পারে, একটি স্থান বা ঘর হতে পারে, একটা 'সময়'ও হতে পারে। এই একত্রকারী জিনিস ইচ্ছামূলকও হতে পারে,হতে পারে বাধ্যতামূলকও।[১]

ইমাম রাগেবের এই ব্যাখ্যা থেকে যা জানা গেল, তা কুরআন ও হাদীস এবং তাতে এ শব্দের ব্যবহার থেকে বাহ্যিকভাবেও জানা যায়। ইমাম রাগেরের ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়ঃ

দ্বীন একত্রকারী হওয়ার দরুণই কুরআনে বলা হয়েছেঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (البقرة: ١٢٨)

---

১. مفردات امام راغب وصفهانى ص: ٢٣- مادة "ام"

হে আমাদের রব্! আমাদের দু'জনকে তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর থেকে বানাও তোমার অনুগত এক জনসমষ্টি।

এ আয়াতেও ঠিক সেই দৃষ্টিতেই 'উম্মাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ(ال عمران ـ ١١٠)

তোমরাই হচ্ছ সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে সর্বসাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর (বিরত রাখ)।

কাল একত্রকারী হওয়ার দরুণ বলা হয়েছেঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ـ(الاعراف ٣٤)

প্রত্যেকটি এককালের জনসমষ্টির জন্য একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে আসবে অতঃপর এক মূহূর্তও বিলম্বও করা হবে না, নির্দিষ্ট সময়ের আগেও তা শেষ করা হবেনা।

তাফসীরকারগণ এর তাফসীরে বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করেছেন بعد حين অর্থাৎ সমসাময়িক কালের লোকদের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর। এই লোকদেরকে একত্রিত করেছে একটি সময় বা কাল। অর্থাৎ এক সময়ে বেঁচে থাকা লোকগুলিও একটি 'উম্মাত'। যেমনঃ

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ـ (هود : ٨)

আর আমরা যদি তাদের আযাবকে এক বিশেষ সময়–কাল পর্যন্ত বিলম্বিত করি, তাহলে তারা বলতে শুরু করে যে, কোন্ জিনিস তা আটকিয়ে রেখেছে? – শোন, যেদিন সে শাস্তির সময় এসে পৌছবে, তখন তা কেউ ফেরাতে চাইলেও ফিরানো সম্ভব হবেনা। আর যে জিনিস নিয়ে তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করছে, তা–ই তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

আল্লামা জামাখশারী বলেছেনঃ 'এই লোকেরা এক সময়ের জনসমষ্টি'। স্থানও একত্রকারী বলে বলা হয়েছেঃ

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ـ (القصص ٢٣)

যখন সে মাদইয়ানের পানির কূপের নিকট পৌছল, তখন সে দেখতে পেল, বহু সংখ্যক লোক নিজেদের জন্তুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে।

অর্থাৎ কূপের নিকট একদল মানুষকে সমবেত দেখতে পেল, তারা তাদের জন্তুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে। একটি স্থানে লোকরা একত্রিত হওয়ার দরুণ তারা 'উম্মাত' শব্দে অভিহিত হয়েছে।

জাতীয়তার ভাবধারাও মানুষকে একত্রিত করে। এই একত্রিত হওয়ার মূলে থাকে জাতীয়তার সম্পর্ক। যেমনঃ

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ـ (الاعراف ١٦٠)

এবং আমরা এই জাতিকে বারোটি পরিবারে বিভক্ত করে তাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে ছিলাম।

এই পর্যায়ের আর একটি আয়াত হচ্ছেঃ

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ (الاعراف ١٦٨)

এবং আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় খন্ড খন্ড করে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক নেক্‌কার সদাচারী ছিল। আর কিছু লোক তা থেকে নিম্নতর (ভিন্নতর)।

বস্তুতঃ বনী ইসরাঈলের সকল বংশ একই বৃক্ষের শাখা–প্রশাখা। এই সকলকে একত্রিত করে শুধু বংশীয় জাতীয়তার সম্পর্ক। তবে বৃক্ষের প্রবৃদ্ধি যতই বেশী হবে তার শাখা ও প্রশাখাও তত বেশী হবে, এটাই স্বাভাবিক। তখন প্রত্যেকটি শাখা তার প্রশাখাসমূহ সহকারে গণ্য হবে। এই সব শাখা ও প্রশাখা সেই একই বৃক্ষের সাথে সম্পর্কিত। বনী ইসরাঈলের শাখা–প্রখাশাসমূহও সেই এক ও অভিন্ন মূলের সাথে সম্পর্কিত এবং তার ভিত্তি হচ্ছে বংশীয় জাতীয়তা।

কুরআনে 'উম্মাত' শব্দের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার

কুরআনে 'উম্মাত' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি এক একক ব্যক্তিকেও 'উম্মাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তা হয় তখন, যখন সেই এক ব্যক্তিই বিরাট মর্যাদা ও সম্ভ্রমের অধিকারী হয়। তখন এক ব্যক্তিই একটি 'দল' হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বলা হয়েছেঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا (النحل : ١٢٠)

ইবরাহীম আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত সর্বদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌মুখী হওয়া উম্মাত ছিল।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তাওহীদী ইবাদতে সেই একজনই একটি জনসমষ্টির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। যেমন বলা হয়ঃ অমুক এক ব্যক্তিই একটা গোত্র বা এক ব্যক্তিই একটি দল সমতুল্য ইত্যাদি ——।

কুরআনে 'উম্মাত' শব্দের ব্যবহার মানব সমাজকে ছাড়িয়ে পশুকুল বা প্রাণীকুল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীসমষ্টিকেও উম্মাত বলা হয়েছে। যেমন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ (الانعام، ٣٨)

পৃথিবীতে কোন প্রাণী বা দুই ডানায় ভর দিযে উড্ডীয়মান কোন পাখী—যারাই রয়েছে তারাও তোমাদেরই মত উম্মাত।

এ আয়াতে সকল প্রাণীগোষ্ঠী ও পাখীকূলকেও উম্মাত বলা হয়েছে। কেননা এগুলির মধ্যে সৃষ্টি ও স্বভাবের দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। প্রত্যেক প্রজাতির বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও ওরা মাকড়সার মত জাল বোনে, চোরের মত সুড়ংগ খোদে, পিপিলিকার ন্যায় খাদ্য জমা করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহীত খাদ্যের উপর নির্ভরশীল হয়, যেমন চড়ুই পাখী ও কবুতর।[১]

বলা যেতে পারে, 'উম্মাত' শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার প্রমাণ করেনা যে তার অর্থও বুঝি বিভিন্ন। আসলে সকল ব্যবহারেরই মূল তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। আর তা হচ্ছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী–জীবের একতাবদ্ধ হওয়া; স্থান বা কাল বা স্বভাব–প্রকৃতি কিংবা দ্বীন ও জাতীয়তা– যে কোন একটি তাদেরকে একত্রিত করে।

---

১. مفردات امام راغب ص ٢٣

উম্মাত—পথ ও জীবন বিধান বা দ্বীন

'উম্মাত' শব্দের আরও একটি অর্থ রয়েছে এবং সে অর্থে শব্দটি কুরআন ও সুন্নাতে ব্যবহৃতও হয়েছে। আর তা হচ্ছে—পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, নিয়ম বা দ্বীন। যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ۔ (الزخرف، ٢٣)

আমরা আমাদের পূর্ব–পুরুষদের একটি ব্যবস্থার অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে হিদায়েতপ্রাপ্ত হব।

আল্লামা জাওহারী বলেছেনঃ 'উম্মাত' অর্থ পন্থা, ব্যবস্থা ও দ্বীন। যেমন বলা হয়ঃ لَا أُمَّةَ لَهُ 'তার কোন দ্বীন বা আদর্শ নেই'।

ফীরোজাবাদী বলেছেন, اَلْأُمَّةُ অর্থ অবস্থা, পন্থা, নিয়ম বা দ্বীন। এছাড়াও শব্দটির আরও কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

এই শব্দগত বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য আয়াতের 'উম্মাত' শব্দটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছেঃ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ 'প্রত্যেক উম্মাতের জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে।' এই উম্মাত শব্দের অর্থ পন্থা বা সমষ্টি উভয়ই হতে পারে। কিন্তু فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ 'যখন তাদের মিয়াদ শেষ হয়ে আসবে' এ আয়াতে 'পন্থা বা দ্বীন' অর্থ গ্রহণ করা যায়না। কাজেই তার দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করতে হবে। আর তা হচ্ছে দল, সমষ্টি ইত্যাদী। জীবনের যে কোন জিনিস তাদেরকে একতাবদ্ধ করুক না কেন। তাৎপর্য হচ্ছে, যে কোন মানব সমষ্টির জীবন–গ্রন্থ যখন বন্ধ করা হবে এবং তাদের জীবনের আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়ে আসবে, তখন তাদেরকে একবিন্দু অবকাশ দেয়া হবেনা। এক মূহূর্ত আগেও না, পরেও না। মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের জান কবজ করবে।

আয়াতটিতে মুলতঃ একটি প্রাকৃতিক আইনের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে, মহান আল্লাহ্ স্বীয় নিয়মে যে আইনটি চালু করেছেন। তাহলো, পৃথিবীর আদিম কাল থেকেই জাতি বা প্রজাতির—সমষ্টির জীবনকে একটি মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এই মেয়াদ শেষে তাকে কোনই অবকাশ দেয়া হবেনা। এ কথায় কোন শরীয়াতকে সময়ের মধ্যে সীমিত করা, অথবা রাসূলগণের আগমন ও কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোন কথাই বলা হয়নি, সেদিকে কোন ইঙ্গিতও নেই।

কোন বিশেষ দ্বীন–ভিত্তিক উম্মাত—একই দ্বীন যাদের একত্রিত করেছে—উম্মাত শব্দ দ্বারা কেবল তাদেরই বোঝানো কোন দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতেই সম্ভব হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, উম্মাত হচ্ছে এমন জনসমষ্টি, যাকে কোন

একটা কিছু একত্র করেছে। একত্রকারী সময়, কাল, স্থান, কর্মব্যস্ততা, শ্রম বা কোন দ্বীন—যা-ই হোক না কেন; অথবা হোক রক্ত বা বংশ সম্পর্ক।

কুরআনে এই শব্দটির ব্যবহার যতভাবেই হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য তা-ই। যেমন—

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ - مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ - (الحجر: ٤-٥)

ইতিপূর্বে আমরা যে জনবসতিকেই ধ্বংস করেছি, তার জন্য কাজের একটা বিশেষ অবকাশ লিখে দেয়া হয়েছিল। কোন জনসমষ্টি না স্বীয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ধ্বংস হতে পারে, না তার পরে ধ্বংস থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ - مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ - (المؤمنون: ٤٢-٤٣)

অতঃপর আমরা অপর জাতিসমূহকে উত্থান দান করলাম। কোন জনসমষ্টিই নিজের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শেষ হয়নি, না তার পরও টিকে থাকতে পেরেছে।

প্রত্যেক জনসমষ্টির একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা, তা যথাসময়ে শেষ হয়ে যাওয়া এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ের পর এক মুহূর্তের তরেও বেঁচে না থাকার কথা অন্যান্য আয়াতেও বলা হয়েছে। যেমনঃ

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ - وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ط وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - (المنافقون: ١٠-١١)

অতঃপর বলবে, হে রব্! তুমি যদি একটা নিকটবর্তী মেয়াদ পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও, তাহলে আমি দ্বীনকে সত্য মেনে নিতাম এবং নেক্কার হয়ে যেতাম। কিন্তু আল্লাহ্ কক্ষণ-ই কোন প্রাণী বা ব্যক্তিকে একটুও অবকাশ দেবেন না যতক্ষণ তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা যা-ই কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণ অবহিত।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ـ (نوح : ۴)

আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দিবেন এবং তোমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্র নির্দিষ্ট-করা সময় যখন আসে তখন আর তা রোধ করা যায় না। তোমরা যদি জানতে, তাহলে কতই না ভালো হত।

কুরআনে اجل শব্দের ব্যবহার

উপরে বর্ণিত কথার সমর্থন পাওয়া যায় এ থেকে যে, কুরআন মজীদে اجل শব্দটি শরীয়াতসমূহের মেয়াদ ও তার শেষ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই শব্দের ব্যবহার খুব একটা ব্যাপক দেখা যায় না। কিছুটা ব্যবহার হয়েছে ঋণ ও লেন-দেনের মেয়াদ বুঝানোর বা চুক্তি রক্ষার জন্য যেমনঃ

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ـ (البقرة : ۲۸۲)

তোমরা যখন পরস্পরে কোন লেন-দেন কর নির্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করে, তখন তা অবশ্যই লিখে রাখবে।

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ـ (البقرة : ۲۳۵)

বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত তখন পর্যন্ত গহ্রণ করবে না, যতক্ষণ না ইদ্দাত পূর্ণ হয়।

দ্রব্যসমূহের স্থিতির যোগ্যতা শেষ হওয়ার কথা বলার জন্যও এই শব্দের ব্যবহার হয়। যেমনঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ـ (الانعام: ۲)

সেই আল্লাহ্ই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদের জন্য জীবনের একটি মেয়াদ ঠিক করে দিয়েছেন, যা তাঁর নিকট নির্দিষ্ট।

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ـ (الرعد : ٢)

সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত রেখেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সদা প্রবাহমান (চলমান-গতিশীল)।

তবে আল্লাহ্‌র এই কথাটিঃ

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتٰبٌ ـ (الرعد:٣٨)

আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন রাসূলই কোন নিদর্শন নিয়ে আসতে পারে না। প্রত্যেক যুগের জন্যই একটি কিতাব রয়েছে।

—এর কয়েকটি দিক রয়েছেঃ

(১) প্রত্যেকটি সময়ের জন্য একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, লিখিত ও সুনির্দিষ্ট। সেই সময়ে তা লিখিত হয়েছে এবং ফরয রূপে ধার্য হয়েছে। অন্য সময়ের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। কেননা ফরযসমূহ অবস্থা ও পরিস্থিতির পার্থক্যের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। অতএব প্রত্যেকটি সময়ের জন্য একটা হুকুম—বিধান লিখিত হয় এবং বান্দাহগণের জন্য তা অবশ্য-পালনীয়—ফরয—করে দেয়া হয়—অবস্থার অনুপাতে যে রকম ফরয করা উচিত বিবেচিত হয়, সেই রকম।

(২) অপর এক তাফসীরের দৃষ্টিতে প্রত্যেক সময়ের জন্য একটি বিশেষ কিতাব রয়েছে। যেমন তাওরাত-এর জন্য একটা সময়, ইনজীলের জন্য একটা সময় এবং অনুরূপভাবে কুরআনের জন্য একটা সময়। তবে পার্থক্য এই যে, সে তাফসীরে 'কিতাব' শব্দটি আসমানী গ্রন্থ অর্থে গ্রহীত হয়েছে আর আমাদের দৃষ্টিতে এই 'কিতাব' অর্থ ফরয, যা নির্দিষ্ট ও অবশ্য-পালনীয় করে ধার্য করা হয়েছে।

(৩) এর অর্থ, প্রত্যেক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য একখানি কিতাব রয়েছে, যা সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব সমল মেয়াদের জন্য এমন কিতাব রয়েছে, যা সেই সময়ে লিখিত হয়েছে।

(৪) আল্লাহ্‌ চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দিয়েছেন এমন প্রত্যেকটি ব্যাপারের জন্য একটি লেখন রয়েছে যা সেই বিষয়ে লিখিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতের দূরবর্তী তাৎপর্য এই শেষ কথাটি। কেননা আল্লাহ্‌ তো বলেছেনঃ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ 'প্রত্যেক মেয়াদের জন্য কিতাব রয়েছে' لِكُلِّ اَمْرٍ كِتَابٌ 'প্রত্যেক ব্যাপারের জন্য কিতাব' বলেননি। আর সর্বপ্রথম যে তাৎপর্যটি বলা হয়েছে,

তা–ই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা লোকেরা নবী করীম (স)–এর নিকট নানা নিদর্শন দেখানোর প্রস্তাব বা আবদার করত। আল্লাহ্ তার জবাবে বলেন যে, প্রত্যেক সময়ের জন্য বিশেষ হুকুম বা বিধান রয়েছে, আল্লাহ্ সেই সময়ের জন্য তা লিখে দিয়েছেন। তা সেই সময়ই কার্যকর হবে, অন্য সময়ে নয়।

উপরে আলোচিত চারটি বিভিন্ন তাৎপর্যের যেটিই গ্রহণ করা হোক, তা থেকে কখনই একথা প্রমাণিত হয় না যে, প্রত্যেকটি দ্বীন–এর জন্য একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে দ্বিতীয় তাৎপর্যের দৃষ্টিতে হয়ত তা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু তা একটা বাধ্যতা মাত্র; মূল অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা প্রত্যেক সময়ের জন্যই যদি একখানি কিতাব আছে বলে মনে করা যায়,তাহলে তাওরাত ও ইনজীল এর জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ মেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের জন্যও নির্দিষ্ট মেয়াদ মেনে নিতে হয়। মেনে নিতে হয়, প্রত্যেকটি শরীয়াত বা দ্বীনের জন্যও একটা মেয়াদ রয়েছে।

আমরা আয়াতটির যে তাফসীর করেছি, তার পরিণতি হচ্ছে, প্রত্যেক সময়ের জন্য একটা বিশেষ হুকুম রয়েছে। এই হুকুম মূল দ্বীন নয়, আসল ও সমগ্র শরীয়াতও নয় তা। তা তার একটা অংশ মাত্র। তবে এতে প্রমাণিত হয় যে, একই শরীয়াতের যে কোন কোন জিনিস মনসূখ হয়েছে এবং তদস্থলে তার চাইতে উত্তম জিনিস শামিল হয়েছে, এ কথা যারা স্বীকার করেন না তাদের কথার প্রতিবাদ হয়ে যায় এই রূপ ব্যাখ্যায়।

আর তৃতীয় ও চতুর্থ তাৎপর্য একথা বলে না যে, প্রত্যেকটি দ্বীনের জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে এবং সেই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বীনের প্রয়োগ ও পালনও শেষ হয়ে যায়। — না, এরূপ কথা আদৌ প্রমাণিত হয় না।

এখানে বলে রাখা দরকার, মূল প্রশ্ন বা সন্দেহের সঙ্গে রাসূলের কথা হিসাবে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তা আসলে কোন হাদীস নয়, রাসূলে করীমের কথাও নয়। তা একটি রচিত মিথ্যা মাত্র।

আর يَوْمٌ শব্দটির অর্থ কেউ কেউ করেছেন এক হাজার বছর। এটাও ঠিক নয়। এটা নিতান্তই আন্দাজ–অনুমানের কথা। তবে কুরআনের আয়াতঃ

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ ـ (الحج: ٤٧)

এবং তোমার রব্–এর নিকট একটি দিন এক হাজার বছর সমান।

একথা যেমন বলা যায়, তেমনি কুরআনেরই আয়াতঃ

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ـ

(المعارج: ٤)

ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্র দিকে উর্ধ্বে গমন করে একটি দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

—এর ভিত্তিতে একদিনে পঞ্চাশ হাজার বছরও মনে করা যায়।

চতুর্থ সন্দেহ

কিছু লোক হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর পর নতুন রিসালাত হওয়ার দাবি প্রমাণের জন্য এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَالْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ

(النور: ٢٥)

সেই দিন আল্লাহ্ তাদেরকে সেই প্রতিদান পুরোপুরি দিবেন, যা তারা পাওয়ার যোগ্য। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং এ সত্য সত্য হিসাবেই প্রকাশ করেন।

আয়াতের يُوَفِّيهِمْ 'পুরোপুরি দিবেন' কথাটি সত্য দ্বীন–এর ইঙ্গিত করে। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনকে ইসলামের পর ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্য থেকে তাঁর যে কোন বান্দাহ্র উপর পূর্ণ করে দিবেন। এই দ্বীন যে দ্বীন–ইসলাম, তা বলা যাবেনা। কেননা তা তো পূর্ণ পরিণত হয়ে গেছে,তার মৌল নীতিসমূহ সম্পূর্ণতা পেয়েছে। বিদায় হজ্জের দিন এই দ্বীনের মৌলিক বিধান ও তার শাখা–প্রশাখা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে এ আয়াতে ঘোষণার ফলেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

(المائدة: ٣)

আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছি এবং সম্পূর্ণ দিয়ে নিঃশেষ করেছি আমার নিয়ামত। আর তোমাদের জন্য দ্বীন–ইসলামকেই পূর্ণাঙ্গ জীবন–বিধান হিসাবে পছন্দ করেছি।

আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে সত্য দ্বীন পুরোপুরি পৌছিয়ে দেয়ার আগাম সংবাদ দিয়েছেন। সে দ্বীন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু। অতএব ইসলামের বাহক রাসূলের পরও রিসালাত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

জবাব

প্রশ্নের কথাগুলি শুনলে বা পড়লে স্পষ্ট মনে হয়, প্রশ্নকারী কুরআন মজীদ সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণাই রাখেনা। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কিছু মাত্র ওয়াকিফহাল নয়। যে কোন তাফসীরেই উক্ত আয়াতের যথার্থ তাৎপর্য পাঠ করা যেত। আল্লামা তাবরিসী তাঁর প্রখ্যাত তাফসীরে উক্ত আয়াতাংশের তরজমা করেছেন এই বলেঃ

يتم الله لهم جزائهم الحق -

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বরহক কর্মফল পূর্ণ করে দিবেন।'[১]

আর আল্লামা জামাখশারী লিখেছেনঃ الحق শব্দটি الدين এর পরিচিতি, অর্থাৎ প্রতিফল। পন্থা বা শরীয়াত তার অর্থ নয়।

তাছাড়া উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ

يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون .(النور: ٢٤)

সেইদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের মুখ, হাত, পা সাক্ষ্য দিবে তারা যা করছিল সেই বিষয়ে।

এ কোন্ দিন সাক্ষ্য দেয়া হবে বলে আল্লাহ্ খবর দিলেন? নিশ্চয়ই এ দুনিয়ায় নয়। তা হবে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আমলের বিচার কালে। অতএব এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা–ও ঠিক সেই দিনই হবে। এ দুনিয়ায় তা হওয়ার কথা আদৌ বলা হয়নি।

আসলে এখানে প্রসঙ্গ হচ্ছে, মানুষের ইজ্জত–হুরমত (মান–সম্ভ্রম) নিয়ে যারা খেলা করে সেই নাফরমান লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্র বিচারের কথা বলা। তাদের জন্য এখানে তিনটি হুকুম ঘোষিত হয়েছেঃ

(১) দুনিয়ায় ও পরকালে তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত হবে।

(২) তাদের অংগ–প্রত্যংগই তাদের অপরাধমূলক কাজকর্মের সাক্ষ্য দিবে এবং

(৩) কিয়ামতের দিন তাদের কর্মফল—অপরাধের শাস্তি —আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিবেন।

---

১. تفسير مجمع البيان ج ٧ ص ١٣٢

এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, এ দুনিয়ায় নতুন কোন রিসালাত–এর কোন অবকাশই নেই।

পঞ্চম সন্দেহ

সূরা আস–সিজদাহ্’র আয়াতঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ - (السجدة : ٥)

আল্লাহ্ উর্ধ্বলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেন এবং এই ব্যবস্থাপনার বিবরণ উর্ধ্বে তাঁর সমীপে এমন একদিন উপস্থিত হয় যার পরিমাণ তোমাদের গুণতির এক হাজার বছর।

এ আয়াতের ভিত্তিতে বলতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, আসমান থেকে পৃথিবীতে শরীয়াত নাযিল করেই আল্লাহ্ তা’আলা সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। আর তার উর্ধ্বগমনের জন্য হাজার বছর পরিমাণের একদিন নির্দিষ্ট করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে চালু শরীয়াত ক্রমাগতভাবে পুরানো হয়ে যায়, জনগণ তা থেকে অনেক দূরে সরে আসে। তখন মানুষের দিল নানা নাফরমানীর কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই আল্লাহ্ তা’আলা আর এক ব্যক্তিকে পাঠান; সে শরীয়াতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করে দেয়। তখন লোকদের দিলের কালিমা দূরীভূত হয়ে যায়। কাজেই কোন শরীয়াতই চিরস্থায়ী হতে পারে না। থাকতে পারে মাত্র একটি দিন, যার পরিমাণ হাজার বছর। অতঃপর নতুন নিয়োজিত ব্যক্তি নতুন শরীয়াত নিয়ে আসবে।

জবাব

এখানে যে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সত্য প্রমাণিত হতে পারে কেবল তখন যখন নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো মেনে নেয়া হবে। অন্যথায় গোটা সন্দেহই সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও ব্যর্থ। কথাগুলো হচ্ছেঃ

১—আয়াতের ·تدبير· শব্দের অর্থ ধরতে হবে ওহী নাযিল করা এবং ওহীর সূত্রে নবীর নিকট শরীয়াত পৌঁছা।

২—আয়াতে ·الامر· ‘ব্যাপারাদি’ বলতে বোঝানো হয়েছে শরীয়াত ও জীবন পন্থা।

৩—উর্ধ্বগমন বলতে রিসালাতের মেয়াদ শেষ হওয়া এবং অতঃপর শরীয়াতের স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা নিঃশেষ হওয়া এবং বিপর্যয় প্রসারের কারণে সে শরীয়াতের পুরানো বা অকেজো হয়ে যাওয়া।

কিন্তু এ তিনটি কথার কোন একটিও সত্য নয়, বরং সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং তা কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। তার দু'টি কারণ স্পষ্টঃ

১· কেননা تدبير অর্থ হচ্ছে কল্যাণের দৃষ্টিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা। আসমান থেকে শরীয়াত নাযিল হওয়ার কথা এখানে কোথায় পাওয়া গেল? বরং تدبير এর অর্থ করা যেতে পারেঃ تفكير فى عاقبة الامور 'সমস্ত ব্যাপারের শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করা।' যেমন অপর আয়াতে ভিন্নরূপে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছেঃ

فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا ۔ (النزعت ۔ ۵)

এবং (আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী) যাবতীয় কাজের ব্যবস্থাপনাকারী।

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ, যারা বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত—

আর

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۔ (محمد ۔ ۲۴)

এই লোকেরা কি কুরআন অনুধাবন করে না? না ওদের দিলের উপর তালা পড়ে গেছে?

আল্লাহ্ বলেছেনঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۔ (ص ۲۹)

কুরআন এমন একখানি কিতাব, যা অতীব বরকতসম্পন্ন, তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি, যেন লোকেরা তার আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা–গবেষণা করে এবং বুদ্ধিমান লোকেরা তা থেকে নসীহত গ্রহণ করে।

এ আলোকে স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, تدبير শব্দের অর্থ 'ওহী নাযিল করা' গ্রহণ করা চরম খামখেয়ালীর তাফসীর ছাড়া আর কিছু নয়। মনগড়াভাবে কুরআনের তাফসীর করার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। এরূপ তাফসীরকারদের জন্যই নবী করীম (স) বলেছেনঃ

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْاٰنَ بِرَاْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ۔

যে লোক নিজ ইচ্ছামত কুরআনের তাফসীর করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আশ্রয় বানিয়ে নেয়।

২. কুরআন মজীদে الامر শব্দটি শরীয়াত কিংবা ফরয—হারাম—মকরূহ—মুস্তাহাব—মুবাহ্ প্রভৃতি আল্লাহ্র হুকুম অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। এ ছাড়া মানুষের বানানো চুক্তি–ওয়াদা ইত্যাদি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। আরবী অভিধান বা শব্দ–ব্যাখ্যার গ্রন্থাবলীতেও এই শব্দটি থেকে শরীয়াত অর্থ গ্রহণ করা হয়নি।

এতদ্ব্যতীত الامر শব্দটির অর্থ 'শরীয়াত পালনে বাধ্য করা' গ্রহণ করাও আয়াতটির পূর্বাপর সম্পর্কের দৃষ্টিতে আযৌক্তিক। সেই প্রেক্ষিতে الامر অর্থ গ্রহণ করতে হবে الامرالتكوينى প্রাকৃতিক বিধান; যা আল্লাহ্ তা'আলার কর্মগত ইচ্ছা ও প্রাকৃতিকভাবে সিদ্ধান্ত—যা বিশ্বলোকে কার্যকর হয়ে আছে—হিসাবে সর্বত্র কার্যকর হয়ে আছে। কেননা সমগ্র বিশ্বলোক যে নিয়ম বিধান দ্বারা চালিত, তা–ই امرتكوينى প্রাকৃতিক বিধান। মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তা চলছে। যেমন আল্লাহ্র এ ঘোষণায় প্রতিভাত হচ্ছেঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۔ (يٰسٓ : ٨٢-٨٣)

তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি হুকুম করবেন যে, হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যাবে। পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব নিবদ্ধ, আর তাঁরই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

এ আলোচনার নির্যাস পর্যায়ে বলা যায়, এখানে তিনটি নিদর্শন রয়েছে। যে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, الامر শব্দটি الامرالتكوينى প্রাকৃতিক জগতে সদা কার্যকর নিয়ম অর্থই বুঝায়ঃ

১—পূর্বেই বলা হয়েছে, تدبير বলতে বুঝায় এমন ইচ্ছা বা সংকল্প, যা সার্বিক কল্যাণ কামনা ও যৌক্তিকতা–বুদ্ধিমত্তা দাবি করে। মহান আল্লাহ্ই আসমান–যমীন সমন্বিত সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাস্তব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। তাঁর এই পরিচালনা সার্বিক কল্যাণ—ইচ্ছার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি স্বীয়

কুদরাতে এই সব কিছু দৃঢ় ও সুকঠিন বাঁধনে বেঁধে দিয়েছেন। সূক্ষাতিসূক্ষ্ম কর্মকুশলতা সহকারে তিনি এগুলির পরিচালনা করেন। এ কারণেই মহাশূন্যে ভাসমান অবয়বসমূহ—সূর্য, চন্দ্র, তারকা, নক্ষত্র ও গ্রহ–উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষে বন্দী হয়ে আছে। এর কোনটাই কোনটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, একটি অপরটির উপর ছিটকে পড়েনা। পৃথিবী গ্রহটিও ধ্বংস হয়ে যায় না। সূর্য সর্বক্ষণ মাথার উপর থেকে তাপ বিকীরণ করে পৃথিবীর অধিবাসীদের উত্তপ্ত করে না, সর্বক্ষণ রাত্রির অন্ধকারও আচ্ছন্ন করে রাখে না সারা পৃথিবীকে। এগুলিই হচ্ছে প্রাকৃতিক আইন বা নিয়ম (الامر التكوينى । Law of Natur)।

২—পূর্ববর্তী আয়াত–ভিত্তিক আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল আসমান–যমীনের সৃষ্টি এবং মহান আল্লাহ্‌র আরশে আসীন হওয়া। সে আয়াতটি হচ্ছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ - (السجدة: ٤)

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ - (يونس: ٣)

আল্লাহ্ তো তিনিই, যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সবকিছু মাত্র ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশ—শক্তিকেন্দ্রে—দৃঢ়ভাবে আসীন হয়েছেন।— তিনি সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা করেন। কোন শাফায়াতকারীই নেই, তবে তাঁর অনুমতি লাভের পর— তিনিই আল্লাহ্, অতএব তাঁরই দাসত্ব স্বীকার কর— তোমরা কি এই নসীহত কবুল করবে না?

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ -

আকাশলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্তকার সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা তিনিই পরিচালনা করেন।

এ দু'টি আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। উভয় আয়াতে الامر। বলতে 'সৃষ্টিকর্ম'ই বুঝান হয়েছে। আল্লাহ্ই আসমান–যমীন ও এ দুয়ের মাঝে অবস্থিত সব কিছুই সময়ের ছয়টি বিশেষ অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিলোককে সৃষ্টি করে—অস্তিত্ব দান করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তারপর তিনি এই সমগ্র

সৃষ্টি লোককে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মৌল শক্তিকেন্দ্রে দৃঢ়তা সহকারে আসীন হয়ে বসেছেন এবং কল্যাণ ও কৌশলের দিক দিয়ে অতীব সুষ্ঠভাবে সৃষ্টিলোকের যাবতীয় ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার যাবতীয় কাজ তাঁরই ইচ্ছা ও মর্জীমত অঞ্জাম পেয়ে থাকে, তিনিই আরশের উপর থেকে হুকুম করেন, সঙ্গে সঙ্গেই সে হুকুম যথাযথভাবে কার্যকর হয়। তাঁর এই কার্যাবলীকেই কুরআনী সৃষ্টি দর্শনে الامر التكوينى। 'প্রাকৃতিক আইন–বিধানের কার্যকরতা' বলা হয়েছে। তিনি 'হও' বলার ইচ্ছার সাথে সাথেই অনতিবিলম্বে হয়ে যায়।

৩—আল্লাহ্‌র এই বিশ্ব–ব্যবস্থা পরিচালনা পর্যায়ে এই দু'টি আয়াতই শুধু নয়, আরও বহু সংখ্যক আয়াত কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত রয়েছে। সবক'টি আয়াত থেকে এই একই তত্ত্ব লাভ করা যায়। যেমনঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ (يونس-٣)

তোমাদের রব্ তো তিনিই যিনি আসমান ও যমীন সময়ের ছয়টি অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি শক্তি– কেন্দ্রের উপর আসীন হয়েছেন, সেখান থেকেই সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন শাফায়াতকারীই নেই।

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ (يونس: ٣١)

বল হে নবী! তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে কে রিযিক দেয় কিংবা কে মালিক শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তির? আর কে জীবন্তকে বের করেন মৃত থেকে, কে মৃতকে বের করেন জীবন্ত থেকে আর কে সমগ্র ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা করেন? —এর জবাবে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ্‌ই সব কিছু করেন।

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۤءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۔ (الرعد : ٢)

তিনি আল্লাহ্–ই, যিনি আকাশমন্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরে নিজের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি স্থায়ী নিয়মের অনুসারী বানিয়ে দিয়েছেন। এই গোটা ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিসই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তকার জন্য চলছে। আর আল্লাহ্–ই এই সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি নিদর্শনসমূহ আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা তোমাদের রব্ব–এর সাথে সাক্ষাতের কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস কর।

এ সব আয়াতের প্রতিটিই ব্যাপারসমূহের উর্ধ্ব গমন ও উত্থিত হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বাক। এ লক্ষ্য ও মর্মের দিক দিয়ে আয়াতসমূহের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

এ পর্যায়ে আরেকটি আয়াত প্রনিধানযোগ্যঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ (الاعراف : ٥٤)

জেনে রাখো! সৃষ্টি এবং ব্যাপারসমূহের নিরংকুশ কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই। মহান বরকতওয়ালা আল্লাহ্ যিনি সারে জাহানের রব্ব।

এ আয়াতেও সৃষ্টি পর্যায়ের কর্ম ও ব্যাপার পরিচালনার কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ ক্ষেত্রে কেবল তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর হয়।

তৃতীয়, ·عروج· উর্ধ্বে গমন ও উত্থান–এর অর্থ শরীয়াতের পুরাতন জ্বরাজীর্ণ বা বাতিল নাকচ হয়ে যাওয়ার অর্থ গ্রহণ সম্পূর্ণ বাতিল কথা। কেননা ·عروج· অর্থ উর্ধ্বে–উচ্চে যাত্রা। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

تَعْرُجُ الْمَلٰۤئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ ۔ (المعارج : ٤)

ফেরেশতা এবং রূহ তাঁর দিকে উত্থান লাভ করে।

এ থেকে শরীয়াতের মেয়াদ নিঃশেষ হওয়া ও তার পুরাতন হয়ে যাওয়ার কথা মনে করা নিতান্তই বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা যে শরীয়াত বাতিল বা নাকচ হয়ে গেছে, তার উর্ধ্বগমনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বস্তুতঃ হাজার বছর পর সমস্ত শরীয়াতের সীমিত বা তার নতুন করে জারী হওয়ার কথাই যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে তিনি তা স্পষ্ট করেই বলতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ সে রকম কোন কথাই বলেন নি। আর বলেছেন বলে ধরে নিলেও প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি এমন ভাষায় সে কথা কেন বললেন, যা থেকে মূল বক্তব্য স্পষ্টভাবে বোঝা–ই যায় না। আল্লাহ্ বলতে চাইবেন এক কথা আর বলবেন ভিন্ন কথা—অন্ততঃ বলা কথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বুঝা যাবে, আল্লাহ্ সম্পর্কে এইরূপ ধারণা স্পষ্ট কুফর ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?

অবশ্য একটা কথা প্রসংগতঃ সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। তা হলোঃ

يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ -

উর্ধ্বে উত্থিত হয় বা হবে তারই নিকট এমন এক দিন, যে দিনের পরিমাণ এক হাজার বছর।

এই কথা বলে আল্লাহ্ তা'আলা আসলে কি বলতে চেয়েছেন? আসলে হাজার বছরের সমান একটি দিন এই দুনিয়ার ব্যাপার নয়, তা একান্তভাবে পরকালেই হবে।

ষষ্ঠ সন্দেহ

কুরআন অকাট্য ভাষায় ঘোষণা করেছে, ইসলাম এক বিশ্বজনীন ও চিরন্তন দ্বীন। আর এই ইসলাম দ্বারাই সকল শরীয়াতের দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যেমন, তেমনি অতীতের সকল দ্বীনকে 'মনসূখও করে দিয়েছে—এ কথার তাৎপর্য কি?

অথচ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, শুধু আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা—তারা যে শরীয়াতের প্রতি বিশ্বাসী ও তার পালনকারী হোক না কেন—আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াব পাবে এবং তাদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না, থাকবে না দুশ্চিন্তার কোন হেতু।

এই কথাটি দ্বারা ইসলাম কি অন্যান্য শরীয়াতেরও যথার্থতার স্বীকৃতি দেয়নি? ইসলামই যদি হয় সর্বশেষ শরীয়াত, আসমানী শরীয়াত পরম্পরার সর্বশেষ কড়া এবং তার রিসালাতই যদি হয় সর্বশেষ রিসালাত, অন্যান্য সব দ্বীনের নাকচকারী, তাহলে কুরআন কেমন করে বলতে পারল যে, যে লোকই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ও নেক আমলকারী হবে—সে খৃষ্টীয় ধর্ম পালনকারী হোক, কি ইয়াহুদী বা অন্য কোন ধর্ম পালনকারী, সে–ই আল্লাহ্‌র নিকট সুফলপ্রাপ্ত হবে এবং তাঁর আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে?

এইরূপ কথা দ্বারা কি প্রমাণিত হয়না যে, সকল আসমানী শরীয়াতই চিরন্তন, ইসলামী শরীয়াতের পাশাপাশি তা–ও সহীহ ও বৈধ শরীয়াত রূপে চালু থাকবে এবং

সে সবের অনুসারীরাও নাজাত পেয়ে যাবে? তাদের অবস্থা ইসলাম পালনকারী লোকদের মতই হবে?

জবাব

এই সন্দেহটির অপনোদন ও তার বাতুলতা প্রমাণের পূর্বে সেই মূল আয়াত ক'টি উদ্ধৃত করে সরাসরি পাঠের মাধ্যমে মূল বক্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট অবহিতি লাভ একান্ত জরুরী।

এই পর্যায়ে মোট তিনটি আয়াত রয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

(البقرة : ٦٢)

নিশ্চয় জানবে, নবীর প্রতি ঈমানদার হোক কিংবা ইয়াহুদী, খৃস্টান বা সাবী ধর্মাবলম্বী, যে লোকই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, সে তার প্রতিফল শুধু তার রব্ব–এর নিকট পাবে এবং তার কোন ভয় থাকবে না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কোন কারণ থাকবে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (المائدة : ٦٩)

নিশ্চয়ই জানবে, মুসলিম হোক কি ইয়াহুদী, সাবী হোক কি ঈসায়ী, যে লোক–ই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, তার জন্য কোন ভয়ের কারণ থাকবেনা, ঘটবেনা না দুশ্চিন্তার বা অনুতাপের কোন কারণ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

(الحج : ١٧)

যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী, সাবেয়ী, নাসারা ও মজুসী হয়েছে এবং যারা শির্ক করেছে— এই সকলের ব্যাপারই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দিবেন —।

আয়াত ক'টি পাঠ করার সাথে সাথে মনের মধ্যে বাহ্যতঃ এই ভাব জেগে উঠে যে, কুরআন বুঝি এই সব শরীয়াতকে বৈধ বলে মেনে নিচ্ছে এবং আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে এগুলিকে সত্য ও সঠিক বলে ঘোষণা দিচ্ছে। এই সব ধর্মপালনকারীরা আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে শুধু এই শর্তে যে, তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হবে। এ কথা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তাহলে ইসলাম অন্যান্য সকল শরীয়াতকে বাতিল ও মনসূখ করে দিয়েছে বলে দাবি করা একেবারেই ভিত্তিহীন হয়ে যায়। এই সবের প্রত্যেকটি জীবন-পথই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বা তা অনুসরণ করলে আল্লাহ্কে পাওয়া যায়, এ কথা স্বীকার করে নেয়া হলে ইসলামের চিরন্তনতার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় অপরাপর শরীয়াতের প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে নিজ নিজ শরীয়াত পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানোরও কোন যৌক্তিকতা বা অবকাশ থাকতে পারে না।

তবে বাহ্যতঃ যা মনে করা হচ্ছে, আসলেই সে কথা সত্য নয়। তাছাড়া কুরআনের কোন একটি আয়াতকে ভিত্তি করে সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলাও সম্ভব নয়। কেননা কুরআনের বাচন-ভংগীই (Style) হলো এই যে, একই বিষয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে কথা বলা হয়েছে। সেই সবগুলিকে একত্রিত করেই একটা সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তাছাড়া খোদ রাসূলে করীম (স) বিভিন্ন শরীয়াতপন্থী ও ধর্মাবলম্বীদের সাথে কার্যতঃ কিরূপ আচরণ গ্রহণ করেছিলেন, তা-ও আমাদেরকে সমুখে রাখাতে হবে। এ পর্যায়ে প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণকে তাদের নিজেদের ধর্মমত পরিহার করে ইসলামে ও মুসলিম জামায়াতে সম্পূর্ণরূপে শামিল হয়ে যেতে বলেছিলেন? — জবাব যদি ইতিবাচক হয়, যদি তিনি কার্যতঃই তা করে থাকেন, তাহলে আয়াতসমূহ থেকে সেকথা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে না, যা আয়াতসমূহ পাঠ করার সাথে-সাথেই মনের পটে জেগে উঠে; বরং তার বিপরীত অর্থ-ই গ্রহণ করতে হবে।

আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে, ইসলাম যদি অন্যান্য শরীয়াতের বহাল থাকা, ভবিষ্যতেও চলতে পারার কথাই স্বীকার করে নিয়ে থাকে, ইসলামের পরও সে সব ধর্ম পালনের পশ্চাতে ইসলামই যদি সমর্থন যোগায়, তাহলে তার অর্থ হবে, ইসলাম নিজেই নিজেকে ধ্বংস করছে। শুধু তা-ই নয়, কুরআনের ঘোষণা 'হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই সর্বশেষ নবী ও রাসূল' এ কথাই সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা হয়ে যাবে।

স্মরণ করতে হবে, রাসূলে করীম (স) নিজে তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন রাজা–বাদশাহ্–শাসক–গোত্রপতিদের নামে যে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতী পত্র দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য আহলি কিতাব ইয়াহুদ, নাসারাদের বিরুদ্ধে তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়েছেন, তা তো কেবলমাত্র এই ভিত্তিতে করা হয়েছিল যে, ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে দাবি করেছে, ইসলামের আগমনের পর অন্যান্য যাবতীয় শরীয়াত সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও নাকচ হয়ে গেছে। অতঃপর দ্বীন কেবলমাত্র ইসলাম এবং নবী ও রাসূল কেবলমাত্র মুহাম্মাদ (স)।

বস্তুতঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে একটি কথাই প্রমাণিত হয় এবং তা হচ্ছে, প্রাচীন কালের নবী–রাসূলগণের অনুসারীরা—ইসলামের আগমনের পূর্বে—আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রেখে যে নেক আমল করেছেন, তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, পরকালীন নাজাত পাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কুরআন বলে দিচ্ছে, তারা নাজাত পাবে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল করার বদৌলতে। তারা তাদের জন্য নাযিল হওয়া শরীয়াত আন্তরিকভাবে পালন করেছে বলেই তাদের জন্য আনের এই অভয়বাণী। আর তখন যারা ঈমান আনেনি, নেক আমলও করেনি, খালেস তাওহীদী আকীদাকে অগ্রাহ্য করেছে, তাদের জন্য নাজাত পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আসলে আহলি কিতাব লোকদের মধ্যে যারা ঈমানদার ছিলেন—ইসলামের পূর্বে যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রেখে নেক আমল করেছেন, তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে যে প্রবল জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছিল সর্বশেষ দ্বীন হিসাবে ইসলামের এবং সর্বশেষ নবী–রাসূল হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর আগমনের পর, উদ্ধৃত আয়াত তিনটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সেই জিজ্ঞাসারই জবাব দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন যে, তারা নাজাত পাবে। কিন্তু ইসলামের আগমনের পরেও তারা প্রাচীন ধর্মমত পালন করে এবং ইসলাম ও হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর প্রতি ঈমান না এনেও তারা মুক্তি পাবে, এমন কথা আদৌ বলা হয়নি, সেই প্রসঙ্গও এখানে নয়।

সূরা আল–বাকারা'র প্রথমোদ্ধৃত আয়াতটির 'শানে নজুল' দেখলেই কথাটি অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইমাম তাবারী মহামনীষী সুদ্দী থেকে উদ্ধৃত করেছেনঃ এ আয়াতটি হযরত সালমান ফারেসীর সংগীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাদের সম্পর্কে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারা নাজাত পাবে কিনা। জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেনঃ · هُمْ مِنْ اَهْلِ النَّارِ · 'তারা জাহান্নামী'। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেন।[১]

---

১. تفسير الطبرى ج ١ ص ٢٥٦

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, এ আয়াতটির সঙ্গে লোকদের ধারণা-অনুমান-ভিত্তিক সন্দেহের একবিন্দু সম্পর্ক নেই। ওরা যে ইসলাম-ইয়াহুদী-খৃষ্টান-সাবেয়ী ধর্মের মৈত্রী সংঘ (Confedaration) বানাতে চেয়েছিল, কুরআনের এ আয়াতে ইসলাম গ্রহণ না করেও নাজাত পাওয়ার পথ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে বানচাল হয়ে গেছে।

সূরা আল-হজ্জ-এর উদ্ধৃত আয়াতটির সাথেও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের ধারণা-অনুমানের কোন সম্পর্ক বা সঙ্গতি দেখতে পাইনে। কেননা এ আয়াতটি শুধু খবর জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ই হচ্ছেন বিভিন্ন গোত্র বা দলের মধ্যে ফয়সালা দানকারী; তিনি এক গোত্র বা দলের উপর দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন আর অপর লোকসমষ্টিকে বিজয় দান করবেন। কিন্তু অন্যান্য শরীয়াতপন্থীরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন কোন কথাই উক্ত আয়াতে নেই। তারা নাজাত পেয়ে যাবে, তেমন কোন আভাসও দেয়া হয়নি তাতে।

আরও একটি জবাব

উপরোক্ত সন্দেহের আরও একটি জবাব রয়েছে। কিন্তু সে জবাব পেশ করার পূর্বে কয়েকটি ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করা একান্ত আবশ্যক।

১. স্বাধীন জাতির চিন্তা

ইতিহাস বলছে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমানদের সমুখে নিজেদের বড়ত্বের অহংকার প্রকাশ করত। তাদের দাবি ছিল, তারা স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী জাতি। আর সেই কারণে তারা এ দাবিও করত যে, দুনিয়ার মানবকুলের মধ্যে তারাই উন্নত, উৎকর্ষপ্রাপ্ত এবং সকলের তুলনায় সভ্যতা-ভব্যতায় অধিক অগ্রসর।

তবে এদু'টি জাতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে ইয়াহুদীরা অনেক বেশী বড়াই করে বেড়াত। এমন কি, তাদের প্রাচীনতম দাবি তো এ-ই ছিল যে, আসলে তারা আল্লাহ্র পুত্র, আল্লাহ্র মনোনীত জাতি—আল্লাহ্র অতীব প্রিয় জনগোষ্ঠী।

কুরআন মজীদে তাদের এই ভিত্তিহীন দাবির উল্লেখ করে তার বাতুলতা প্রমাণ করা হয়েছে। খৃষ্টানরাও যে অনুরূপ দাবিই করত, সে কথাও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ (المائدة ١٨)

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা দাবি করেছেঃ আমরা হচ্ছি আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁর অধিক প্রিয়জন। হে নবী! আপনি একটু জিজ্ঞেস করুন তো যদি তা-ই হবে, তাহলে তোমাদের গুণাহের কারণে তিনি তোমাদেরকে আযাব দিবেন কেন?----- আসলে তোমরা তো আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যেরই মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন।

অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা। এই দাবির পেছনে একবিন্দু সত্যতা নেই।

বস্তুতঃ কুরআন মজীদ এই ভিত্তিহীন ধারণাকে দৃঢ়তার সাথে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অন্তসারশূন্য প্রমাণ করেছে।

ইয়াহুদীদের অহংকার এ পর্যন্ত এসেই থেমে যায়নি। তাদের কথাবার্তার ধরন-ধারণ দেখে মনে হচ্ছে, আল্লাহ্র সাথে ওদের বুঝি কোনরূপ চুক্তি রয়েছে, তিনি বোধ হয় ওদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ওরা যত গুনাহ ও নাফরমানীই করুক, ওদেরকে আযাব দেয়া হবেনা। আর দিলেও অল্পক্ষণের জন্য মাত্র। এ কারণেই বোধ হয় ওদের দাবি ছিলঃ

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۔ (البقرة : ٨٠)

জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে কক্ষণই স্পর্শ পর্যন্ত করবে না, যদি করেই তবে তা গুণ্তি কয়েকটি দিনের জন্য মাত্র।

কিন্তু কুরআন ওদের অসত্য কথারও তীব্র প্রতিবাদ করেছে। অস্বীকারসূচক প্রশ্ন তুলে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۔ (البقرة: ٨٠)

বল হে নবী! তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন চুক্তি গ্রহণ করেছ যে, তিনি কক্ষণই তাঁর চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধতা করবেন না?---অথবা তোমরা আল্লাহ্র নামে এমন কথা বলে বেড়াচ্ছ, যা তোমরা জানো না?

২. শুধু নাম মানুষকে নিষ্কৃতি দিবেনা

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বড়াই ও অহংকারের একটা নমুনা উপরে আলোচিত হয়েছে। তাদের অহংকারের আর একটি নমুনা হচ্ছেঃ তারা মনে করত, তাদের জাতীয় বা বংশীয় নাম—ইয়াহুদী বা নাসারা অর্থাৎ খৃষ্টান বলে পরিচিত হওয়াটাই তাদের বিশ্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার এক অকাট্য প্রমাণ। শুধু তা–ই নয়, এই নাম পরিচিতির বলেই তারা পরকালীন মুক্তি ও অফুরন্ত সওয়াব পেয়ে ধন্য হবে।

তাদের ধারণা ছিল, জান্নাত শুধু তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, যারা ইসরাঈলী বংশের লোক অথবা যারা নিজেদেরকে মসীহী—মসীহপন্থী অর্থাৎ খৃষ্টান বলে পরিচয় দেয়।

কিন্তু এটা যে নিছক মূর্খতাজনিত ভিত্তিহীন ধারণা, কুরআন মজীদ তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেঃ

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى ۔ (البقرة: ١١١)

ওদের দাবি হচ্ছে, ইয়াহুদী বা নাসারা–খৃষ্টান না হয়ে কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না কস্মিন কালেও।

কিন্তু কুরআন এসব বাতিল–ভিত্তিহীন ধারণাকেও উপেক্ষা করেনি, তার প্রতিবাদ না করে ছাড়েনি। কুরআন বলেছে, জান্নাতপ্রাপ্তি কোন বংশের সন্তান বা বিশেষ নামে পরিচিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, জান্নাতে প্রবেশের জন্য তা কোন সনদও নয়, বরং একমাত্র ঈমান ও নেক আমলের দৌলতেই লোকদের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে, অন্য কোন জোরে নয়। বলেছেঃ

تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔

(البقرة: ١١١-١١٢)

ও সব হচ্ছে ওদের মনের ভিত্তিহীন কল্পনা, সুখস্বপ্ন মাত্র। হে নবী, আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের এই দাবিতে যদি সত্যবাদীই হও, তাহলে তার পক্ষে অকাট্য দলীল পেশ কর। সত্যি কথা হচ্ছে, যে লোক নিজের গোটা সত্তাকে আল্লাহ্‌র অনুগত–উৎসর্গীকৃত করে দিবে ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান, তারই জন্য তার রব্‌–এর নিকট শুভ কর্মফল রয়েছে। এই লোকদের কোন ভয় নেই, নেই দুশ্চিন্তার কোন কারণ।

সত্যি কথা হচ্ছে, 'যে লোক নিজের গোটা সত্তাকে আল্লাহর অনুগত–উৎসর্গীকৃত করে দিবে' বাক্যাংশটি অতীব স্পষ্ট ভাষায় আসল কথা বলে দিয়েছে। এতে আল্লাহর প্রতি খালেস ঈমান ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ আত্মসমর্পনের কথা বলা হয়েছে। এরপর وَهُوَ مُحْسِنٌ 'ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান হওয়া'র কথা বলে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে আল্লাহর শরীয়াত অনুযায়ী কাজ করার গুরুত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। এই উভয় বাক্যাংশ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে, খালেস ঈমান এবং খালেস আমল। ইয়াহুদী বা নাসারা—তথা খৃষ্টান হওয়ার কোন মুল্যই সেদিন পাওয়া যাবে না। অতএব দ্বীন–ইসলামের দৃষ্টিতে তো বটে—স্বয়ং আল্লাহর নিকটও বিশেষ কোন নাম গ্রহণ বা বংশ কিংবা গোষ্ঠী অথবা জাতি পরিচয়ের আদৌ কোন দাম নেই। একমাত্র গুরুত্ব হচ্ছে সাদেক ঈমান ও নেক আমলের।

৩. ইয়াহুদী বা খৃস্টান মত অবলম্বনের উপর হেদায়েত নির্ভরশীল নয়ঃ

কুরআন অপর একটি বাতিল ও ভিত্তিহীন দাবির কথারও উল্লেখ করেছে। তা হচ্ছে, ওদের দাবি ইয়াহুদী কিংবা মসীহী (খৃস্টান) হওয়ার উপরই প্রকৃত হেদায়েতপ্রাপ্তি নির্ভর করে। এর অর্থ, যে ইয়াহুদী হলো কিংবা খৃষ্টান হলো সে–ই প্রকৃত হেদায়েত পেল।

কুরআনে তাদের কথার উল্লেখ এভাবে হয়েছেঃ

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا - (البقرة-١٣٥)

তোমরা ইয়াহুদী কিংবা নাসারা (খৃস্টান) হও, তবেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

কিন্তু কুরআন ওদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। তার প্রতিবাদ করে কুরআন বলেছেঃ

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - (البقرة:١٣٥)

বল, হে নবী। (ইয়াহুদী বা নাসারা হলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া যাবে না) বরং ঐকান্তিকভাবে ইবরাহীমের আল্লাহমুখী মিল্লাত অনুসরণ করলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া যাবে আর এতো সকলেরই জানা কথা যে, সে মুশরিক ছিল না।

তার অর্থ, ইবরাহীমী মিল্লাত অনুসরণ এবং সর্বক্ষেত্রে খালেস তাওহীদী মত ও আচরণ গ্রহণেই প্রকৃত হেদায়েত ও মুক্তি নিহিত রয়েছে।

কুরআন মজীদের অপর একটি আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, ইয়াহুদী ও নাসারারা

নিজেদের নীতি ও ধর্মমতের যথার্থতা প্রমাণের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)কে সবসময় নিজেদের দলে টানতে চেষ্টা করত। বলত, হযরত ইবরাহীমও আমাদের মতেরই অনুসারী ছিলেন। ইয়াহুদীরা বলত, তিনিও ইয়াহুদীই ছিলেন এবং নাসারারা দাবি করত, তিনি ছিলেন খাঁটি 'নাসারা'।

কিন্তু কুরআন বারবার তাদের এই দাবির ভিত্তিহীণতা ঘোষণা করেছে। ঐতিহাসিকভাবেও এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা হযরত মূসা (আ)—যাঁর অনুসারী হওয়ার দাবি করে ইয়াহুদীরা এবং হযরত ঈসা (আ)—যাঁর প্রতি ঈমানদার হওয়ার দাবি করে নাসারারা, তাঁরা দু'জনই হযরত ইবরাহীম (আ)–এর অনেক পরবর্তী কালের লোক। হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন অনেক—অনেক বছর আগের লোক। অনেক পূর্বের লোক অনেক পরবর্তী কালের লোকের অনুসারী হওয়ার দাবি ঐতিহাসিকভাবে শুধু অসত্যই নয়, নিতান্তই হাস্যকর। তাই কুরআন বলছেঃ

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

(ال عمران : ٦٧)

ইবরাহীম না ইয়াহুদী ছিল, না নাসারা; বরং সে তো ছিল সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌মুখী, আত্মসমর্পিত অনুগত। সে মুশরিকও ছিল না।

এসব আয়াতের সারকথা হচ্ছে, ইয়াহুদীরা ও খৃষ্টানরা—বিশেষ করে তাদের প্রাথমিক কালের লোকেরা এসব অন্তঃসারশূণ্য দাবির ভিত্তিতে দুনিয়ার মানুষের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করত। আল্লাহ্‌র দেয়া শিক্ষার উপর নিজেদের বাহাদুরি প্রতিষ্ঠিত করার কুমতলবেই তারা এই ধরনের কথাবার্তা বলত। আর এসব বলে তারা সাধারণ মানুষকে দ্বীন–ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে চাইত। সেই সাথে কেবল তাদেরই জান্নাতবাসী হওয়ার অহমিকতা তো ছিল–ই। কিন্তু কুরআন মজীদে আমরা দেখতে পাই, যেখানেই এই সব ভিত্তিহীন কথা- বার্তার উল্লেখ হয়েছে, সেখানেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষে মানুষে আদৌ কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা কিছু হতে পারে,—হওয়া উচিত—তা হচ্ছে শুধু তাকওয়ার কারণে, তাকওয়ার ভিত্তিতে। আর জনগণের মধ্যে যে লোক তাকওয়া—আল্লাহ্‌র ভয় ও আনুগত্যের দিক দিয়ে অধিক অগ্রসর, সে–ই আল্লাহ্‌র নিকট হবে সর্বাধিক সম্মানার্হ।

আর পরকালীন মুক্তি–নিষ্কৃতি ও জান্নাত লাভ তো কেবলমাত্র সেই লোকেরই ভাগ্যলিপি, যে সাব্যস্ত হবে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত ঈমানদার এবং তাঁর আদেশ–নিষেধসমূহ যথাযথ পালনকারী। এই কথা বলে কুরআন মূলতঃ ইয়াহুদী ও নাসারাদের দাবির ভিত্তিহীনতাই প্রমাণ করেছে অকাট্যভাবে।

উপরের উদ্ধৃত তিনটি আয়াতকে কেন্দ্র করে আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনা একথাই প্রমাণ করছে যে, উক্ত আয়াত তিনটি দ্বারা ইয়াহুদী–খৃস্টান–মুসলিমদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, তাদের মাঝে ঐক্য ও অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বলে যারা দাবি করছে, তারা সম্পূর্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা বলছে। তারা উক্তরূপ কথা বলে আসলে দ্বীন–ইসলাম এবং বিশ্বনবীর বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতাকেই অস্বীকার করতে চাচ্ছে। কিন্তু মূলতঃ ওই তিনটি আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে ইয়াহুদী–নাসারাদের ধর্ম ও অহমিকতাকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করা ও সেই সাথে একথা প্রতিষ্ঠিত করা যে, পাকালীন মুক্তি কেবলমাত্র সত্যিকার ঈমান ও তদনুযায়ী আমলের দরুণই সম্ভব হবে, অন্য কোন কারণে নয়।

তাহলে একথা প্রতিভাত যে, মানুষের কোন এক শ্রেণী বা গোষ্ঠীরই অন্যান্য মানুষের উপর আদৌ কোন মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ইয়াহুদী–নাসারাদের দাবি শুধু ভিত্তিহীনই নয়, তা মানুষের মধ্যে মারাত্মক ধরনের বিভেদ সৃষ্টিকারীও। কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি থেকেও এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছেঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔
(المائدة: ٦٥)

আহলি কিতাব—ইয়াহুদী–নাসারা'রা যদি সত্যিই ঈমান আনে ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, তাহলে আমরা ওদের সব ভুল–ভ্রান্তি–অন্যায়–পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেব এবং ওদেরকে নিয়ামত–ভরা জান্নাতে দাখিল করে দেব।

আল্লাহ তা'আলার এই ঘোষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নিকট মানুষে–মানুষে শ্রেণীতে–শ্রেণীতে, এমন কি ধর্মে–ধর্মেও কোন পার্থক্য ও ঈর্ষা–বিদ্বেষ নেই। তাঁর নিকট একটি মাত্র নীতিই সর্বাগ্রগণ্য। এমনকি আহলি কিতাবরাও যদি মুসলিমদের ন্যায় সত্যিকারভাবে ঈমান গ্রহণ করে ও আল্লাহ্কে ভয় করে চলার নীতি মেনে চলে, তাহলে তারাও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাবে, পাবে নিয়ামত–ভরা জান্নাতে প্রবেশের অধিকার ও সুযোগ।

বস্তুতঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে এ কথাই বলা হয়েছে, অন্য কিছু নয়। তাই একথা নিঃসন্দেহ যে, উপরোদ্ধৃত অয়াত তিনটিতে 'অন্যান্য শরীয়াতের বিধান ইসলাম কর্তৃক সংরক্ষিত ও সমর্থিত হয়েছে এবং ইসলামের পরও সে সবের কার্যকরতা বহাল রয়েছে' এই রূপ বলা কোনক্রমেই সঠিক ও নির্ভুল হতে পারে না; বরং কুরআন মজীদ সে ধারণার ভিত্তিহীনতাকেই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানবতার মুক্তি যে কেবলমাত্র নির্ভুল ঈমান ও যথার্থ 'আমলে সালেহ'র উপর নির্ভরশীল, তা সূরা 'আল–আসর' থেকেও ধ্বনিত হয়েছেঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

নিঃসন্দেহে সমস্ত মানুষ ধ্বংসের মুখে নিপতিত। রক্ষা পাবে কেবল তারা যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, সত্যের জন্য ও ধৈর্যধারণের জন্য পরস্পরকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছে।

উপরোদ্ধৃত তিনটি আয়াতে 'ঈমান' শব্দটির বার বার উল্লেখ হয়েছে। তা আমাদের বক্তব্যকেই যথার্থ প্রমাণ করছে। আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ

যারাই ঈমান এনেছে ……………

পরে আবার বলা হয়েছে مَنْ اٰمَنَ 'যে ঈমান এনেছে' —— প্রথমে যাদের ঈমানের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বারে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। এরা তারাই, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ঈমান তাদের দিলে স্থান লাভ করেছে কি করেনি, সে কথা স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় বারে ঈমানের কথা বলে আল্লাহ্ সত্যিকারভাবে ঈমান গ্রহণকারীদের কথাই বুঝিয়েছেন, যাদের ঈমানের সাথে যুক্ত রয়েছে ঈমান–অনুযায়ী আমল।

অন্য কথায় اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে। কেননা তারাই ইয়াহুদ ও নাসারাদের প্রতিপক্ষ রূপে উল্লেখিত। এ ছাড়াঃ–

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ ـ (المائدة: ٨٢)

ঈমানদার লোকদের প্রতি প্রচন্ড শত্রুতা পোষণকারী হিসাবে ইয়াহুদীদেরকেই দেখতে পাবে।

এই বলে ইয়াহুদীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে মুসলমানদেরকেই দাঁড় করান হয়েছে। তাই শুরুতে اٰمنوا বলে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম (স)–এর রিসালাতের প্রতি ঈমান প্রকাশকারী লোকদেরকেই বোঝানো হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে মনে করতে হবে। যেমন من يؤمن বলেও দিলে দৃঢ় ও প্রকৃত ঈমান পোষণকারীদেরকেই বোঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا - (النساء:١٣٦)

হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা ঈমান আনো

এই বলে ঈমানদার মুসলিমদেরই সম্বোধন করা হয়েছে। একালের শ্রেষ্ঠ কুরআনবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)–ও এ আয়াতের তাফসীরে সেই কথাই লিখেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ

ঈমান গ্রহণকারীদের 'ঈমান গ্রহণ কর' বলা বাহ্যতঃ আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু আসলে 'ঈমান' শব্দটি এ আয়াতে দু'স্থানে দু'টি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান গ্রহণের একটি অর্থ হচ্ছে, অস্বীকৃতির পরিবর্তে স্বীকৃতির পথ অবলম্বন করা। অমান্যকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মান্যতাকারীদের মধ্যে দাখিল হওয়া। আর তার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মানুষ যা মেনে নেয়, তাকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পূর্ণ দায়িত্ব চেতনা সহকারে মেনে নেয়া। স্বীয় চিন্তা–ভাবনা, রুচি, পছন্দ–অপছন্দ, নিজের চালচলন, বন্ধুতা–শত্রুতা, স্বীয় চেষ্টা–সাধনা–ব্যস্ততা সবকিছুই সে বিশ্বাস অনুযায়ী গড়ে তোলা, যা সে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে। আয়াতটিতে প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে সে সব মুসলমানদের যারা প্রথম অর্থের দিক দিয়ে মান্যতাকারীদের মধ্যে শামিল হয়েছে এবং পরে اٰمِنُوْا বলে তাদেরকেই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আর اَلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى বলে বোঝানো হয়েছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান গোষ্ঠী রূপ গ্রহণকারী লোকদেরকে, ইয়াহুদী আকীদা গ্রহণকারী লোকদের নয়, যারা প্রকৃতই ইয়াহুদী মত অবলম্বন করেছে তাদেরকে নয়, কিংবা যারা প্রকৃত ঈসায়ী মত গ্রহণ করেছে তাদেরকেও নয়। এ–ও ঠিক তেমনি, যেমন اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে মুসিলম সমাজের মধ্যে শামিল হওয়া লোকদেরকেই বোঝানো হয়েছে, প্রকৃত ঈমানী আদর্শ গ্রহণকারী লোকদেরকে নয়।

তার অর্থ, কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে যেমন গোত্রীয় ও গোষ্ঠীয় গোঁড়ামী প্রবল ছিল, কুরআন নাযিল হওয়ার কালেও তা–ই অবশিষ্ট ছিল। কাজেই যারা নিছক গোত্র ও গোষ্ঠীগতভাবে মুমিন বলে গণ্য হতে শুরু করেছিল এবং যারা প্রকৃতই ঈমান গ্রহণ করে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে ঈমানী জীবন যাপন করতে শুরু করেছিল—এই দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই।

বর্তমান সময়েও এই অবস্থা বিরাজমান দেখা যাচ্ছে। একালেও মুসলিম বলতে মুসলিম নামে পরিচিত সমাজে শামিল হওয়া লোকদেরকেই বুঝায় এবং অন্যদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। তৎকালীন মদীনীয় সমাজে যেমন মুনাফিকরাও মুসলিম সমাজে গণ্য হতো, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষেই 'মুসলিম' ছিলনা, একালেও তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না।

আসল কথা হচ্ছে, সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত, মানুষ বুঝি কিয়ামতের দিন নিজেদের বানানো গোত্রীয় ও গোষ্ঠীগত পরিচিতির ভিত্তিতে কেউ বেহেশতে আর কেউ দোজখে যাবে, তাকে সম্পূর্ণ নস্যাত করা ও তার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করাই উক্ত আয়াতের লক্ষ্য। ইয়াহুদীরা যেমন মনে করে, পরকালীন মুক্তি কেবলমাত্র সে সব লোকের জন্য নিশ্চিত যারা ইয়াহুদী গোত্রভুক্ত আর খৃষ্টানরা যেমন ধারণা পোষণ করে যে, খৃষ্টান হওয়ার অর্থই হচ্ছে পরকালীন মুক্তির সনদ লাভ, মুসলিম সমাজেরও ধারণা, মুসলমান নামে পরিচিত লোকেরা তো জান্নাতে যাবেই। কিন্তু উক্ত আয়াতাংশ তার তীব্র প্রতিবাদ করে প্রকৃত মুক্তির পথ এই সকলের সমুখে প্রতিভাত করে তুলেছে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের অর্থ কখনই এই নয় যে, আল্লাহ্ আছেন, তিনি এক ও লা'–শারীক—এটুকু বিশ্বাস করলেই হয়ে গেল। প্রকৃত ব্যাপার তা কখনই হতে পারে না। আসলে ঈমানের তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন। যেমন বলা হয়েছেঃ

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ (البقرة : ١١٢)

না, (তোমাদের ওসব ধারণা সত্য নয়) আসল কথা হচ্ছে, যে লোক–ই ঐকান্তিকভাবে আত্মনিবেদিত হয়ে আল্লাহ্‌রই জন্য স্বীয় পূর্ণ সত্তাকে উপস্থাপিত করবে, তারই জন্য রয়েছে তার শুভ প্রতিফল তার রব্–এর নিকট এবং তাদের কোন ভয় নেই, নেই দুশ্চিন্তার কোন কারণ।

আল্লাহ্‌র নবী–রাসূলগণের প্রতি ঈমান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানেরই অপারিহার্য অংশ ও অঙ্গ। এই দুই ঈমান কখনই বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের আবহান জানিয়েছেন এই ভাষায়ঃ

قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ (البقرة : ١٣٦)

তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি আর যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং বংশধরদের প্রতি এবং যা দেয়া হয়েছে মূসা ও ঈসা এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব্–এর নিকট থেকে। এঁদের কারোর মধ্যে আমরা কোনরূপ পার্থক্য স্বীকার করি না এবং মূলতঃ আমরা সেই আল্লাহ্‌রই অনুগত।

আল্লাহ্‌র নবীগণের প্রতি ঈমানও তাঁর সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বলা হয়েছেঃ

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ (البقرة : ١٣٧)

তোমরা যেমন খাতামান্নবীয়ীন–এর প্রতি ঈমান এনেছ, ওরাও যদি ঠিক তেমনি ঈমান আনে, তবেই তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারে। আর ওরা যদি তা থেকে ফিরে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, ওরা বিরোধের মধ্যে নিমজ্জিত

কুরআন আরও বলেছে যে, একজন নবীকে অবিশ্বাস করার অর্থ সকল নবীর প্রতি কুফরি করা, বরং তা–ই হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌কেও অস্বীকার করার শামিল। তাই বলা হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ـ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ (النساء : ١٥٠-١٥١)

যারাই কুফরী করে আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁর রাসূলগণের সাথে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়, বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও

কতককে করি অবিশ্বাস এবং এদের মধ্যে কোন ভিন্নপথ বের করতে চায়, এরা সকলেই নিঃসন্দেহে কাফির।

শেষ নবীর প্রতি ঈমান তো ঈমানেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ (النور: ٦٢)

মুমিন কেবলমাত্র তারাই, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূল [(মুহাম্মদ (স)]–এর প্রতি।

আরও বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ـ (الحجرات: ١٥)

প্রকৃত মুমিন তো তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি, অতঃপর কোনরূপ সংশয়ের বশবর্তী হয়নি এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে তাদের ধন–মাল ও জান–প্রাণ দিয়ে, এরাই হচ্ছে সত্যবাদী।

বস্তুতঃ রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের অর্থ রাসূলগণের বিরাটত্ব–মহানত্ব এবং পবিত্রতা–মাহাত্ম্য স্বীকার করে নেওয়াই শুধু নয়; রবং কার্যতঃ তাঁদের অনুসরণ করাই হচ্ছে এর প্রকৃত তাৎপর্য। তাই আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ـ (النساء: ٦٤)

আমরা রাসূল পাঠিয়েছি তো কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাদের অনুসরণ করা হবে। (এ ছাড়া অন্য কোন কারণে নয়)

বলেছেনঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ـ (النساء: ١١٥)

কিন্তু যে ব্যক্তি রাসুলের বিরুদ্ধতা করার জন্য কৃতসংকল্প হবে হেদায়েতের বিধান প্রতিভাত হয়ে উঠার পর– ও এবং ঈমানদারদের নিয়ম–নীতির বিপরীত দিকে

চলবে, তাকে আমরা সেদিকেই চালাব যে দিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেব, আর তা অত্যন্ত বিড়ম্বনাময় স্থান।

বলেছেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۔ (الاحزاب: ٣٦)

আল্লাহ্ এবং তার রাসূল যদি মুমিন পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন, তখন সে ব্যাপারে তাদের কোন ইখতিয়ারই থাকতে পারে না। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অমান্যতা করবে, সে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়ে যাবে।

এই সব আয়াত একটি কথা বার বার স্পষ্ট করে তুলেছে এবং তা হচ্ছে , আল্লাহ্র প্রতি যে ঈমান নাজাত পাওয়ার একমাত্র উপায়, তা কখনই তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য–অনুসরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না; বরং তা সেই ঈমানেরই অঙ্গীভূত মনে করতে হবে নিশ্চিতভাবে। এই ঈমানের মধ্যেই একান্ত গভীর ও ওতপ্রোতভাবে শামিল রয়েছে সর্বশেষ নবী–রাসূল ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান। আর শেষ নবী–রাসূলের প্রতি ঈমান কখনই তাঁর আনুগত্যহীন হতে পারে না। এ ঈমানের অর্থ হচ্ছে সর্ব ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ ও হুকুম পালন করে চলা। বস্তুতঃ রাসূলে করীম (স)–এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন ও শরীয়াত—তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহ যথাযথ পালন না করলে তাঁর আনুগত্য হয় না, কোনই অর্থ হয় না তাঁর প্রতি ঈমানের। আর 'মুসলিম' তো তাকেই বলা হয়—বলা যেতে পারে, যে সেই ঈমানের সাথে সাথে তাঁর শরীয়াতকেও পুরোপুরি পালন করে। কুরআনের এই পর্যায়ের আয়াতসমূহের মধ্যে এদিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই।

এতদ্‌সত্ত্বেও যারা কুরআনের একটি আয়াতকে ভিত্তি করে বলতে চায় যে, ইসলাম ইয়াহুদীদেরকে পাক্কা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে প্রকৃত খৃষ্টান হতে বলেছে এবং ইয়াহুদী ও ঈসায়ী শরীয়াতও বহাল রয়েছে—ইসলামের পরও তা বৈধ শরীয়াত, তারা আসলে কুরআন থেকে নয়, নিজেদের ইচ্ছা ও মনোভাবকে কুরআনের নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে মাত্র। তাছাড়া কুরআনের কোন একটি আয়াতকে ভিত্তি করে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলা এবং সেই পর্যায়ের অন্যান্য আয়াতের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া কুরআন অধ্যয়ন ও তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা অত্যন্ত ভুল পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে

কুরআনের আসল বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য প্রমাণ করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। এই জন্য আল্লাহ্ তাঁর নবীকে ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন এই বলেঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ (الانعام، ١٥٢)

নিশ্চিত জানবে, আমার এই পথই সুদৃঢ়–সঠিক–নির্ভুল। অতএব তোমরা তারই অনুসরণ কর। এছাড়া অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। – এটাই হচ্ছে তোমাদের–মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্‌র উপদেশ; আশা করা যায়, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে।

এই রূপ চূড়ান্ত ঘোষণার পর কুরআনের পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে, ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত বহু সংখ্যক পথের যথার্থতা স্বীকার করা? ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মমতকে বৈধ মনে করা?

উম্মী নবী

মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) 'উম্মী' ছিলেন। তিনি পড়তে লিখতে সক্ষম ছিলেন না। কুরআন মজীদেও তাঁকে 'আন্‌-নবীউল-উম্মী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী করীম (স)-এর জীবন ইতিহাস থেকেও এ কথার সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে,তিনি কখনই কোন পাঠশালায় ভর্তি হননি, কোন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কখনই যান নি। শৈশবকালে তিনি মরুভূমিতে লালিত-পালিত হয়েছেন। পরে দাদার স্নেহচ্ছায়ায় এবং তারও পর স্নেহশীল চাচার যত্নে বড় হয়েছেন। তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর পর্যন্ত লেখা-পড়ার কোন সুযোগই পান নি। তৎকালীন মক্কী সমাজে লেখাপড়ার সাধারণ কোন প্রচলনও ছিলনা। কুরআন মজীদে এই কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। যেমনঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ -

(العنكبوت : ٤٨)

হে নবী। তুমি এর পূর্বে কোন কিতাব পড়তে না, নিজের ডান হাত দিয়ে কোন কিছু লিখতেও না। কেননা তা যদি তুমি করতে, তাহলে বাতিলপন্থীরা সন্দেহে পড়ে যেত।

রাসূলে করীম (স) লিখিত জিনিস পড়তে পারতেন না, নিজেও কিছু হাত দিয়ে লিখতে পারতেন না—তার অর্থ, তিনি পুরাপুরি উম্মী নবী ছিলেন। এই কথাটি উপরোদ্ধৃত আয়াতে অতীব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এতে একবিন্দু অস্পষ্টতা রাখা হয়নি।

বস্তুতঃ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি যে কোন লিখিত জিনিস পাঠ করতে পারতেন না, নিজ হাতে কিছু লিখতেও পারতেন না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি? লিখিত জিনিস পাঠ করা বা নিজ হাতে লেখা—এই সবকিছুকেই তো

কুরআনের উপরোদ্ধৃত আয়াতে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় অস্বীকার করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। এক কথায়, হযরত মুহাম্মাদ (স) নবুয়্যাতপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কোন লিখিত জিনিস পড়তে পারতেন না, তিনি নিজ হাতেও লিখতে পারতেন না। কেননা তিনি লেখাপড়া বলতে যা বুঝায়, নবুয়্যাতের পূর্ব পর্যন্ত তার কিছুই শিখেননি।

রাসূলে করীম (স) যখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী লাভ করে লোকদের তা শোনাতে লাগলেন, তখন কুরআনের উচ্চতর সাহিত্যিক মানের এবং মহান হেদায়েতে পরিপূর্ণ কালাম শুনতে পেয়ে কাফির–মুশরিকরা হতবাক হয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে বলতে লাগল, 'মুহাম্মাদ (স) তো লেখাপড়া জানা লোক নয়। উচ্চতর সাহিত্যিক মানের আরবী কালাম তাঁর আয়ত্তাধীন হওয়া এবং এইরূপ গভীর ব্যাপক জ্ঞানগর্ভ কালাম রচনা করা তাঁর পক্ষে তো সম্ভব নয়। বলতে লাগল, নিশ্চয়ই অন্য কেউ এই কালাম রচনা করে তাঁকে দিচ্ছে এবং তিনি তা নিজের মুখে অন্য লোকদের শোনাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় তাদের এই সব কথার প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেনঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا - وَقَالُوٓا أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

(الفرقان: ٤-٥)

নবীর দাওয়াত অস্বীকারকারী লোকেরা বলেঃ এই কুরআন এক মনগড়া জিনিস, যা এই ব্যক্তি নিজেই রচনা করে নিয়েছে এবং অপর কিছু লোক এই কাজে তার সাহায্য করেছে। ওরা বড়ই জুলুম ও অতীব কঠিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। ওরা বলেঃ এ তো আগের কালের লোকদের রচিত কথাবার্তা, যা এই ব্যক্তি নকল করিয়ে থাকে? আর তা সকাল–সন্ধ্যা তাকে শুনানো হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'আলার এই ঘোষণাটি সকল মানুষের মন থেকে রাসূলে করীম (স)–এর নবুয়্যাত ও রিসালাত এবং কুরআন সম্পর্কে যাবতীয় শোবাহ–সন্দেহকে উৎপাটিত করে দিয়েছে। খোদ রাসুলে করীম (স) কে ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ -

(يونس: ١٦)

বল হে নবী! আল্লাহ্ চাইলে আমি এই কুরআন তোমাদেরকে কখনই শুনাতাম না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে এর খবরটুকুও দিতেন না। আমি তো এর পূর্বে একটা জীবন-কাল তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে প্রয়োগ কর না?

অর্থাৎ হে আরব সমাজ, তোমরা তো আমার জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। আমি তো তোমাদের সামনে—তোমাদের মধ্যে লালিত-পালিত ও এই বয়স পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছি। তোমরা কি আমাকে কখনও কোন কিতাব পড়তে কিংবা নিজ হাতে কোন কিছু লিখতে দেখেছ? যদি না-ই দেখে থাক, তাহলে তোমরা কি করে বলতে পার যে, আমি পুরানা কাহিনী লিপিবদ্ধ করে মিথ্যামিথ্যি আল্লাহ্র কালাম বলে তা তোমাদের সামনে পেশ করছি? আর একাজে আমাকে অন্য কিছু লোক সাহায্য করছে বলে তোমরা মিথ্যা কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছ?

এই ঘোষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ নবী করীম (স) যদি বাস্তবিকই উম্মী না হতেন, লিখতে ও পড়তে অক্ষম না হতেন, তাহলে তিনি আরব এবং বিশেষভাবে কুরাইশদের সামনে এইরূপ চ্যালেঞ্জ দিতে পারতেন না। তখন তো কাফির-মুশরিকদের ছড়ানো সন্দেহ-সংশয় প্রবল হয়ে দেখা দিত। তিনি নিঃসংকোচে বলতে পারতেন নাঃ

أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ـ (الفرقان: ٦)

এই কুরআন তো নাযিল করেছেন সেই মহান আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীনের সকল প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব ভালোভাবেই জানেন। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়াবান।

রাসূলে করীম (স) যে কুরআন লোকদের শুনাচ্ছিলেন, তা যে তাঁর নিজের রচিত ছিলনা, ছিলনা অন্য কোন মানুষের দ্বারা রচিত বা পুরানো কিতাবাদি পড়ে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী কথা, তার অকাট্য প্রমাণই এই ছিল যে, তিনি মক্কার লোকদের মধ্যেই লালিত-পালিত ও চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে উঠেছেন নিতান্ত উম্মী ব্যক্তি হিসাবে। কোন দিন লেখাপড়া শেখার একবিন্দু সুযোগ তিনি পাননি।

শুরুতে উদ্ধৃত সূরা আল-আনকাবুত-এর ৪৮ নং আয়াতের তাফসীর লিখতে গিয়ে মুফাস্সিরগণ বলেছেনঃ এর إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ এর لارتاب শব্দের শুরুতে لام রয়েছে তা কসম-কিড়ার অর্থ প্রকাশ করে। ফলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ

وَلَوْ خَطَطْتَهُ بِيَمِينِكَ أَوْ تَلَوْتَ قَبْلَهُ كِتَابًا إِذًا وَاللّٰهِ لَارْتَابُوا ـ

তুমি যদি নিজ হাতে লিখতে সক্ষম হতে কিংবা পূর্বে কোন বই পড়তে সক্ষম হতে, তাহলে—আল্লাহর কসম—কুরআন সম্পর্কে লোকদের প্রবল সন্দেহ হতো।

অর্থাৎ বাতিলপন্থী কাফির-মুশরিক লোকদের পক্ষে নবীর নবুয়্যাত এবং কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক-প্রবল সংশয় সৃষ্টির মহা সুযোগ ঘটে যেত। তারা বলতে পারতঃ তুমি আগের কালের কিতাব পড়ে পড়েই আল্লাহর কালাম তোমার নিকট নাযিল হয়েছে বলে চালিয়ে দিচ্ছ। অথচ তিনি যে কোন দিন লেখাপড়া শিখেন নি, লিখতে ও পড়তে পারেন না, একথা অস্বীকার করার সাধ্য সে সমাজের কারোরই ছিলনা। ফলে সে কালাম যে আল্লাহরই নাযিল করা কালাম, তা যে তাঁর বা অন্য কারোর রচিত নয়, তা মেনে নেয়া ছাড়া লোকদের পক্ষে আর কোন উপায় ছিলনা।[১]

হযরত মুহাম্মাদ (স) শুধু যে মাতৃভাষা আরবী পড়তে ও লিখতে পারতেন না তাই নয়; অন্য কোন ভাষায় লিখিত কোন কিতাবও তিনি পড়তে পারতেন না। তাই পূর্বে নাযিল হওয়া অন্যান ভাষার কিতাব পড়ে তা থেকে লোকদেরকে আল্লাহর কালাম বলে শুনানোও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা আল্লাহ্-ই বলেছেনঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ط وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

(الشورى: ٥٢)

আর এমনিভাবে—হে নবী—আমরা আমাদের নির্দেশে একটি রূহ তোমার দিকে ওহী করে পাঠিয়েছি। তুমি কিছুই জানতে না কিতাব কাকে বলে, ঈমান কি জিনিস। কিন্তু সেই রূহকে আমরা একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমরা আমাদের বান্দাহদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে তুমি সঠিক সোজা দিকেই লোকদের পথপ্রদর্শন করছ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ج وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ـ

---

(১) تفسير مجمع البيان ج ٨ص ٢٨٨

এবং এমনিভাবে আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তার প্রতি ঈমান রাখে। আর ওদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে, যারা সে কিতাবের প্রতি ঈমানদার।

এ আয়াতে 'আলিফ ও লাম' যুক্ত কিতাব শব্দটিতে পরিচিত কিতাবসমূহই বুঝায়। এখানে পূর্বের নাযিল করা কিতাবের ন্যায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি কিতাব নাযিল করার কথাই বুঝনো হয়েছে।

অতএব কেউ যদি বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) আরবী ভাষা লিখতে ও পড়তে পারতেন, তিনি 'উম্মী' ছিলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি অন্যান্য ভাষার কিতাব পড়তে পারতেন না, তাহলে তিনি যে একটি ভিত্তিহীন কথা বলছেন, এমন কথা বলছেন কুরআন যার তীব্র প্রতিবাদ করছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।[২]

কেননা কুরআনের আয়াতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, তিনি লিখিত জিনিস আদৌ পড়তে পারতেন না। আর পড়তে পারতেন না বলে অনিবার্যভাবে তিনি লিখতেও পারতেন না। এ কারণেই আয়াতটির প্রথমাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْ مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ ـ

পূর্বে তুমি কোন কিতাব—কোন লিখিত জিনিস পড়তে না—পড়তে পারঙ্গম ছিলে না। (কোন ভাষারই কোন বই তিনি পড়তে পারতেন না)

আর তার পরই বলা হয়েছেঃ وَلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ 'এবং তুমি তোমার হাতে লিখতেও পারতে না।'

তার অর্থ অবশ্য এটা নয় যে, লেখাপড়ার কোন স্বভাব বা প্রকৃতিগতভাবে এর কোন ক্ষমতাই তার ছিলনা। বিশেষ করে ইবরানী বা অন্যান্য ভাষায় অবতীর্ণ ধর্মীয় কিতাবাদি পড়ার ক্ষমতা ছিলনা, এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলে প্রথম কথাটি বলাই যথেষ্ট ছিল। 'তুমি লিখতেও পারনা, বলার প্রয়োজন ছিল না। কেননা এ দু'টো কাজ পরস্পর সম্পৃক্ত। যে ব্যক্তি লিখিত বই পড়তে পারে না, সে তা লিখতেও পারে না, এটাই স্বাভাবিক।

রাসূলে করীম (স)-এর উম্মী হওয়া সম্পর্কে কুরআন মজীদে দ্বিতীয় যে আয়াতটি রয়েছে, তা হচ্ছেঃ

---

(২) ভারতীয় হায়দারাবাদের ডঃ আবদুল্লতীফ ১৯৬৪ সনে একটি ইংরেজী প্রবন্ধে এই রূপ আজগুবী মত প্রকাশ করেছেন।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ
وَالْاِنْجِيْلِ ؗ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ـ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ
وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ (الاعراف: ١٥٧-١٥٨)

(অতএব আজ এই রহমাত তাদেরই প্রাপ্য) যারা এই উম্মী নবীর অনুসরণ করবে, যার উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে তারা দেখতে পায়। সে নবী তো তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, খারাপ ও পাপের কাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পবিত্র দ্রব্য–সামগ্রী হালাল ঘোষণা করে ও খারাপ–নিকৃষ্ট জিনিসসমূহকে হারাম ঘোষণা করে। আর তাদের উপর থেকে সেই বোঝা ও বন্ধনাদি দূর করে দেয় যা তাদের উপর চেপে বসেছিল। অতএব যে সব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে তার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং তার নিকট নাযিল–করা আলোর অনুসরণ করবে, তারাই হবে সাফল্যমন্ডিত। অতএব ঈমান আনো তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর সেই রাসূলের প্রতি যে একজন উম্মী নবী, যে নিজে আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর কালামের প্রতি ঈমান রাখে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর। তাহলেই আশা করা যায়, তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারবে।

উপরোদ্ধৃত দু'টি আয়াতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবীকে মোট দশটি গুণে ভূষিত করেছেন। সে দশটি গুণ বা পরিচিতি এইঃ

—তিনি রাসূল, তিনি নবী, তিনি উম্মী।

—তাঁর নাম তাওরাত ও ইনজীল কিতাবে লিখিত রয়েছে।

—সে কিতাব দুইখানিতে নবী সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

তিনি মারূফ—ভালো কাজের আদেশ করেন,

তিনি খারাপ–পাপ–শরীয়াত বিরোধী কাজ করতে নিষেধ করেন,

তিনি যাবতীয় উত্তম–উৎকৃষ্ট–পবিত্র দ্রব্যাদিকে হালাল ঘোষণা করেন,

তিনি সব খবীস—খারাপ–নিকৃষ্ট–পচা–দুর্গন্ধময় জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেন,

—তিনি লোকদের উপর চাপানো অস্বাভাবিক ও দুর্বহ বোঝাসমূহ দূর করে দেন। (মানুষের উপর থেকে আল্লাহদ্রোহী শক্তির আইন পালনের বাধ্যবাধকতা সরিয়ে দেন।)

—তিনি মানুষকে নানা প্রকারের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করেন।

একসাথে বলা নবীর এই সব গুণ–পরিচিতি যত স্পষ্ট, ততটাই স্পষ্ট কথা এই যে, তিনি একজন উম্মী লোক।

আর কুরআনের ভাষায় 'উম্মী' সে, যে পাঠ করতে সক্ষম নয়, নিজ হাতে লিখতে অক্ষম। যেমন অপর আয়াতে এই 'উম্মী' শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই বলেঃ

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَٰبَ ۔ (البقرة : ٧٨)

তাদের মধ্যে এমন উম্মী লোক রয়েছে, যারা লিখতে জানেনা।

অর্থাৎ তারা নিজেরা লিখতে সক্ষম নয়। তাদের মধ্যকার শিক্ষিত লোকেরা যে সব ভিত্তিহীন ধারণাবলী তাদের মনে জাগিয়ে দেয়, তারা অন্ধভাবে কেবল তারই অনুসরণ করে চলে। ওরা লিখতে জানে না বলে লিখিত জিনিস–– ওদের জন্য লিখিত ধর্মগ্রন্থও ওরা পড়তে পারে না। কাজেই আলিম–পন্ডিতদের মুখের কথা বিশ্বাস করা ছাড়া ওদের আর কোন গতি নেই। তারা যদি বাস্তবিকই লিখতে জানত, পড়তে পারত, তাহলে তাদের আলিম–পন্ডিতদের মনগড়া কথায় ওরা প্রতারিত হতো না। তাহলে ওরা ঠিক–বেঠিক–এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারত। কিন্তু তাদের 'উম্মীত্ব' অর্থাৎ লিখতে–পড়তে অক্ষম হওয়ার দরুণই তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ও আলিম–পন্ডিতদের কারসাজিতে প্রতারিত। তাফসীরে কবীর–এ উল্লেখ করা হয়েছেঃ খোদ রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

أَنَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ۔ (بخاری ج ١ - ص ٣٢٨)

আমরা এক উম্মী জনগোষ্ঠী। আমরা লিখতে পারি না, হিসাবও করিনা।

হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেছেনঃ

তোমাদের নবী (স) উম্মী ছিলেন, লিখতে–পড়তে ও হিসাব করতে পারতেন না।

তৎকালীন আরবদের অধিকাংশই না লিখতে জানত, না পড়তে পারত। আর এই কারণে নবী করীম (স)–কে 'উম্মী' বলা হয়েছে।[১]

১. مفاتیح الغیب ج ٢، ص ٣٠٩

আল্লামা বায়যাবী বলেছেনঃ

اَلْاُمِّیُّ لَا یَکْتُبُ وَلَا یَقْرَأُ ـ

'উম্মী' সে, যে লিখতে পারে না, পড়তেও পারে না।

নবী করীম (স)-কে 'উম্মী' অভিহিত করার তাৎপর্য হচ্ছে, এতৎসত্ত্বেও তিনি যে পূর্ণ মাত্রার জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন, তা তাঁর একটি মু'জিজা'[২]

তাফসীর রুহুল মায়ানীতে লিখিত হয়েছেঃ কুরআনের আয়াতে রাসূলে করীম (স)কে 'উম্মী' বলা হয়েছে। কেননা তিনি লেখাপড়া জানতেন না।[৩]

আবুল হুসেইন আহমাদ ইবনে ফারেস ইবনে যাকারিয়া (মৃতঃ ৩৯৫ হিঃ) তাঁর প্রখ্যাত অভিধান مقاييس اللغة গ্রন্থে লিখেছেনঃ

ام। শব্দটির একই মূল থেকে চারটি অর্থে ব্যবহৃত শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। এই চারটি অর্থ হচ্ছেঃ মূল, প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র, জনসমাবেশ ও দ্বীন। খলীল বলেছেনঃ আবরদের ভাষায় বলা হয় 'উম্ম' যেখানে সব জিনিস একত্রিত হয়। এ থেকেই বানানো হয়েছে ام الرأس শব্দটি, যার অর্থ মগজ বা মস্তিষ্ক। মক্কাকে এজন্যই 'উম্মুল কুরা' জনবসতিসমূহের মূল বলা হয়। প্রতিটি শহর বা বড় নগর 'উম্ম' বা কেন্দ্রীয় স্থান তার চারপার্শ্বের জনবসতিসমূহের জন্য। সূরা আল-ফাতিহাকে এজন্যই উম্মুল কুরআন বলা হয়। আর লওহে মাহফুযকে বলা হয় উম্মুল কিতাব—সমস্ত আসমানী কিতাবের উৎসমূল। 'মা'কে আরবীতে 'উম্ম' বলা হয়; কেননা মাতৃক্রোড়ই হচ্ছে সন্তানদের শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয়। এই প্রেক্ষিতেই 'উম্মী' বলা হয় এমন প্রকৃতিকে যা লিখবার শক্তিরহিত। জন্ম কাল থেকেই যে লোক লিখতে ও পড়তে পারে না, তাকে উম্মী বলা হয়।[৪]

'আমীনুল ইসলাম' সিজিস্তানী তাঁর তাফসীর مجمع البيان এ 'উম্মী'র কয়েকটি অর্থ লিখেছেনঃ

—যে লিখতে ও পড়তে পারেনা,

—'উম্মাৎ' সম্পৃক্ত, স্বাভাবিকভাবেই লেখাপড়ার ফায়দা থেকে বঞ্চিত,

—উম্ম বা মা সম্পৃক্ত, লেখা শেখার পূর্ববর্তী মাপ্রসূত সন্তান।

উপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন অর্থ একই তাৎপর্যকে স্পষ্ট করেছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে,

---

২. انوار التنزيل واسرار التاويل ج ۲، ص ۲۳۰

৩. تفسير روح المعانى ج ۹ ص ۸۰ طبع مصر

৪. الكشاف ج ۱ ص ۲۲۴ - المقاييس اللغة ج ۱ ص ۲۱-۲۸ الجامع لاحكام القرآن ج ۲، ص ۲۹۸

তা 'উম্ম্' থেকে নির্গত; কিংবা উম্মাত থেকে। ইবনে ফারেস এই উভয় দিকের সমন্বয় করেছেন তাঁর উপরোদ্ধৃত ব্যাখ্যায়। যজাজ (زجاج) লিখেছেনঃ 'উম্মী' তাকে বলা হয় যে আরব জনগণের ন্যায় লেখাপড়া না জানা লোক হবে।[৫] ইমাম কুরতুবী লিখেছেনঃ 'উম্মী' , উম্মি জনগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি, যে তার জন্মকালের ন্যায় লেখাপড়া না জানা অবস্থায় রয়েছে।[৬]

ঐতিহাসিক প্রমাণাদিঃ

তৎকালীন মক্কায় জাহিলিয়াতের যুগে লেখাপড়া জানা লোকদের সংখ্যা ছিল—ইমাম বালাযুরীর মতে—মাত্র সতের জন। আর ইয়াসরিবে (পরবর্তীতে যার নাম হয়েছে মদীনা)—মাত্র এগার ব্যক্তি। ঐতিহাসিক বালাযুরী আরবে লেখাপড়ার বিস্তৃতির ইতিহাস লিখেছেন এভাবেঃ 'তাঈ' গোত্রের মারাসির ইবনে মুররা, আসলাম ইবনে সদরা ও আমের ইবনে জদরা এই তিন ব্যাক্তি 'বাক্কা' নামক স্থানে বসে আরবী অক্ষর লেখা ঠিক করে। আরবী শব্দ গঠন ও বানান ঠিক করে সুরইয়ানী বানান পদ্ধতিতে। পরে আল–আনবার অধিবাসীদের কতিপয় লোক তা শিক্ষা করে, তাদের নিকট থেকে তা শিক্ষা করে 'হীরা'র অধিবাসীরা। বিশর ইবনে আবদুল মালেক ছিল আকিয়াদ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবদুল জ্বিন্ আল–কিন্দীর ভাই। সে দওমাতুল জানদাল–এর অধিবাসী হিসাবে 'হীরা'য় উপস্থিত হয় এবং কিছুকাল এখানে অবস্থান গ্রহণ করে। সে ছিল খৃস্টান ধর্মাবলম্বী। সে 'হীরা'বাসীদের নিকট থেকে আরবী বর্ণমালা ও লেখন–পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করে। পরে এক সময় সে মক্কায় আগমন করে। সেখানে সুফিয়ান ইবনে উমাইয়্যা ইবনে আবদে শামস ও আবু কায়স ইবনে আবদে মনাফ ইবনে জুহরা ইবনে কিলাব তাকে কিছু লিখতে দেখে এবং তারা দু'জনই এই লেখা শেখানোর জন্য তার নিকট দাবি জানায়। সে তাদেরকে বর্ণমালা ও লেখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। পরে বিশ্র, সুফিয়ান ও আবু কায়স ব্যবসায় উপলক্ষে তায়েফ শহরে গমন করে। তথায় গীলান ইবনে সালমা সাকাফী তাদের সাহচর্যে এসে তাদের নিকট থেকে আরবী লেখন পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করে। পরে বিশ্র তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'মুজার' এলাকায় চলে যায়। সেখানে আমর ইবনে জরারা ইবনে আ'দাস তার নিকট থেকে আবরী লেখা শেখে। ফলে আমর 'লেখক' পরিচিতি লাভ করে। পরে বিশ্র সিরিয়ায় গমন করে। তথায় বহু সংখ্যক লোক তার নিটক থেকে আরবী লেখা শিখে নেয়। পরে এই তিন জনের নিকট থেকে 'কেলাব' গোত্রের এক ব্যক্তি তা শেখে। সে 'ওয়াদীউল কুরা'র এক ব্যক্তিকে তা শেখায়। সে উপত্যকায় এসে ও তথায় অবস্থান করে অধিবাসীদের কতিপয় ব্যক্তিকে আরবী লেখা শিক্ষা দেয়। অতঃপর আরবে যখন ইসলাম প্রচার শুরু হয়,

---

৫. لغات القرآن ج ١ ، ص ٢٥٧

তখন মাত্র সত্তের ব্যক্তি লিখতে জানত। উমর ইবনুল খাত্তাব ও আলী ইবনে আবু তালিব তাদের মধ্যে ছিলেন।[১]

আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর প্রখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেনঃ

কুরাইশদের আরবী লেখা কোন দূর অতীতের ব্যাপার নয়, খুবই নিকটবর্তী সময়ের ব্যাপার। সে সময়টা রাসূলের যুগের খুবই কাছাকাছি। ইসলাম প্রচারিত হতে শুরু হওয়ার কিছু কাল পূর্বে তারা তার সাথে পরিচিতি লাভ করে।[২]

তিনি এ–ও লিখেছেন যে, বর্ণমালা ও লেখার ব্যাপারটি মানুষেরই কীর্তি বিশেষ।[৩]

আরবী লেখাপড়া সূচনার ইতিহাস যখন এই, এ–ই ছিল তাদের সংস্কৃতি ও মক্কা–মদীনার লোকদের মধ্যে প্রসার লাভের কাহিনী, তখন অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে আর কি ধারণা করা যায়। অবশ্য ইয়াহুদ ও নাসারাদের মধ্যে বিশেষভাবে তাদের পাদ্রী–পুরোহিতদের মধ্যে তার রেওয়াজ ছিল ব্যাপক। তারা তাদের লিখিত কিতাব পড়তে ও লিখতে সক্ষম ছিল। তাদের এই লেখাপড়া আয়ত্ত করার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কেননা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও রীতি–নীতি পালন এছাড়া সম্ভবপরও হতো না।

এই রূপ পরিস্থিতিতে—বিশেষভাবে আহলি কিতাব পরিবেশে—একজনকে 'উম্মী' নামে পরিচিত করার তাৎপর্য ছিল সে লিখতে ও পড়তে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, এতে কি আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে? এ কারণেই কুরআন মজীদে তৎকালীন আরবের সাধারণ মানুষকে যে 'উম্মী লোক' বলে অভিহিত করা হবে, তাও কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। যেমন বলা হয়েছেঃ

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ـ (آل عمران ـ ٢٠)

এবং আহলি কিতাব ও অ–আহলি কিতাব উম্মী লোকদের জিজ্ঞাসা করঃ তোমরা কি আনুগত্য স্বীকার করেছ'?

এই দৃষ্টিতে সূরা আল বাক্বারা'র আয়াতঃ

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ـ (البقرة: ٧٨)

ওদের মধ্যে উম্মী লোক রয়েছে, যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের একমাত্র সম্পদ মনের অমূলক কামনা–বাসনা; ওরা শুধু ধারণা পোষণ করে (এছাড়া আর কিছু করার সাধ্য নেই।) এর তাৎপর্য, যা উপরে আমরা বলে এসেছি, তার সত্যতা ও যথার্থতা অনস্বীকার্য হয়ে উঠে।

১. فتوح البلدان ص ٤٥٧

২. مقدمه ابن خلدون ص ٣٢٩

৩. مقدمه ابن خلدون ص ٣٢٨

আয়াতে 'ওদের মধ্যে' বলতে ইয়াহুদীদের বোঝানো হয়েছে। এতে ইয়াহুদীদের দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি গোষ্ঠী লেখাপড়া জানা লোকদের। অপরটি 'উম্মী' লোকদের, যারা লেখাপড়া জানেনা। ওরা শুধু মনে মনে অমূলক আশা পোষণ করে আর অবাস্তব সব ধারণা মনে স্থান দেয়। এ আয়াতে লেখাপড়া না-জানার কারণে একটি ইয়াহুদী গোষ্ঠীকে 'উম্মী' আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর যে ভাষায় তাদের ধর্মগ্রন্থ নাযিল হয়েছে, সে ভাষায় অজ্ঞতা-মুর্খতা অন্যান্য ভাষার অজ্ঞতা-মুর্খতারই অকাট্য প্রমাণ এবং এটা স্বাভাবিক পরিণতিও।

এই লেখাপড়া না-জানা কিতাবী লোকেরা ঠিক তেমনি উম্মী, যেমন উম্মী আরবরা। এ দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তাই উপরোদ্ধৃত আয়াতে যে ইয়াহুদী জনগোষ্ঠীকে 'উম্মী', বলা হয়েছে, ওরা সেমিটিক ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ওরা ওদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাব পড়তে বা লিখতে অক্ষম ছিল। অনুরূপভাবে আরবরা—বিশেষ করে হযরত মুহাম্মাদ (স) উম্মী ছিলেন, লিখতে ও লিখিত জিনিস পড়তে অক্ষম ছিলেন। নবুয়্যাত লাভের সময় পর্যন্ত তিনি যে লিখতে ও লিখিত জিনিস পড়তে পারতেন না, একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় গেল। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে তাঁকে 'নবী-আল-উম্মী' পরিচয়ে পরিচিত করেছেন। তাঁর 'উম্মী'—'লিখতে ও পড়তে অক্ষম' হওয়ার ব্যাপারটি কিছুমাত্র কল্পিত কিংবা পরে উদ্ভাবিত নয়। মূলতঃই তিনি লেখাপড়া শিখেননি; শেখার কোন পরিবেশ বা সুযোগ কিংবা ব্যবস্থা তিনি পান নি। এই কথায় কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাসূলে করীম (স) উম্মী ছিলেন, পড়তে ও নিজ হাতে লিখতে পারতেন না, তা সত্ত্বেও তিনি কুরআন মজীদের মত একখানি অতুলনীয় কিতাবের ধারক ও বাহক ছিলেন, লোকদেরকে তা পাঠ করে শোনাতেন, এটা ছিল তাঁর নবুয়্যাত ও আল্লাহ্র নিকট থেকে ওহী পাওয়ার অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এই ব্যাপারটিকে একটি অতিবড় 'মু'জিজা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন; বলেছেন, তাঁর সত্যিকারভাবে নবী হওয়ার প্রতি ঈমান আনার জন্য এটাই যথেষ্ট। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ -

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ -

(العنكبوت ٥٠-٥١)

এই লোকেরা বলেছে যে, এই লোকটির ব্যাপারে তার রব্ব–এর পক্ষ থেকে নিদর্শনাদি কেন নাযিল করা হলো না? বলঃ নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্‌র নিকট আর আমি তো শুধু প্রকাশ্যভাবে সতর্ককারী মাত্র। —আর এই লোকদের জন্য কি (নিদর্শন রূপে) এটাই যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার নিকট কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়? বস্তুতঃ এই কিতাবে রহমাত রয়েছে এবং ঈমানদার লোকদের জন্য রয়েছে উপদেশ।

অর্থাৎ উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তোমার প্রতি কুরআনের ন্যায় একখানি কিতাব নাযিল হওয়া স্বতঃই একটা অতিবড় মু'জিজা নয় কি? তোমার রাসূল হওয়ার প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য তা–ই কি যথেষ্ট নয়? এর পরও কি কোন ভিন্নতর মু'জিজা'র প্রয়োজন আছে? অন্যান্য মু'জিজা তো উপস্থিত লোকদের জন্য ছিল; কিন্তু এই মু'জিজা তো সর্বক্ষণ তোমাদের সামনে রয়েছে, প্রতিদিনই তো তা তোমাদের পড়ে শোনানো হয়। আর তোমরা তা যখন ইচ্ছা প্রত্যক্ষ করতে পার।

হযরত মুহাম্মাদ (স) যে 'উম্মী' ছিলেন, তার একটি বড় প্রমাণ হলো, তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী নাযিল হয়, জিবরাঈল (আ) তাঁকে পড়তে বললে তিনি পড়তে পারঙ্গম নন বলে জানিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়শা (রা) থেকে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছেঃ

فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِىْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ـ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ـ

(بخارى، مسلم ـ الجامع لاحكام القران ج ٢٠ ص ١١٨)

হযরত মুহাম্মাদ (স) হেরা গুহায় অবস্থানরত ছিলেন। এই সময় তাঁর নিকট ফেরেশতা জিবরাঈল উপস্থিত হলেন। বললেন, 'পড়'। তিনি বললেন, আমি পড়তে পারঙ্গম নই। বললেন, অতঃপর ফেরেশতা আমাকে জাপটে ধরলেন, বুকের মধ্যে প্রবল চাপ দিলেন, যা আমার জন্য সহ্য–সীমা ছাড়িয়ে গেল। পরে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ পড়। আমি বললামঃ আমি পড়তে সক্ষম নই। তখন তৃতীয় বারেও

আমাকে বুকে ধরে চাপ দিলেন, তাতে আমার সহ্য শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর বললেনঃ 'পড় তোমার সেই রব্ব–এর নাম সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিন্ড দ্বারা। পড়, তোমার রব্ব তো মহা সম্মানার্হ, যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে সেই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ জানতো না। (বুখারী, মুসলিম)

ফেরেশতা রাসূল (স)কে কি পড়তে বলেছিলেন? এই পড়া নিশ্চয়ই মুখস্ত পড়া নয়; ফেরেশতা মুখে বলছিলেন এবং তাঁর সাথে সেই কথাগুলি মুখে উচ্চারণ করতে বলেছিলেন, এমন তো নয়। কেননা সে কাজ তো রাসূলের পক্ষে কেন, কারোর পক্ষেই কঠিন বা অসাধ্য নয়। মুখে মুখে উচ্চারণ করা যে–কোন কালাম যে–কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। যে লেখা পড়া জানেনা, তার পক্ষেও তা খুবই সহজ। ফেরেশতা নিশ্চয়ই কোন লিখিত জিনিস দেখে দেখে পড়তে বলেছিলেন; কিন্তু রাসূল (স) যেহেতু কোন লিখিত জিনিস পড়তে শিখেন নি, তাই তাঁকে জবাবে বলতে হয়েছিল যে, আমি লিখিত জিনিস পড়তে সক্ষম নই। অন্যথায় এরূপ জবাব দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ফেরেশতা যে কোন লিখিত কালাম পড়তে বলেছিলেন, হাদীসের অপর একটি বর্ণনা থেকেও তা প্রমাণিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) ও ইবনে ইসহাক উবাইদ ইবনে উমাইর আল্–লাইসী সূত্রে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ স্বপ্নে দেখছিলাম, জিবরাঈল (আ) এসে রেশমী কাপড়ে লিখিত কোন কালাম দেখালেন, যাতে সূরা আল–আলাক্–এর প্রাথমিক আয়াত ক'টি লিখিত ছিল এবং আমাকে বললেন, পড়। আমি বললাম, আমি পড়া–শেখা লোক নই। পরে তিনি আমাকে বুকে চাপলেন এমনভাবে যে, আমার 'জান' বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। পরে আমাকে বললেন, পড় এবং 'পড়' থেকে 'মানুষ যা জানতোনা' পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াত আমাকে মুখস্ত পড়িয়ে দিলেন। আমি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে মনে হচ্ছিল, সে লেখাটি আমার বক্ষে লিখিত ও অংকিত হয়ে গেছে।' (তাবারী, ইবনে হিশাম, সুহাইলী) ইবনে কাসীর এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে লিখেছেনঃ 'এটা ছিল সূচনা বিশেষ সেই ব্যাপারের, যা নিদ্রাভংগের পর জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল— যার উল্লেখ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

রাসূলে করীম (স)–এর প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হওয়া কালীন হাদীসের এই গোটা বর্ণনা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি বাস্তবিকই লিখিত জিনিস পড়তে ও লিখতে জানতেন না। অর্থাৎ তিনি যথার্থই 'উম্মী' ছিলেন।

---

১. سیرت سرورعالم - مودودی و ابن کثیر ج ۲ ص ۱۳۳

দ্বীনের দাওয়াত প্রচারিত হওয়ার পর?

পূর্ববর্তী কুরআন–হাদীস ভিত্তিক দীর্ঘ আলোচনায় আমরা অকাট্য ও নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করেছি যে, রাসূলে করীম (স) প্রথম ওহী লাভ করার সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ উম্মী ছিলেন, লেখা পড়তে পারতেন না, নিজেও লিখতে পারতেন না। তিনি কোন সময় লিখিত কোন জিনিস পাঠ করেছেন; কিংবা কোন কিছুর উপর কিছু লিখেছেন, নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকেও তার কোন প্রমাণ–ই উপস্থিত করা যায়নি, যেতে পারে না। এই বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন মত–বৈষম্যও কখনও দেখা যায়নি। কেউ কিছু লিখে থাকলেও তা প্রমাণ–ভিত্তিক নয় বলেই তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তা সত্ত্বেও এই আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দানের জন্য আমরা একটি আনুসঙ্গিক প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করতে ইচ্ছা করেছি। প্রশ্নটি হচ্ছে, নবুয়্যাত লাভ করা পর্যন্ত তিনি 'উম্মী' ছিলেন, লিখতে ও পড়তে পারতেন না বা জানতেন না। কিন্তু নবুয়্যাত লাভ করার পর তাঁর তাওহীদী দাওয়াত যখন চারদিকে প্রচারিত হয়েছিল, তখনও কি তিনি উম্মী ছিলেন? তখনও কি তিনি লিখতে পড়তে সক্ষম হন নি?

প্রশ্নটি নিশ্চয়ই জটিল। প্রথমতঃ এই কারণে যে,নবুয়্যাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর উম্মী থাকার কুরআনী যুক্তি স্বীকার করে নেয়ার পর নবুয়্যাত লাভের পরবর্তী জীবনে লেখাপড়া জানার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। তখনও উম্মী থাকা নবুয়্যাত সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে দুর্বোধ্য ও অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে। তখন তাঁর যেমন 'উম্মী' থাকার কোন প্রয়োজন থাকেনা, তেমনি নবুয়্যাত পর্যায়ের দায়–দায়িত্ব পালনের জন্য উম্মী না থাকা নিতান্তই অপরিহার্য ছিল। তাই নবুয়্যাত লাভের পরও তিনি উম্মী ছিলেন, তখনও লেখাপড়া জানতেন না,তা বিশ্বাস করার প্রয়োজন কোথায় এবং তার যৌক্তিকতাই বা কি করে মেনে নেয়া যায়?

বিশেষ করে কয়েকজন প্রখ্যাত তাফসীর লেখক ও হাদীসের বর্ণনাকারী যখন এই মত প্রকাশ করেছেন যে, পরবর্তীতে তিনি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুমতি ও অনুগ্রহক্রমে লেখাপড়া করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তখন আর তিনি 'উম্মী' ছিলেন না। এই মতটা কতটা গ্রহণযোগ্য তা গভীরভাবে ভেবে দেখা একান্তই আবশ্যক।

রাসূলে করীম (স) নবুয়্যাত লাভের পরবর্তীতে লেখাপড়া করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তখন তিনি উম্মী ছিলেন না, এই পর্যায়ে মোট পাঁচটি যুক্তির উলেখ করা হয়েছে। যুক্তিগুলি যথাক্রমে এইঃ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শেষ নবী–রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)কে অত্যন্ত পূর্ণত্বের গুণাবলীতে ভূষিত করেছিলেন। কোন একটি দিক দিয়েও তিনি তাঁকে অপূর্ণ কিংবা বিন্দুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ করে রাখেন নি। সকল প্রকারের গুণ–বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন

এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ। লেখাপড়া জানাও এক বিশেষ গুণ–বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নেই। তাহলে তিনি এই গুণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, একথা কেমন করে মনে করা যেতে পারে?

(২) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শেষ নবী–রাসূল (স)কে স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিচালক (প্রধান) এবং জনগণের পারস্পরিক বিবাদ–বিরোধের বিচারক ও মীমাংসাকারী বানিয়েছিলেন। এজন্য মামলা–মুকদ্দমায় রায় দান, আদেশ বা নিষেধ করা এবং বিচার কার্য শেখা ছিল তাঁর জন্য অপরিহার্য। আর সেকাজ লেখাপড়ার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। লেখাপড়া না জানলে উক্ত কাজগুলি যথার্থ ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই তখন তিনি 'উম্মী' ছিলেন না— লেখাপড়া জানতেন, এই কথা মেনে নেয়া যেমন যুক্তিসঙ্গত, তেমনি অনিবার্যও বটে।

(৩) তিনি যদি লেখাপড়া না জানতেন তাহলে জনগণের অধিকারসমূহ লিখিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। সেজন্য তিনি তা অনুধাবনের জন্য অন্য লোকদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য হতেন। কিন্তু অন্য লোকদের প্রতি তাঁর মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরতা তাঁর পূর্ণত্বের গুণ–বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হওয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই মেনে নিতে হবে যে, তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন।

(৪) আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۔ (الجمعة : ٢)

সেই মহান আল্লাহ্–ই উম্মি লোকদের মধ্যে (তাকে) রাসূল (হিসাবে) পাঠিয়েছেন, যে তাদের সমুখে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, তাদের পরিচ্ছন্ন–পরিশুদ্ধ–প্রবৃদ্ধিপ্রবণ বানায় এবং তাদের কিতাবের শিক্ষা দেয় ও হিকমত শিখায় যদিও এই লোকেরা পূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

আল্লাহ্র বলা—কিতাবের শিক্ষাদান— সেই ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়, যে নিজে লেখা ও লিখিত জিনিস পড়া জানে না। সে লোক কি করে অন্যদের 'হিকমত' শিক্ষা দিবে যে নিজে জানে না 'হিকমত' কি জিনিস?

(৫) শুরুতে যে আয়াতটির ভিত্তিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, নবী করীম (স) না কোন কিতাব পড়তেন, না স্বীয় ডান হাতে কিছু লিখতেন (সূরা আল–আনকাবুত–৪৮), তা ছিল বিশেষভাবে নবুয়্যাত লাভের পূর্ববর্তী অবস্থা। তাই নবুয়্যাত লাভের পরবর্তী অবস্থা সেই আয়াত অনযায়ী–ই ভিন্নতর হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ

নবুয়্যাত লাভের পর তাঁর লেখা ও পড়া উভয় কাজেই পারদর্শী হওয়া জরুরী। অন্যথায় সেই আয়াতটিতে 'নবুয়্যাত বা কিতাব লাভের পূর্বে' বলার কোনই অর্থ হয় না—যদি নবুয়্যাত লাভের পরও লেখাপড়া না জানা অবস্থায়ই তাঁকে থাকতে হয়। যদি নবুয়্যাত লাভের পরও তাঁকে লেখাপড়া জানা থেকে বঞ্চিতই থাকতে হতো তাহলে কথটিতো ভিন্নতর ভাবে ও ভিন্নতর ভাষায় বলা আবশ্যক ছিল। যেমন কাব্য ও কবিতা পর্যায়ে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ـ (يٰسٓ : ٦٩)

এবং আমরা তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি আর তার জন্য তা শোভনও নয়।

তাহলে একথা ধরে নিতে হয় যে, নবুয়্যাত লাভের পর তিনি ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারতেন, তখন আর তিনি 'উম্মী' ছিলেন না।

জবাব

এই পাঁচওটি যুক্তি পর্যায়ে আমাদের বক্তব্য এখানে বলে দিচ্ছিঃ

প্রথমতঃ লেখাপড়া জানা ব্যক্তির পূর্ণত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, সন্দেহ নেই। যে লোক এই গুণ পেয়েছে সে আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ লাভ করেছে, তা অনস্বীকার্য। আর যে লোক তা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, সে আল্লাহ্র এক মহা অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে, তাতেও কোন সন্দেহ করা যায় না। তবে সেই সাথে একথাও অবশ্যই স্বীকার্য যে, জ্ঞান-তত্ত্ব ও তথ্য যে-ব্যক্তিকে শুধু পড়া-শুনার মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়, পড়াশুনার মাধ্যম ছাড়া জ্ঞানার্জনের জন্য যার অন্য কোন উপায় নেই, উপরোক্ত কথা কেবল তার সম্পর্কেই খাটে। কিন্তু যার জ্ঞান-তত্ত্ব ও তথ্য জানার জন্য লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা বা মাধ্যম রয়েছে, তার জন্য সে কথা সত্য হতে পারে না। বস্তুতঃ লেখাপড়া জানার উদ্দেশ্য শুধু নিছক লেখাপড়া জানা-ই নয়, আসল উদ্দেশ্য তো জ্ঞান-তত্ত্ব ও তথ্য অর্জন। এ কথা যদি সত্য হয়—আর কে বলতে পারে যে, এ কথা অকাট্য সত্য নয়।—তাহলে রাসূল করীম (স)-এর পক্ষে লেখাপড়া না-জানা কোনক্রমেই কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার বা তাঁর সার্বিক পূর্ণত্বের দিক দিয়ে একবিন্দু ত্রুটি থেকে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা নবী করীম (স) যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও বিদ্যার কূল-কিনারাহীন মহাসমুদ্র ছিলেন, তা কে অস্বীকার করতে পারে? – অথচ এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, তিনি না নিজে লিখতে পারতেন,না লিখিত জিনিস নিজে পড়তে পারতেন। একথার স্পষ্ট অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে,তিনি উম্মী ছিলেন, কিন্তু মূর্খ ছিলেন না, জ্ঞান বা বিদ্যাহীন ছিলেন ন।

কথা এখানেই শেষ নয়। নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল জ্ঞান পাওয়ার প্রশ্নটি তো মানুষের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের রচিত কিংবা পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থাবলী পাঠ করে নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য বিশ্বাস্য জ্ঞান পাওয়া এবং সেই জ্ঞানকে আল্লাহ্‌র দেয়া জ্ঞান বলে চালিয়ে দিয়ে মানুষকে তার ভিত্তিতে জীবন গঠন ও জীবন যাপন করতে বলা একজন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। এই শতকরা একশ' ভাগ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস্য জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং তা কেবলমাত্র ওহীর মাধ্যমে। হযরত মুহাম্মাদ (স) তো সেই জ্ঞানের–ই অধিকারী ছিলেন। কাজেই তাঁর লেখাপড়া জানার খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিলনা।

তাছাড়া প্রথম নবুয়্যাত লাভ করার পর তাঁর লিখতে–পড়তে পারার ক্ষমতা হওয়াটা তাঁর নবুয়্যাত–পূর্ব উম্মী থাকার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়াও স্বাভাবিক। পূর্বে লেখাপড়া জানা থাকলে যেমন তাঁর নবুয়্যাত ও পেশ করা কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কারণ ঘটতো, পরে লেখাপড়া করতে সক্ষম হলেও ঠিক সেই সন্দেহ থেকে যেত শুধু নয়, আরও ঘনীভূত হয়ে পড়ত। কেননা তাঁর নবুয়্যাত তো সুদীর্ঘ তেইশ বছর পর্যন্ত—অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হওয়ার ব্যাপারটিও সেই অনুপাতে দীর্ঘায়িত। কাজেই কেবল নবুয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বেই নয়, তাঁর সারা জীবন উম্মী থাকাই তাঁর নবুয়্যাতের সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল।

দ্বিতীয়তঃ লেখাপড়া জানা মানুষের বৈশিষ্ট্য পর্যায়ে যা বলা হয়েছে এবং রাসূলে করীম (স)–এর উপর যে মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা যথাযথ পালনের জন্য লেখাপড়া জানার অপরিহার্যতা পর্যায়ে যে যুক্তি দেয়া হয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সমস্ত নবী–রাসূল সহ গোটা মানবতার উপর যে বিশেষত্ব ও ফযীলত দিয়েছেন, তাঁর জন্যই তাঁর সারা জীবন উম্মী থাকা বাঞ্ছণীয় ছিল। তাঁর এই উম্মী থাকাটা একবিন্দু বাধা বা অসুবিধার কারণ হয়নি। এটা তাঁর পূর্ণত্বেও কোন ত্রুটি বা কমতি (نقص) দেখা দেয়নি; বরং সত্যি কথা হচ্ছে, তাঁর উম্মী থাকা তাঁর জন্য অধিক মর্যাদার (شرف) ও বিরাট গৌরবের (فخر) ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'উম্মী' হওয়াটা কোন ত্রুটি বা অ–বৈশিষ্ট্যের কারণ হয় বটে তবে তা অন্য লোকদের জন্য, তাঁর জন্য নিশ্চয়ই নয়।

তৃতীয়তঃ 'কিতাব ও হিকমত–এর শিক্ষা দান' তাঁর দায়িত্বভুক্ত ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত—পাঠ ও ব্যাখ্যা দান—তথা শিক্ষা দানের জন্য অন্য লোকদের পক্ষে লিখিত গ্রন্থ পড়ার প্রয়োজন হলেও রাসূলে করীম (স)–এর জন্য নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ছিলনা। কেননা হযরত জিবরাঈল যখন তাঁকে কুরআনের

আয়াত শোনাতেন,তখন তিনি যেমন তা সঙ্গে সঙ্গেই মুখস্থ করে ফেলতেন, তেমনি স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর জন্য কুরআন মুখস্থ করার যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তা তিনি নিজেই বলেছেনঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى۔ (الاعلیٰ - ۶)

আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব। অতঃপর তুমি কখনই ভুলে যাবে না।

রাসূলে করীম (স)–এর এই কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দানের মধ্যে নিশ্চয়ই লোকদেরকে বর্ণ–জ্ঞান ও লেখন শিক্ষাদান অন্তর্ভূক্ত ছিল না সরাসরি তাঁর নিজের দায়িত্ব হিসাবে। সে কাজ তিনি নিজে করেছেন এমন কথা কোন সাহাবী বলেন নি, কোন ইতিহাসেও তা বলা হয়নি; বরং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব এবং তিনি বাস্তবভাবে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। একথা তো সকলেরই জানা যে, তিনি প্রথম বদর যুদ্ধে বন্দী লোকদের দ্বারা মদীনার মুসলমানদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, বন্দীদের মুক্তির জন্য এই কাজকে তিনি শর্ত করে দিয়েছিলেন।[১] ফলে যখন একজন বন্দী দশটি বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দান সম্পূর্ণ করত, তখন সে এর বিনিময়ে মুক্তি পেয়ে যেত। রাসূলে করীম (স) এমনি ভাবেই মুসলিম জনতাকে অশিক্ষা বা লেখাপড়া না জানার অন্ধকার থেকে মুক্তি দানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন।

আয়াতের (مِن قَبْلِهِ) 'নবুয়্যাতের পূর্বে' উম্মী থাকার কথা দ্বারা তার বিপরীত অর্থ হিসাবে যে বলা হয়েছে যে, নবুয়্যাত লাভের পর আর তিনি উম্মী ছিলেন না, এর জবাব আমরা এখানেই দিচ্ছি।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, জীবনের চল্লিশ বরং পঞ্চাশটি বছর পর্যন্ত যে লোক উম্মী থাকলেন, তাঁর সম্পর্কে তো একথাই ধারণাযোগ্য যে, তিনি জীবনের অবশিষ্ট—বরং শেষ অংশটুকুতেও সেই উম্মী–ই ছিলেন। কেননা নবুয়্যাত লাভের পর তাঁকে যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যে কঠিন দায়িত্ব পালনে তাঁকে দিন–রাত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, হাড়ভাংগা পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তাতে তখন তিনি লেখাপড়া শেখার কাজে মনোযোগ দিয়েছিলেন, সুস্থ মস্তিষ্কের কোন লোকের পক্ষে তা কল্পনাও করা সম্ভব নয়। কাজেই مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ 'তার (নবুয়্যাতের) পূর্বে তুমি পড়তে (পারতে) না' কথা থেকে তার বিপরীত—'নবুয়্যাতের পর তুমি লিখতে পড়তে'—গ্রহণ করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না, বাস্তব অবস্থার সাথেও সেকথার কোন সম্পর্ক নেই।

---

(১) উমর আবুন–নসর তাঁর العرب নামের গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ লেখাপড়া জানা প্রত্যেক বন্দীর উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মদীনার দশটি বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দানের। ফলে বন্দীদের বসবাস স্থান মদীনার বালকদের পাঠশালায় পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা নবুয়্যাত লাভ ও দ্বীনী দাওয়াতের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভের পর নবী করীম (স) লেখাপড়া শিখে ফেলেছিলেন, তখন আর তিনি উম্মী ছিলেন না—এই কথা কোন দিক দিয়েই প্রমাণিত হয় না, প্রমাণ করা সম্ভবও নয়।

ডঃ আবদুল লতীফ ও অন্যান্যরা নবুয়্যাত লাভের পর নবী করীম (স) লেখাপড়া শিখেছিলেন এই কথা প্রমাণের লক্ষ্যে অপর একটি আয়াতাংশ পেশ করেছেন। সে আয়াতটি হচ্ছেঃ

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً - فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ - (البينة : ٢-٣)

সে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিয়োজিত একজন রাসূল। সে পবিত্র সহীফা পাঠ করে শুনায়, যাতে সম্পূর্ণ শাশ্বত ও সঠিক লেখাসমূহ শামিল রয়েছে।

বলতে চেয়েছেন যে, রাসূলে করীম (স) লিখিত সহীফা পাঠ করে শোনাতেন বলে এ আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা-ই প্রমাণ করে যে, তিনি পূর্বে উম্মী থাকলেও নবুয়্যাত লাভের পর নিশ্চয়ই লিখিত জিনিস পাঠ করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। নতুবা তিনি 'পবিত্র সহীফা' পাঠ করে শোনান—একথা বলা যেতে পারে কেমন করে? সহীফা বলতে তো লিখিত জিনিসই বুঝায়?

আমরা বলব, 'পাঠ করে তিনি শুনান' একথা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু লিখিত জিনিস দেখে দেখে যেমন পাঠ করা যায়, তেমনি লিখিত কোন কিছু দেখে-না-পড়েও স্মৃতিশক্তির বলে মুখস্থও তা পাঠ করা সম্ভব। কেননা নবী করীম (স) তাঁর গোটা নবুয়্যাতী জীবনে কখনও কোন লিখিত জিনিস পড়েছেন, কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে নিয়োজিত লেখকগণের দ্বারা লিখিত হওয়া সত্ত্বেও সেই লিখিত জিনিস তিনি কখনও পাঠ করেছেন, এর কোন উল্লেখই কোথাও নেই। যখনই তিনি কুরআন তেলাওয়াত করেছেন, মুখস্ত—স্মৃতিশক্তি থেকে করেছেন। যে 'পবিত্র সহীফা' তেলাওয়াত করার কথা উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, তা বস্তুগতভাবে লিখিত সহীফাই হতে হবে, মুখস্থ পাঠ করা হলে তা 'সহীফা' পাঠ হবে না, এমন কথা তো বলা যায়না। তা ছাড়া আল্লাহ্ নিজেই যখন 'পবিত্র কালাম' পড়িয়ে দেয়ার কথা বলেছেন, এমনভাবে পড়িয়ে দেয়া যে, অতঃপর তিনি তা কখনই ভুলে যাবেন না—অর্থাৎ সব সময় সমস্ত কুরআনই তাঁর মুখস্থ থাকবে, এর পরও তাঁর লিখিত কুরআন দেখে পাঠের কথা বলা কি কখনও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে?

আল্লামা জামাখশারী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ সুস্পষ্ট আয়াতটি নাযিল করে তাঁর রাসূলকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিবরাঈল তাঁকে কুরআনের ওহী এমনভাবে পড়িয়ে দিবেন যে, তিনি নিজে লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও তা মুখস্থ করে ফেলবেন, কখনই ভুলে যাবেন না। আর মহান আল্লাহ্‌র

পক্ষে এ কাজ কিছুমাত্র কঠিন ছিলনা। ফলে পরবর্তী কালে তাঁর কখনও লেখাপড়া করতে সক্ষম হওয়ার ও উম্মী না–থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কেউ কেউ সূরা আল–ফুরকান–এর এ আয়াতটিকে ভিত্তি করে বলতে চেয়েছেন, নবী করীম (স) লিখতে জানতেন। আয়াতটি এইঃ

وَقَالُوْا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا ـ (الفرقان: ٥)

ওরা বলে, এ তো আগের কালের লোকদের রচিত জিনিস, যা এই ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) নকল করিয়ে লয়, আর তা সকাল–সন্ধ্যা তাকে পাঠ করে শোনানো হয়।

অর্থাৎ মুশরিকদের অভিযোগ ছিল, কুরআন নামে যা কিছু শুনানো হচ্ছে, আসলে তা পৌরাণিক কথাবার্তা। মুহাম্মাদ তা লিখে নিয়েছে; নিজে থেকে নয়, অন্য লোকদের লেখানোর মাধ্যমে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি ওহী লাভের পর লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই কুরআন তিনি লিখে রাখেন। লিখতে জানা তো পূর্ণত্বের একটি গুণ বিশেষ। বিরোধীরা তাঁর উপর এটা নিশ্চয়ই মিথ্যামিথ্যি ও মনগড়াভাবে আরোপ করেনি। তাহলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি অবশ্যই লিখতে পারতেন।[১]

কিন্তু এই প্রমাণ একেবারেই যাচ্ছে–তাই। লিখতে পারা নিশ্চয়ই পূর্ণত্বের একটি গুণ, কিন্তু শত্রুদের এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারত যদি তা স্বার্থ ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত না হতো। ওরা তো নবী করীম (স)–এর নবুয়্যাতকেই অস্বীকার করত, সেই অস্বীকৃতির ভিত্তি হিসাবেই তারা এই রূপ কথা বলত। কাজেই তাদের এই গুণ আরোপকে যথার্থ ও সত্য–ভিত্তিক মনে করা যেতে পারে না। ওরা যখন নবী করীম (স)–এর নবুয়্যাতকে মিথ্যা ও মনগড়া প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন ভিন্ন পথে আক্রমণ করার জন্য তারা এই পথ ধরেছিল। এই পথে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নবী করীম (স)–এর নবুয়্যাতের ব্যাপারে সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা। তারা বলতে শুরু করে দিল, কেউ–না–কেউ এমন আছে, যা তাকে সকল–সন্ধ্যা এই কুরআন লিখিয়ে দেয়। আর সে তা লিখে রাখে এবং তা–ই লোকদেরকে 'ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র কালাম' নামে শুনায়। তাঁর নবুয়্যাত ও তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র কালাম নাযিল হওয়ার ব্যাপারে লোকদের মনে সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা এইরূপ কথা বলতে শুরু করেছিল।

তাছাড়া ব্যবহৃত শব্দ اكتتبها এ–ও বুঝায় যে, তিনি অন্য লোক দ্বারা লেখাতেন, অন্য লোককে লিখে দিতে বলতেন। ইমাম রাজী শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাষায়ঃ

---

১. تفسير الايات المتشابهات ص: ٤٧-٤٨

انّهٗ امرَ انْ يّكتبَ لهٗ ـ

তিনি তাঁর জন্য লিখে দিতে অন্য কাউকে আদেশ করতেন।[১]

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ভিত্তিতে যারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, রাসূলে করীম (স) পরবর্তী কালে লিখতে-পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন, এ পর্যন্তকার আলোচনার মাধ্যমে আমরা তাদের বক্তব্যের কুরআন-ভিত্তিক জবাবই দিয়েছি। কাজেই অতঃপর এ পর্যায়ের আর কোন কথা অবশিষ্ট রয়েছে বলে আমরা মনে করিনা।

অবশ্য সাধারণ যুক্তি ও কোন কোন হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে এই পর্যায়ে বলা আরও কিছু কথা থেকে গেছে, যেগুলির জবাব একটি একটি করে আমরা এখানে পেশ করছি।

যুক্তি ও হাদীস—ভিত্তিক বিভ্রান্তি ও তার জবাব

১. আল-মজলিসী পরিচয়ের এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) লিখিত জিনিস পাঠ করতে ও লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর এক বিশেষ মু'জিজা হিসাবে। তিনি প্রাথমিক কালের ও শেষের দিকের সকল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরবী অক্ষরের সাহায্যেই সেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লিখিত হয়ে আছে। আর যে লোক আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে চন্দ্রকে দীর্ণ করতে বা তার চাইতেও বড় ও কঠিন কাজ করতে সক্ষম ছিলেন, তিনি কি আর সামান্য অক্ষর সংযোজনে লেখাপড়া করতে অক্ষম থাকতে পারেন? — তা তো বিশ্বাস্যই মনে হয়না।

এর জবাবে আমরা বলব, রাসূলে করীম (স) সম্পর্কে এ আবেগ ও উচ্ছাসের কোন মূল্য আল্লাহ্ দিবেন কিনা, তিনিই জানেন। তবে সব আবেগ-উচ্ছাস তো আর বাস্তব-ভিত্তিক হয় না। কল্পনার ফানুস যত উর্ধ্বে উড়ে যাক, বাস্তবতার সাথে তার সম্পর্ক থাকতেই হবে, এমন তো কিছু লেখা-জোখা নেই।

২. কেউ কেউ বলেছেন, মুশরিকরা তাঁকে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদার, যাদুকর, মজনুন, মিথ্যাভাষী ইত্যাদি নানা দোষে অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু তারা কখনও বলেনি যে, নবী একজন উম্মী লোক, লেখাপড়ার মত সাধারণ গুণ থেকেও বঞ্চিত। বিশেষ করে শীত ও গ্রীষ্ম কালে যে ব্যবসায়ীরা দূর দেশে যাত্রা করত,তাদের মধ্যের একজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি লেখাপড়া জানবেন না, তা তো হতেই পারেনা। মুশরিকরা যখন

---

১. مفاتيح الغيب ج ٢، ص ٣٥٣.

তাঁকে 'উম্মী' বলে দোষী সাব্যস্ত করেনি, তখন অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই উম্মী ছিলেন না—অন্ততঃ নবুয়্যাত লাভের পর ।[১]

এর জবাবে প্রথমতঃ বলব, মুশরিকরা তাঁকে উম্মী বলে দোষযুক্ত করেনি হয়ত একারণে যে,উম্মী হওয়া —বিশেষ করে তদানীন্তন আরব সমাজ–পরিবেশে—হয়ত কোন দোষের ব্যাপার বলেই তারা মনে করেনি। রাসূলে করীম (স)–কে উম্মী বলে অভিযুক্ত করলে তারা নিজেরাও সে দোষ থেকে মুক্ত প্রমাণিত হতো না।

দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়ের জন্য লেখাপড়া জানা একটা জরুরী গুণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সভ্যতার আলোকোদ্ভাসিত দুনিয়ার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তৎকালিন সভ্যতা–বঞ্চিত সমাজে ব্যবসায়–বাণিজ্যের জন্য লেখাপড়া জানা কোন অপরিহার্য গুণ ছিল না বিশেষ করে যে কুরাইশদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীয় ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশ যাত্রার কথা বলা হয়েছে, তারা পূর্ণ সাফল্য সহকারে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা'র কাজ সম্পন্ন করত; কিন্তু ওরাই তো ছিল লেখাপড়া না জানা লোক।

প্রখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ المبسوط। এ লেখা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বিশেষভাবে চারটি জিনিস দিয়েছিলেন, তাঁকে চারটি নৈতিক গুণে ভূষিত করেছিলেন। তা হলো ঃ ওয়াজিব, নিষিদ্ধ, মুবাহ ও মকরূহ। তাঁর প্রতি নিষিদ্ধ গুণসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে লেখা এবং লিখিত জিনিস পড়া, কবিতা বলা ও কবিতার শিক্ষাদান।[২]

মৃত্যু শয্যায় কিছু লেখার জন্য দোয়াত—কলম আনতে বলা

১. হাদীসে সহীহ ও সুনান গ্রন্থসমূহে এবং রাসূলে করীমের সীরাত গ্রন্থসমূহে ব্যাপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে— বিশেষ করে বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছেঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স)–এর মুমূর্ষ অবস্থায় ঘরে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন,তাদের মধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)ও ছিলেন। এই সময় রাসূলে করীম (স) বললেনঃ 'দোয়াত–কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের জন্য এমন একটি লেখন লিখে দেব, যার পর তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবেনা'। তখন উমর (রা) বললেনঃ নবী করীম (স) ব্যথার যন্ত্রণায় অস্থির। আর আমাদের নিকট কুরআন রয়েছে, তা–ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর দোয়াত–কলম এনে তাঁকে কিছু লিখতে দেয়া নিয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়—।

---

১. تفسير الايات المتشابهات ص ٥٠

২. المبسوط اوائل كتاب النكاح ج ٤، ص ١٥٢-١٥٣

এই বর্ণনাটির ভিত্তিতে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, রাসূলে করীম (স) নিজে লিখতে না জানলে তিনি কেন বলবেন—কেমন করে বলতে পারলেন যে, 'আমি একটি লেখন (كتاب) লিখে দেব'?

আমরা বলব, রাসূলে করীম (স)-এর কথার ভুল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর এই কথা তো শাসনকর্তা-রাষ্ট্র প্রধান-রাজা-বাদশাহ ইত্যাদি পর্যায়ের কথা। এরা নিজেরা কখনই কিছু সাধারণতঃ লেখেন না। লোকের দ্বারা লেখান। নবী করীম (স) এর কথা اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا 'আমি তোমাদের জন্য একটি লেখন লিখে দেব'-এর অর্থ নিশ্চয়ই এ হতে পারে না যে, তিনি নিজেই—নিজের হাতে লেখাটি লিখবেন। নিয়মানুযায়ী তিনি হয়ত লিখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং দোয়াত-কলম তাঁর সমুখে নিয়ে আসা হলে নিশ্চয়ই বলতেনঃ লেখ, আমি বলছি। কেননা তিনি সারাজীবন তা-ই করেছেন। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ-শাসনকর্তাদের নিকট তিনি যে চিঠিপত্র বা ফরমানাদি পাঠিয়েছিলেন, তার কোনটাই তিনি নিজ হাতে লিখেননি, সবকয়টিই লেখকদের দ্বারা লিখিয়েছেন। মৃত্যু শয্যায় শায়িত ও যন্ত্রণায় অস্থির থাকা অবস্থায় তিনি নিজ হাতে কিছু লিখবেন তা কল্পনাও করা যায়না।

অতএব এই বর্ণনার ভিত্তিতে যা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে, তা আদৌ প্রমাণিত হয়না।

২. হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লেখা পর্যায়েও কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। সন্ধিপত্রে হযরত মুহাম্মাদ 'রাসূলুল্লাহ' লেখা হলে কুরাইশদের পক্ষ থেকে তার উপর আপত্তি জানিয়ে বলা হলো, মুহাম্মাদ-এর 'রাসূলুল্লাহ' হওয়া নিয়েই তো আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের আসল কারণ। আমরা যদি তাঁকে 'রাসূলুল্লাহ' মেনে নিতাম, তাহলে আজ এই সন্ধিপত্র লেখার কোন প্রয়োজনই দেখা দিতনা। একথা বলে তারা শুধু মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ লেখার দাবি জানাল। তখন রাসূলে করীম (স) তাতেই রাযী হয়ে সন্ধিপত্রের লেখক হযরত আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ কথাটি মুছে ফেল। তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন[১] তখন

اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَاضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ -

রাসূলে করীম (স) লেখাটি নিজ হাতে নিয়ে নিলেন—তিনি ভালো লিখতে পারতেন না—তা সত্ত্বেও তিনি লিখলেনঃ এ সেই সন্ধিপত্র যা আবদুল্লাহ পুত্র মুহাম্মাদ ফয়সালা করে দিয়েছেন ———

১. صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب الصلح

এই বর্ণনার বাহ্যিক তাৎপর্যকে ভিত্তি করে বলা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (স) নিজ হাতে লিখলেন, এর অর্থ, তিনি লিখতে সক্ষম ছিলেন, যদিও খুব ভালো লিখতে পারতেন না।

ইবনে দাহ্ইয়া (ابن دحيه) উল্লেখ করেছেন, এই বর্ণনার ভিত্তিতে ইবনে আবু শাইবা ও আমর ইবনে শুবাতা মুজাহিদ সূত্রে আওন ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

مَامَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَتَبَ وَقَرَأَ ـ

রাসূলে করীম (স) মৃত্যুর পূর্বে লিখতে ও লেখা পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুজাহিদ বলেছেন, আমি শা'বী (شعبى) কে একথা বললে তিনি বললেনঃ হ্যা, সত্য কথা। একথা যারা বলেন, তাঁদের নিকটও আমি তাই শুনেছি।[১]

কিন্তু এই বর্ণনাটির এরূপ অর্থ আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অপরাপর বর্ণনায় এই কথাগুলি বর্ণিত হয়েছেঃ 'রাসূলে করীম (স) বললেনঃ اَرِنِىْ اِيَّاهَـــا 'আমাকে লেখাটি দেখাও'। একটি বর্ণনার ভাষা, রাসূল বললেন اَرِنِىْ مَكَانَهَـــا 'আমাকে সে স্থানটি দেখাও'।[২]অপর একটি বর্ণনার ভাষা হলো فَضَعْ يَدِىْ عَلَيْهَـــا 'আমার হাত সেই স্থানটির উপর রাখ' (যেখানে রাসূলুল্লাহ লেখা হয়েছে)।

তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ কোন স্থানে লেখা হয়েছে তা তিনি নিজে পড়ে নির্দিষ্ট করতে পারেন নি। তিনি হযরত আলী (রা)কে সেই স্থান দেখিয়ে দিতে কিংবা সেই স্থানে তাঁর হাত ধরে রেখে দিতে বললেন, যেন তিনি নিজে তা মুছে দিতে পারেন। কার্যতঃও তা–ই হয়েছিল।

আমাদের এই কথা কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী কর্তৃক সমর্থিত। আল্লামা ইবনে হাজার আল–আসকালানী বলেছেনঃ হাদীসের কথা, 'তিনি লেখনটি ধরলেন' এটার বাস্তব রূপ হচ্ছে, 'আমাকে স্থানটি দেখিয়ে দাও' এই কথার। অর্থাৎ হযরত আলী (রা) যা মুছে ফেলতে রাযী হন নি সেই স্থান দেখিয়ে দিতে বললেন লেখনটি ধরে। এর পর যে বলা হয়েছে,'অতঃপর তিনি লিখলেন— فكتب , এখানে একথা উহ্য আছে। তাহলো, স্থানটি দেখিয়ে দেয়ার পর রাসূল (স) নিজে তা মুছে দিলেন; অতঃপর হযরত আলী (রা) লিখলেন।

---

১. فتح البارى ج ١٠ ص ٤٤

২. صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب الصلح

প্রখ্যাত মনীষী ইবনুত্‌তীন(ابن التين) এই ব্যাখ্যার উপর দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ كتب (লিখলেন) অর্থ, أمر بالكتابة 'লিখতে আদেশ করলেন'। এ কথাতো সেই রকমই; যেমন হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে লেখা হয়েছেঃ কাইজার–এর নিকট লিখেছেন' 'কিসরার নিকট লিখেছেন'। কেননা কাইজার বা কিসরা কারোর নিকটই তিনি নিজ হাতে কখনই কিছু লিখেন নি।

প্রখ্যাত সীরাত রচয়িতা আল–হালবী (الحلبي) বলেছেনঃ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে অনেকে বলেছেন যে, হুদাইবিয়ার দিন রাসূলে করীম (স) লিখেছিলেন, এটা তাঁর একটি মু'জিজা। কেননা তিনি তো লিখতে–পড়তে পারতেন না। মালেকী মযহাবের আবুল অলীদ আল–বাজী এই মত প্রকাশ করলে আন্দালুসের সব আলেম তাঁকে তিরষ্কার করেন এবং বলেন, 'এইমত কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী;' হালবী শেষ পর্যন্ত লিখেছেন যে, 'তিনি নিজ হাতে লেখাটি গ্রহণ করলেন, পড়ে লিখলেন' কথাটি পরোক্ষভাবে বলা। এর অর্থ 'তিনি লেখককে লিখতে বললেন।'[১]

হুদাইবিয়ার এই ঘটনাটি আরও দুই ধরনের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে।

প্রথম, রাসূলে করীম (স) আলী (রা)–কে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেলতে আদেশ করলেন। তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন। তখন রাসূল (স) বললেনঃ 'আমাকে দেখাও' (কোথায় লিখেছ)। তিনি দেখালেন। তখন নিজ হাতে তিনি তা মুছে দিলেন। অতঃপর আলী (রা)–কে আদেশ করলেন ওই শব্দটি বাদ দিয়ে লিখতে। ভাষা হচ্ছেঃ

أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلِيًّا أَنْ يَكْتُبَ -

রাসূলে করীম (স) আলীকে লিখবার জন্য আদেশ করলেন।

বুখারীর উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বাহ্যতঃ যদিও মনে হয় যে, রাসূলে করীম (স) নিজে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেলেছিলেন, অতঃপর 'ইবনে আবদুল্লাহ' (আবদুল্লাহ পুত্র) নিজেই লিখেছিলেন; কিন্তু বুখারীরই অপর স্থানে বর্ণিত ভাষা থেকে আমাদের কথাটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। মনে হয়, বুখারীর كتاب الصلح তে উদ্ধৃত বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ ভাষা দেয়া হয়েছে। নতুবা كتاب الجزية তে যে ভাষা রয়েছে, তাতে আমাদের কথাই ধ্বনিত হচ্ছে। এ বর্ণনাটি বারাআ ইবনে আজেব থেকে এসেছে। বর্ণনাটির তরজমা এই দাঁড়ায়ঃ 'ওরা (কুরাইশরা) বললঃ 'আমরা যদি মানতাম–ই যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তাহলে আজ আপনাকে বাধা দিতাম না। বরং আমরা আপনার হাতে বায়আত করতাম। কাজেই লিখুনঃ এই যা লেখা হয়েছে তা আবদুল্লাহ পুত্র মুহাম্মাদের ফয়সালা।— পরে তিনি আলী (রা)–কে বললেনঃ

১. السيرة الحلبية ج ٣ ص ٢٤ وسيرة زيني دحلان .

'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা) বললেনঃ আমি কক্ষণই মুছবো না'। তখন রাসূল বললেন, 'আমাকে শব্দটি দেখিয়ে দাও।' তিনি দেখালে তা নিজ হাতে মুছে দিলেন।[১]

আল্লামা আমীনুল ইসলাম তাবরাসী তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে ও তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণনাই উদ্ধৃত করেছেন বিস্তারিতভাবে।

অতএব, এই দীর্ঘ আলোচনার সার-নির্যাস হিসাবে বলা যায়, রাসূলে করীম (স) সারা জীবন উম্মী ছিলেন। তিনি নিজে লিখতে বা লিখিত জিনিস নিজে পড়তে সক্ষম ছিলেন না। কুরআন মজীদে তাঁকে 'নবীয়েল উম্মী (النبي الامي) বলা হয়েছে। তাঁর এই পরিচিতি সর্বতোভাবে সত্য। জীবনের সূচনা কাল থেকে নবুয়্যাত লাভ পর্যন্ত এবং নবুয়্যাত লাভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উম্মী ছিলেন। এর ব্যতিক্রম কখনই ঘটেনি।

---

১. صحيح البخارى، كتاب الجزية والموادعة مع اهل الحرب ج، ص

কুরআনে গায়বী ইল্‌ম

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে 'গায়েব' (الغيب) শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আমরা মনে করি, এই শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিশেষ করে এজন্যও যে, 'গায়ব'–এর প্রতি ঈমান মৌল ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মূলতঃ 'গায়ব' বলতে বুঝায় কোন জিনিসের লোক চক্ষুর আড়ালে থাকা। পরে যা কিছুই দৃশ্যমান নয়, যা মানুষ দেখতে পায়না—যা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানেনা, তা–ই 'গায়ব' বলে অভিহিত হতে থাকে।

যেমন বলা হয় غابت الشمس সূর্য গায়েব হয়ে গেছে, চোখের আড়ালে চলে গেছে, দেখা যায়না—অর্থাৎ অস্ত গেছে।

কুরআন মজীদে হযরত ইউসুফ (আ)–এর কিস্‌সায় বলা হয়েছেঃ

وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ -

এবং ইউসুফকে কোন অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর।

'গায়ব' মূল শব্দ থেকেই غَيَابَةٌ বানানো হয়েছে। অর্থ হচ্ছে 'অন্ধকার'। গভীর নিবিড় জংগলকে বলা হয় غَابَةٌ কেননা সে ধরনের জংগলে সবকিছুই অদৃশ্য হয়ে যায় ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের দরুন[১]

ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ الغيب মূল শব্দ। এ থেকেই বানানো হয় غابت যেমন غابت الشمس বলা হয় যখন সূর্য চোখের আড়ালে চলে যায়, অস্ত যায়—অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে। কেউ কোথায়ও অনুপস্থিত থাকলে সে অদৃশ্য থাকে বলেই বলা হয়- غاب 'সে গায়েব হয়ে গেছে।' কুরআন মজীদে বলা হয়েছে أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ 'কিংবা সে অনুপস্থিতদের মধ্যের একজন'? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যা মানুষের জ্ঞানের আওতার বাইরে, তাকেও গায়ব বলা হয়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ - (النمل : ٧٥)

---

১. مقاييس اللغة ج ٤، ص ٤٠٣

আসমান ও যমীনে কোন গোপন জিনিসই এমন নেই যা স্পষ্ট কিতাবে লিখিত অবস্থায় বর্তমান নেই।

এ কারণে বলতে হয়, কোন কিছু 'গায়ব' বা 'গায়েব হওয়ার' ব্যাপারটি কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে; আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে গায়ব—অদৃশ্য বা অজ্ঞাত বলতে কিছুই নেই, কিছুই থাকতে পারেনা তাঁর অগোচরে। এ কারণেই তাঁর পরিচিতিতে বলা হয়েছেঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

তিনি গায়ব ও উপস্থিত—অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমান—সর্ববিষয়েঅবহিত।

অর্থাৎতোমাদের—হে মানুষ—যা কিছু গায়ব আর যা কিছু তোমরা প্রত্যক্ষ দেখছ, সেই সবকিছুই তাঁর ইল্‌ম–এর আওতাধীন। আর এ কারণেই মানুষ যা প্রত্যক্ষ দেখতে পায়না—যা কিছু তাঁর নিকট গায়েব, তার প্রতি ঈমান আনা ঈমানের শর্ত। বলা হয়েছেঃ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرة - ٣)

মুত্তাকী—প্রকৃত দৃঢ় ঈমানদার যারা, তারা গায়ব–এর প্রতি ঈমান রাখে।

মানুষের নিকট যা 'গায়ব' অর্থাৎ যা মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর নয়, যা চিন্তাশক্তি বা বিবেক–বুদ্ধির আওতায় আসে না, মানুষ যা কেবল নবী–রাসূলগণ প্রদত্ত খবরের মাধ্যমেই জানতে পারে, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ঈমানের মৌলিক অংশ। তাকে সত্য বলে বিশ্বাস না করলে—মেনে না নিলে কোন লোকই 'ঈমানদার' হতে পারে না।[১]

'গায়ব' 'শহদ' (شـهـود)—প্রত্যক্ষদর্শন–এরবিপরীতঅর্থজ্ঞাপকশব্দ। যাকিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়, ইন্দ্রিয়ের আওতা–বহির্ভূত, তা–ই 'গায়ব'। তা বস্তুগত জিনিস হোক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হোক,—যেমন অতীত ও বর্তমান কালের বাস্তব ঘটনাবলী, যা সংবাদদাতারও ইন্দ্রিয়–বহির্ভূত; কিংবা হোক ইন্দ্রিয়াতীত। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, পরকালীন পুনরুত্থান, হিসাব–নিকাশ, শিংগার ফুক, আমল ওজনের দাঁড়িপাল্লা, আল্লাহ্‌র ফেরেশতাকুল, জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকার, পরকালীন জীবনের নিগূঢ় সত্যতা ও বাস্তবতা, ওহী, নবুওয়্যাত—ইত্যাদি যে সব বিষয়ে ঈমান আনা ও পরম সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়া কর্তব্য, সে সবই গায়ব। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ

---

১. مفردات امام راغب ص ٣٦٦-٣٦٧

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - (البقرة : ٣-٤)

যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে ও আমাদের দেয়া রিয্ক থেকে ব্যয় করে এবং যারা তোমার প্রতি নাযিল হওয়া ও তোমার পূর্বে নাযিল হওয়া সব কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে এবং পরকালের প্রতি রাখে দৃঢ় প্রত্যয় (তারাই মুত্তাকীন)।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 'গায়ব' দু'প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে নিরংকুশ গায়ব আর দ্বিতীয় প্রকার আপেক্ষিক গায়ব। নিরংকুশ গায়ব বলতে বুঝায় তা, যা কস্মিন কালেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না, যা বস্তুগত যন্ত্রপাতি বা উপায়-উপকরণ দ্বারাও প্রত্যক্ষ করা যায় না—যা কোনক্রমেই ইন্দিয়ের আওতাধীন হবার নয়, হওয়া সম্ভবপরও নয়। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, তাঁর পবিত্র গুণাবলী ইত্যাদি, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর 'আপেক্ষিক গায়ব'-এ ক্ষেত্র, পরিবেশ ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য ঘটে। একটি জিনিস কোন কোন ক্ষেত্রে ও পরিবেশে গায়ব হলেও অন্য ক্ষেত্রে ও পরিবেশে তা 'গায়ব' না-ও হতে পারে। আবার কোন কোন ব্যক্তির জন্য যা গায়ব,অন্য ব্যক্তির জন্য তা 'গায়ব' না-ও হতে পারে।

যেমন শুক্রকীট; অতীতে তা 'গায়ব'—অদৃশ্য বা অগোচরীভূত ছিল। বর্তমানে তা নয়। কেননা তা যতই সূক্ষ্ম হোক, বর্তমানে তা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। বর্তমান বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিতে তা আর 'গায়ব' থাকেনি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসে পরিণত হয়েছে। তবে তা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। এই যন্ত্রের বাইরে তা এখনও 'গায়ব'। অনুরূপভাবে সৌর লোকের নানা স্থানে অবস্থিত অনেক অবয়ব এবং এই পৃথিবীরও অনেক সূক্ষ্ম জিনিস কেবল অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রেই ধরা পড়ে, তার বাইরে এখনও তা 'গায়ব'ই রয়ে গেছে। কেননা সাধারণ খোলা চোখে তা দৃষ্টিগোচর হয়না। অথবা আকাশ রাজ্যের তারকারাজি, রাতের বেলা নীল অম্বরে ঝক্‌ঝক্ করলেও দিনের বেলা সূর্যের চোখ ঝলসানো আলোতে তা খোলা চোখে দেখা যায় না।

আল্লামা তাবাতাবায়ী লিখেছেনঃ যে সব জিনিস ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, ইন্দ্রিয়ের আওতার মধ্যে যা ধরা পড়ে না, তা 'গায়ব'। সে সবকে আমরা বলব 'আপেক্ষিক গায়ব'। কেননা সেগুলো আপেক্ষিকভাবেই অদৃশ্য।—যেমন ঘরের মধ্যে অবস্থানকারী ব্যক্তির নিকট ঘরের মধ্যের যাবতীয় জিনিস প্রত্যক্ষমান আর ঘরের বাইরে অবস্থিত ব্যক্তির জন্য তা 'গায়ব' পর্যায়ের। অনুরূপভাবে যে আলো ও দৃশ্যমান জিনিস দর্শনেন্দ্রিয়ের জন্য প্রত্যক্ষ,

শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে তা 'গায়ব'। শ্রুতিগ্রাহ্য জিনিসগুলো শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য প্রত্যক্ষ, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের জন্য তা গায়ব। এই দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আওতায় আসে এমন সব জিনিসই প্রত্যক্ষ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ঐ দু'টি শক্তিরই অধিকারী। কিন্তু যে বধির ও অন্ধ, তার জন্য তা সব–ই 'গায়ব'।[১]

এ প্রেক্ষিতে একথা বলা সর্বৈব সত্য যে, এক প্রকার 'গায়ব' বস্তু জগতের গায়ব আর এক প্রকার 'গায়ব' আপেক্ষিক, যাকে বলা যায়, বিশ্বলোকের গায়ব।[২]

যা নিরংকুশভাবে 'গায়ব', যা এই দুনিয়ায় কখনই প্রচ্ছন্নতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে না, তার এই 'গায়ব' হওয়া অবস্থার মধ্যে কখনই কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হবে না, ক্ষেত্র ও অবস্থার যত পার্থক্যই হোক না কেন। এই পর্যায়ের জিনিসসমূহের প্রতি মানুষকে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে—যদি তার অস্তিত্ব ও অবস্থিতি পর্যায়ে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা তা কখনই এই দুনিয়ায় প্রত্যক্ষ হবেনা। এ দুনিয়ায় তার সত্যতা ও বাস্তবতা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা সম্ভব নয়। কেননা এই জিনিসসমূহ বস্তু–অতীত আর মানুষ বস্তুগত আবরণে পরিবেষ্টিত। এই আবরণ দীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের পক্ষে তা 'গায়ব'ই থেকে যাবে; কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না। সে আবরণ দীর্ণ হওয়ার প্রথম পর্যায় হচ্ছে মৃত্যু; বস্তুগত দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ। আল্লাহ্র এই কথাটি এ পর্যায়ে মনে করা যায়ঃ

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ۔ لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ۔ (ق: ٢١-٢٢)

প্রত্যেক ব্যক্তিই এই অবস্থায় আসল যে, তার সাথে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসা একজন রয়েছে আর একজন রয়েছে সাক্ষ্যদাতা। এই ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ অসতর্কতার মধ্যে ছিলে। আমরা এক্ষণে সেই আবরণ সরিয়ে দিয়েছি, যা তোমার সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ এক্ষণে তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ম ও সূক্ষ্মদর্শী।

আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেদিনটি হচ্ছে কাফিরদের আযাব দেয়ার প্রতিশ্রুত দিন। এদিন ফেরেশতা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানে। তার

---

১. الميزان ج ٧ ص ١٢٨

২. এই বিভক্তি নিছক পরিভাষিক—শুধু দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করনার্থে। অন্যথায়, তা 'গায়ব' শুধু বস্তুজগতের দৃষ্টিতে। কিন্তু মূলগতভাবে কিংবা মহান আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা আদৌ গায়ব নয়।

হস্তপদ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াবে। দুনিয়ায় মানুষ এইদিন সম্পর্কে চরম গাফলতির মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই দিন সব আবরণ দূর করে দেবেন। মানুষ তখন সব কিছুই দেখতে পাবে, এতদিন যা কিছু তার দৃষ্টির অন্তরালে পড়ে ছিল।

কুরআনে উল্লেখিত 'গায়ব' কয়েক প্রকার

কুরআন মজীদে 'গায়ব' শব্দটি তিন প্রকার মৌলনীতির ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

প্রথমঃ আল্লাহ্র মৌল সত্তা, তাঁর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত খবরাদি। আত্মা-সর্বস্ব সত্তা, ফেরেশতাকুল আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুর পর বরজখে রূহগুলোর অবস্থা এবং কিয়ামতের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে 'রূহ' গুলোর অবস্থা—জান্নাত কিংবা জাহান্নাম লাভ পর্যায়ের খবরাদি। কুরআন মজীদে এই সব তত্ত্ব ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে নিরংকুশ গায়ব হিসাবে। এই সব বিষয় মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, মানুষ এই সব বিষয়ে নিজে থেকে কোন ধারণা বা কল্পনা করতেও সক্ষম হতে পারে না।

দ্বিতীয়ঃ প্রাচীনকাল ও দূর অতীতের জনগোষ্ঠী বা জাতিসমূহের ইতিহাস পর্যায়ে দেয়া সংবাদাদি। তাদের ইতিহাস সভ্যতার প্রচলিত ইতিহাসের ও পূর্বপর্যায়ের—পরিভাষায় বলা হয় 'অজানা ইতিহাস' (Un-known History), অথবা ইতিহাস পূর্বকালীন (Pre-history Period) ঘটনাবলী। প্রচলিত ইতিহাস বা জীবনী গ্রন্থসমূহে এ কালের ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ নেই। অনুরূপ ভবিষ্যতের অনাগত অধ্যায় ও পর্যায়সমূহে মানুষের সম্ভাব্য অবস্থার বিবরণাদি, ভবিষ্যতকালে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর কথা—যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফেত্না-ফাসাদ, বিপদ-আপদ, যেমন—রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়্যাতের প্রথম অধ্যায়েই সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, আবু লাহাব ও তার স্ত্রী কাফির অবস্থায়ই মরবে। কুরআনের ভাষায়ঃ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ -
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ - (اللهب: ١-٥)

চূর্ণ হলো আবু লাহাবের হাত এবং সে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে গেল। তার ধন-সম্পদ আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসেনি। সে অবশ্যই

লেলিহান শিখা–সম্বলিত আগুণে নিক্ষিপ্ত হবে, তার সাথে তার স্ত্রীও—কুটনীবুড়ি। তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাকে অতীতে ঘটে গেছে বলে এ সূরাটিতে দেখানো হয়েছে শুধু এজন্য যে, তা অবশ্যাই ঘটবে,তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথবা যেমন পারসিক অগ্নিপূজকদের উপর কয়েক বছরের মধ্যেই রোমান (আহলি কিতাব)দের বিজয় লাভ সংক্রান্ত আগাম সংবাদ দান। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছিলঃ

غُلِبَتِ الرُّوْمُ - فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ - فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ -
(الروم : ২-৩-৪)

রোমানরা নিকটবর্তী ভূ–খন্ডে পরাজিত হয়ে গেছে। নিজেদের এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিজয়ী হবে।[১]

এই সবের সাথে যুক্ত সেই সব বিষয়ের খবরাদি ও কথাবার্তা, যা একমাত্র আল্লাহ্‌রই জানা, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউই তা জানেনা, জানতে পারে না। যেমন কিয়ামত কখন—কোন্‌দিন ঘটবে, মাতৃগর্ভের পর্দার অন্তরালবর্তী ভ্রূণের পুরুষত্ব বা নারীত্ব। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -
(لقمان : ৩৪)

কিয়ামত সংক্রান্ত ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহ্‌রই রয়েছে। বৃষ্টি তিনিই বর্ষান, তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোন প্রাণীই জানেনা আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে। না কেউ জানে তার মৃত্যু কোথায় সংঘটিত হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

এই আয়াত সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

---

১. এই ইশারা সেই যুদ্ধের প্রতি যা সে সময়ে রোম ও পারসিকদের মধ্যে চলছিল। সে সময় রোমানরা বড় হীনভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং কেউ–ই চিন্তা করতে পারেনি যে, আবার তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করে বিপুলভাবে বিজয়ী হবে।

তৃতীয়ঃ বিশ্বলোকে অবস্থিত বহু সংখ্যক অবয়ব ও কার্যকর নিয়ম–কানুন সম্পর্কিত খবরাদি। সেসব জিনিস ওহী নাযিল হওয়ার সময় যেমন ইন্দ্রিয়াতীত ছিল, বর্তমানে আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিও তা আজ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। তা 'গায়ব'ই রয়ে গেছে। যেমন সৃষ্টিলোকের সব জিনিসের · زوجية · যৌথ বা দ্বৈত অংশের সমন্বয়ে অস্তিত্ব লাভ। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۔ (الذاريات، ٤٩)

প্রত্যেক জিনিসকেই আমারা যুগল রূপে (বা জোড়ায়–জোড়ায়) সৃষ্টি করেছি। সম্ভবতঃ তোমরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।

আকাশ লোকে জীবন্ত সত্তার অবস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ্র বলা কথার তাৎপর্য এখন পর্যন্ত মানুষের অবোধগম্য। বলা হয়েছেঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۔ (الشورى، ٢٩)

তাঁর (আল্লাহ্র অস্তিত্ব একত্বের) নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য এই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এই জীবন্ত সৃষ্টিসমূহ[১] যা তিনি উভয় স্থানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি যখনই চাইবেন এই সবকে তিনি একত্রিত করতেও সক্ষম।

এ সবই হচ্ছে জ্ঞান–বিজ্ঞান জগতের এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে নিহিত গোপন রহস্য ও নিয়ম–ধারা পর্যায়ের খবর।

ইমাম জুরকানীও কুরআনে ব্যবহৃত 'গায়ব' শব্দের ব্যবহার উক্তরূপ তিন পর্যায়ের জিনিস সম্পর্কিত বিষয়াদিতে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, এই তিন পর্যায়ের বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে মানুষের মেধা–প্রতিভা–চিন্তা–গবেষণা শক্তি কোন কাজে আসেনা, দূর অতীত প্রাচীন কালের ঘটনাবলী— যেমন নূহ্, মূসা, মরিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলে করীম (স)ও কিছুই জানতেন না। আর উপস্থিত পর্যায়ের গায়বী বিষয়ের মধ্যে গণ্য—আল্লাহ্, ফেরেশতা, জ্বিন, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি দেখার বা প্রত্যক্ষভাবে জানবার কোন উপায়ও রাসূলে করীম (স)–এর আয়ত্তাধীন ছিলনা। ফলে এসব বিষয়ে স্পষ্ট করে কোন কথা বলার তাঁর নিজের কোন ক্ষমতা ছিলনা।

---

১. মূল শব্দটি হচ্ছে · دَآبَّةٌ · এর অর্থ জীব–জন্তু, চলমান সত্তা, পা সম্পন্ন জীব, হামাগুড়ি দিয়ে চলা প্রাণী। আরবী ভাষায় মূলত ঘোড়া বুঝাবার জন্যই শব্দটি উদ্ভাবিত। কিন্তু ব্যবহৃত সব জীব–জন্তু–প্রাণী সম্পর্কে কুরআনের ব্যবহৃত · دابة · বলতে সব প্রাণী ও জীব বুঝায়। لغات القرآن ج ٢ ص

বর্তমান সময়ের 'গায়ব' কিংবা দূর অতীতের 'গায়ব' পর্যায়ের যে সব খবর কুরআন মজীদে এসেছে, যা জ্ঞানের দিকদিয়ে নিগূঢ় তত্ত্বমূলক, যা কল্যাণকর এবং যা মৌলনীতি পর্যায়ের—আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে যার কিছু কিছু জানা গেছে এবং ভবিষ্যতের গায়ব—ভবিষতে ঘটবে বলে যেসব আগাম সংবাদ কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে, তা সবই বাস্তব ও প্রকৃত সত্য বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।[২]

অবশ্য আল্লামা শাহরিস্তানী 'গায়ব' জিনিসসমূহকে আটটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। সে আটটি পর্যায় মৌলিকভাবে উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ে সমন্বিত। মনে রাখতে হবে, গায়বী জিনিসসমূহের এই বিভক্তি সীমাবদ্ধ শক্তিসম্পন্ন মানুষের বেলায় প্রযোজ্য এই সব জিনিস কোন–না–কোনভাবে মানুষের নিকট 'গায়ব'। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সব কিছু বর্তমান, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আওতাধীন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছুই তাঁর নিকট সমানভাবে একাকার। কোন পর্যায়েরই কোন একটি বিন্দুও তাঁর অগোচরে বা জ্ঞানের বাইরে নয়। আসমান–যমীনের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়, সৃষ্টি যত সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রই হোক, তার সব কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানের আওতাধীন।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ـ

জেনে রাখবে, মহান সৃষ্টিকর্তা সবকিছুই জানেন। তিনি তো অতীব সূক্ষদর্শী, সর্ববিষয়েজ্ঞানবান।

গায়ব বিষয়ে সংবাদ দান মু'জিজা পর্যায়ের কাজঃ

উপরে মোটামুটিভাবে 'গায়ব' পর্যায়ের যে সব জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কুরআনে সে জিনিসসমূহের কোন একটিরও সংবাদ দান প্রথমতঃ প্রমাণ করে যে, কুরআন কোন মানুষের—হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর রচিত কালাম নয়। তা একান্তভাবেই মহান আল্লাহ্র কালাম, আল্লাহ্ই তা রাসূলে করীম (স)–এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। কেননা প্রাকৃতিক জগত নিহিত গায়ব, অজানা নিয়ম ও তত্ত্ব রহস্য, দূর অতীত কালের জনগোষ্ঠী সমূহ, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য যুদ্ধ–বিগ্রহ ও ঘটনা–দূর্ঘটনা পর্যায়ের কোন জিনিস সম্পর্কে সংবাদ দান মনবীয় শক্তি বহির্ভূত, মানুষের জ্ঞান–আহরণের উপায় ইন্দ্রিয়–নিচয় ও কল্পনা–চিন্তা–গবেষণার দ্বারা আয়ত্তযোগ্য নয়। কাজেই একথা না–মেনে কোন উপায়ই থাকেনা যে, এই সব বিষয়ে যে গ্রন্থে স্পষ্ট–অকাট্য সংবাদ সন্নিবেশিত, তা

---

২. مناهل العرفان ج٢ ص ٢٣٣-٢٣٤

কখনই মানব রচিত হতে পারে না। তা মহান স্রষ্টার দেয়া জ্ঞান, যা তিনি তাঁর রাসূলের নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তিনিই গায়ব জানেন, জানেন উপস্থিতকেও। এ 'গায়ব' তিনি ছাড়া আর কারোরই জানবার কোন সাধ্য নেই। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা জানাতে পারেন এবং তিনি যাকে জানাবেন, তার পক্ষেই তা জানা সম্ভব—ততটুকুই জানা সম্ভব, যতটুকু আল্লাহ্ তাকে জানাবেন বা জানতে দিবেন। অতএব এসব গায়ব পর্যায়ের জিনিস সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) যা কিছু বলেছেন, তা সবই আল্লাহ্র জানানো, আল্লাহ্র নিকট থেকে জেনে নিয়েই তিনি তা দুনিয়ার মানুষকে জানিয়েছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'গায়ব' পর্যায়ের তিনও প্রকারের বিষয়ে কুরআন মজীদে অসংখ্য সংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। সেই সব বিষয়ের উল্লেখ মূলতঃ একখানি স্বতন্ত্র বিরাট কলেবরের গ্রন্থের দাবি করে। সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক রহস্য পর্যায়ে একালে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিতও হয়েছে। তাতে সেই সব তত্ত্ব ও রহস্যের বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণ উদ্ধৃত হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে শুধু প্রচ্ছন্ন ছিল তা-ই নয়, তা ছিল তদানীন্তন জনগণের অবোধগম্যও। কেবলমাত্র ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ কিতাবই তার একমাত্র সূত্র, তাফসীর লেখকগণ উত্তরকালে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। আমাদের বর্তমান গ্রন্থ সেই আলোচনা বিষয়ক নয় বলে এখানে তা অপ্রাসংগিক। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সব 'গায়ব'-এর উল্লেখ কুরআন মজীদে এসেছে, এখানে তার সংক্ষিপ্ত উলেখই যথেষ্ট বলে বিবেচিত।

কুরআন মজীদে দূর অতীতের যে সব জনগোষ্ঠী ও জনপদের অবস্থা এবং সংঘটিত ঘটনা-দুর্ঘটনার উল্লেখ হয়েছে, সে সবের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে যে, আল্লাহ্র নাযিল করা ওহীই হচ্ছে সেই সংক্রান্ত জ্ঞানের একমাত্র উৎস ও সূত্র। অন্য কোন সূত্রে তা জানা আদৌ সম্ভবপর ছিলনা। রাসূলে করীম (স) সেসব বিষয় তাঁর সময়ের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গ বা প্রচলিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকেও জানতে পারেন নি; জানা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। যদি তা-ই তিনি জানতে পারতেন, তাহলে সে সবের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও ছায়াপাত ঘটতো তাঁর উপস্থাপিত কিতাবে। কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছি যে, সেকালে উক্ত ঘটনা বা কাহিনীর যে বর্ণনা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল, কুরআন মজীদে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিকোণে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সহকারে ও স্ব-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। এই দুই বর্ণনা ধারার মধ্যে কোন দিক দিয়েই একবিন্দু সাদৃশ্য নেই।

কুরআনে উল্লেখিত কোন কোন কিস্সা প্রচলিত তাওরাতেও উদ্ধৃত দেখা যায়, যাকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান সমাজ আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাব বলে দৃঢ় ঐকমত্য পোষণ করে। কিন্তু তাওরাতের বর্ণনায় কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন অমৌলিক

কাহিনীর প্রাবল্য অত্যন্ত প্রকট, যার বিন্দুমাত্র নাম–চিহ্নও কুরআন মজীদে পরিদৃষ্ট হয় না।

কুরআন মজীদও আল্লাহ্‌র কালাম বিধায় প্রাচীন জাতি ও জনগোষ্ঠী–জনপদসমূহের উল্লেখ করেছে অতীব উত্তম ভঙ্গীতে ও অত্যন্ত শালীনতাপূর্ণ ভাষায়। সে বর্ণনায় মহান আল্লাহ্‌র সু–উচ্চ মর্যাদা.ও নবী–রাসূলগণের উন্নত সম্মানের একবিন্দু ব্যত্যয় ঘটেনি। রাসূলে করীম (স) আগের কিতাবাদি থেকে সেগুলো শুনতে পেয়ে নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন—নায়ূযুবিল্লাহ্—এ কথা যদি সত্য হত, তাহলে শেষোক্ত বর্ণনায় প্রথমোক্ত উৎসের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়া ছিল একান্তই অনিবার্য। তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে সে সবের বর্ণনা দেয়া নকলকারীর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হত না। এই দুই পর্যায়ের বর্ণনার মধ্যে সহজভাবে তুলনা করলেও লক্ষ্য করা যাবে, প্রাচীন বর্ণনার পৌরাণিকতা, ভিত্তিহীনতা ও অযৌক্তিকতা স্পষ্ট। তাতে মানুষের মনগড়া কাহিনী এতই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যে, তার মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা—কোন্‌টি আল্লাহ্‌র কালাম আর কোন্‌টি মানুষের কল্পনা তা পার্থক্য করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। পক্ষান্তরে কুরআনের বর্ণনা দর্পনের মতই স্বচ্ছ, আবিলতার লেশমাত্র তাতে লক্ষ্য করা যাবে না।

কুরআনে 'গায়ব' পর্যায়ের যে সব জিনিসের উল্লেখ হয়েছে, তার অপর দুটি প্রকার হচ্ছে এইঃ

১. আল্লাহ্ সুবহানুহু তা'আলা সংক্রান্ত খবরাদি, তাঁর নাম ও সিফাত এবং রূহানী জগত সম্পর্কিত বিষয়াদি, কুরআন মজীদে যে সবের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রথম পর্যায়ের তত্ত্বসমূহের কিছুটা ব্যাখ্যা পর্যায়ক্রমে দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

২. মানুষের ভবিষ্যৎ অবস্থা ও পর্যায় বিবর্তন সংক্রান্ত খবরাদি, বিভিন্ন যুদ্ধ–বিগ্রহ ও ফেত্‌না–ফাসাদের সৃষ্টি, যে সবের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। সেসব বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হবে।

বস্তুতঃ কুরআন মজীদ এমন সব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগাম সংবাদ পেশ করেছে, সাধারণ গণন বিদ্যা ও মানবীয় দূরদৃষ্টিতে বাহ্যতঃ ও তাৎক্ষণিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিপরীতটা হওয়াই সম্ভব বলে বিবেচিত হচ্ছিল। কেননা যে সময় তা বলা হয়েছিল, তখন একদিকে যেমন ইসলামী দাওয়াত ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে ও অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায়, তেমনি চতুর্দিকে শিরক ছিল সর্বাত্মকভাবে প্রভাবশালী। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী একান্তই বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে ও পরম সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোন ঘটনা সম্পর্কে এই রূপ আগাম সংবাদ দান—যা বাস্তবে সংঘটিত হয়ে যায়—কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী'র মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের

ভিত্তিতেই সম্ভব ছিল। এই ধরনের সংবাদ দান মানবীয় আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে কখনই সম্ভব নয়। সেই সময় কোন লক্ষণ বা নিদর্শনও এমন ছিল না, যার ভিত্তিতে কারোর পক্ষে নিজস্ব বিবেচনা শক্তির বলে ঐরূপ সংবাদ দেয়া সম্ভবপর হতে পারে; বরং তাৎক্ষণিক লক্ষণ–নিদর্শন তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বাস্তব বলে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

কুরআন প্রদত্ত গায়বী খবরাদি

১. কুরআন মজীদ বহু সংখ্যক আয়াতে প্রতিপক্ষকে অনুরূপ সূরা বা আয়াত রচনার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জসমূহ স্বভাবতঃই প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত এবং চ্যালেঞ্জের যথাযথ জবাব দানে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, কুরআনের চ্যালেঞ্জই বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে এবং প্রতিপক্ষ সে চ্যালেঞ্জের জবাবে মুখ খুলতে সম্পূর্ণ অক্ষমই রয়ে গেছে চিরকাল। যে সময় এই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল, তখনকার বড় বড় কবি–সাহিত্যিকরাও সে চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বলা যেতে পারে, সেকালের লোকেরা সে চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে অক্ষম ছিল বলে পরবর্তীকালের লোকেরাও কি অক্ষম রয়েছে? এক ব্যক্তি যদি ব্যর্থ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে একটি গোষ্ঠীও কি অক্ষম থেকে গেছে? আর একটি জনগোষ্ঠী যদি অক্ষম থেকে থাকে, তাহলে একটি সময়ের সমস্ত লোকও কি সে চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারেনি?

আমরা বলব, হ্যাঁ, সেকালের কোন একজনের পক্ষেও যেমন সে চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি, তেমনি বড়বড় কবি–সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়ে পরস্পরের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়েও কোন জবাব দিতে পারেনি। অথচ তখনকার সময়ে তারা ছিল বড় বড় ও অতি উচুঁ দরের কবি–সাহিত্যিক। আর তা সত্ত্বেও তখন যেমন তাদের পক্ষে কুরআনের এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি বিগত চৌদ্দশ' বছরের মধ্যেও, তেমনি তা কোন দিনই সম্ভব হবে না, একথা বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বলা যায়।

কুরআন মজীদ দুনিয়ার মানুষের সামনে যে সব বিষয়ের চ্যালেঞ্জ পেশ করেছিল, সে পর্যায়ের কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

মক্কী জীবনের শেষ পাদে কাফিরদের মিথ্যা অভিযোগের জবাবে কুরআন মজীদ সর্বপ্রথম যে চ্যালেঞ্জটি উচ্চারণ করে, তা নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم
مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ - (هود : ١٣)

ওরা বলে নাকি যে, মুহাম্মাদ এই কুরআন নিজে রচনা করে আল্লাহ্র নামে চালিয়ে দিয়েছে? তাহলে—হে নবী—আপনি বলুন, তোমরা আপন শক্তি বলে এই কুরআনের মত অবিকল দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এস। আর সেজন্য আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আর যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের উক্ত কথার সত্যবাদিতা প্রমাণ করতে প্রস্তুত হও।

এই আয়াতটিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কুরআনের ন্যায় সূরা রচনা করে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এবং সে জন্য যাকে সম্ভব সহযোগিতা করার জন্য—সকলে একত্রিত হয়ে নিজেদের সকল মেধা–প্রতিভা ও যোগ্যতা মিলিয়ে দশটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। যাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে বড় বড় কবি–সাহিত্যিকদের অবস্থিতি রাসূলে করীম (স)–এর কিছুমাত্র অজানা ছিলনা। তা সত্ত্বেও তিনি এই চ্যালেঞ্জ বাণী প্রাকশ্যে উচ্চারণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। কেউ এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে সমর্থ হবে না, তা ছিল নিতান্তই 'গায়ব'–এর ব্যাপার। এইরূপ 'গায়ব' রাসূলের নিজের জানা ছিল না। এই চ্যালেঞ্জ তিনি দিয়েছিলেন নিজের শক্তি ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করে নয়। এ চ্যালেঞ্জ তাঁর নিজের পক্ষে দেয়া সম্ভবপর ছিলনা। মূলতঃ এ চ্যালেঞ্জ মহান আল্লাহর্ দেয়া যা ওহীর মাধ্যমে রাসূলে করীম (স) লাভ করেছিলেন।

উক্ত আয়াতের কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল এই আয়াতটিঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ -

(يونس : ٣٨)

ওরা বলে নাকি যে, মুহাম্মাদ কুরআন নিজে রচনা করে আল্লাহ্র নামে চালিয়ে দিয়েছে? বলুন—হে নবী!— তাহলে তোমরাই আপন ক্ষমতা বলে অনুরূপ একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আসো। আর সে জন্য আল্লাহ্ বাদে আর যাকেই পার সাহায্যের জন্য ডাক, যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক।

পূর্ববর্তী আয়াতে দশটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু তার কোন জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি তদানীন্তন মিথ্যা দোষারোপকারী কাফির সমাজের পক্ষে। তাই শেষোক্ত আয়াতে দশটি সূরার পরিবর্তে একটি মাত্র সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে।

মক্কী জীবনের শেষে—হিজরাতের কয়েক মাস বা বছর খানিক পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আল–ইসরা (সূরা বনী–ইসরাঈল)য়ও অনুরূপ একখানি কুরআন রচনার চ্যালেঞ্জ পেশ করে তাদের ব্যর্থতার কথা বলে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا۔ (الاسراء: ٨٨)

বল হে নবী! সমস্ত মানুষ ও জ্বিনও যদি এই কুরআনের মত কিছু বানাবার জন্য একত্রিত হয়, তবু তারা অনুরূপ কিছু নিয়ে আসতে সক্ষম হবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হলেও।

এ আয়াতে সমস্ত মানুষ ও জ্বিনের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার ফলে কুরআনের ন্যায় একখানি কিতাব রচনা করা সম্ভব নয় বলে উদাত্ত কণ্ঠেই ঘোষণা করা হয়েছে।

অতঃপর হিজরাতের পর মদনী জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে—দেড়–দুই বছর কালের মধ্যে অবতীর্ণ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۔ (البقرة: ٢٣-٢٤)

আমরা আমাদের বান্দাহ্র প্রতি যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে তোমরা যদি কোন সন্দেহে পড়ে গিয়ে থাক, তাহলে তারই মত একটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আস। আর আল্লাহ্ বাদে তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীদেরও সেজন্য ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের সন্দেহে সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তোমরা তা করতে সক্ষম না হও—আর কখনই তোমরা তা করতে সক্ষম হবেনা—তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্যই কেবল প্রস্তুত করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের সূরা'র ন্যায় একটি সূরা বা দশটি সূরা কিংবা একটি আয়াত অথবা পূর্ণ একখানি কিতাব রচনা করে নিয়ে আসার এই উপর্যুপরি চ্যালেঞ্জ বাণী মক্কার সূচনা কাল থেকে মদনী জীবন পর্যন্ত বারে বারে উচ্চারিত ও ঘোষিত হয়েছে। কুরআন বলেছে, তার সাথে মুকাবিলা করা বা তার অনুরূপ কালাম রচনা করা মানুষ বা জ্বিন কারোর পক্ষেই সম্ভবপর নয়, কিয়ামত পর্যন্তও তা সম্ভব হবেনা। মানুষ

এই উদ্দেশ্যে যত চেষ্টা-প্রচেষ্টাই চালাক, সে জন্য তারা যত জোটবদ্ধই হোক, চিরকালই তা অসম্ভব থেকে যাবে। এ কথা যে অকাট্য এবং একান্তই সত্য, তার বাস্তব প্রমাণ এই যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় থেকেই বর্তমান সময় পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ বহাল রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তির বা কোন গোষ্ঠীর পক্ষেই তা সম্ভবপর হয়নি। কোন দিনই তা সম্ভবপর হবে না।

অতএব একথা প্রমাণিত যে, কুরআন মানব রচিত—হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর স্বকপোলকল্পিত কালাম নয়। এ কালাম সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র, যা ওহীর মাধ্যমে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নাযিল হয়েছিল। তিনি 'গায়ব' পর্যায়ের এই চ্যালেঞ্জ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন নিজের থেকে নয়। কেননা এটা 'গায়ব' পর্যায়ের কথা—কিয়ামত পর্যন্তও কুরআনের ন্যায় কোন কালাম মানুষ রচনা করতে পারবে না—এ 'গায়ব' কেবল আল্লাহ্‌রই জানা, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নয়।

২. পারসিকদের উপর রোমানদের বিজয় লাভ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

الٓمٓ - غُلِبَتِ الرُّوْمُ - فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ - فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ - بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الروم-١-٦)

রোমানরা নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে। নিজেদের এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিজয়ী হবে। আসল ক্ষমতা কর্তৃত তো আল্লাহ্‌র-পূর্বেও এবং পরেও। আর তা যেদিন হবে সেদিন আল্লাহ্‌র দেয়া এই বিজয়ে মুসলিমরাও আনন্দিত হবে। আল্লাহ্ সাহায্য দান করেন যাকে চান। তিনি মহা পরাক্রমশালী, দুর্জয়, বিপুল দয়াবান। এ ওয়াদা আল্লাহ্‌র আর আল্লাহ্ কখনই নিজের করা ওয়াদার খেলাফ করেন না। কিন্তু অনেক লোকই তা জানেনা।

এ আয়াতে রোমানদের বিজয় লাভের যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা পরবর্তী দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাস্তব রূপলাভ করেছিল। বিশ্ব ইতিহাসবিদগণ একমত হয়ে বলেছেন, রোমানরা পরবর্তীতে বিজয়ী হয় ও তাদের সৈন্য বাহিনী পারস্যরাজ্যে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে।

এ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, রোমানরা ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী—আহলি কিতাব। আর পারসিকরা ছিল পৌত্তলিক। ৬১৪ খৃষ্টাব্দে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে রোমানরা পরাজয় বরণ করে। এই পরাজয়ে মুসলিমগণ দুঃখ–ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে একারণে যে, রোমানরা ছিল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানদার আর পারসিকরা ছিল পৌত্তলিক। মক্কার মুশরিকরা রোমানদের এই পরাজয়ে ও পারসিকদের বিজয় লাভে আনন্দিত উল্লাসিত হয়েছিল শুধু এজন্য যে, পৌত্তলিকরা আসমানী ধর্মে বিশ্বাসীদের পরাজিত করে দিয়ে বিজয়ী হয়েছে। তারা (মুশরিকরা) বলে বেড়াতে লাগল যে, আজ যেমন করে পৌত্তলিকরা বিজয়ী হয়েছে, তেমনি আমরাও মুসলমানদের মুকাবিলায় বিজয়ী হবো—ওরা আমাদের নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে।

এ সময়ই উপরোক্ত আয়াতে করীমাহ নাযিল হয়। এতে মুসলিমদের এই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রোমানদের এই পরাজয় কোন স্থায়ী বা চূড়ান্ত ব্যাপার নয়। জয়–পরাজয় সব আল্লাহ্‌র মর্জীতেই হয়ে থাকে। খুব বেশী বিলম্ব হবেনা, কয়েক বছরের মধ্যেই এই পরাজিত রোমানরা বিজয়ী পারসিকদের উপর জয় লাভ করবে।

কুরআনের শব্দ হচ্ছে · بِضْعِ سِنِيْنَ · আরবী ব্যবহারে তা তিন থেকে দশ বছর পর্যন্ত সময় বুঝায়। কিন্তু রোমানদের অবস্থা এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা যে আবার কখনও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে এবং পারসিকদের পরাজিত করে বিজয় লাভে সক্ষম হবে, তা তখন কোনক্রমেই বুঝা যাচ্ছিল না, তার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না; বরং যে অবস্থা ও লক্ষণাদি ছিল, তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, ওরা চিরদিনের জন্যই বুঝি শেষ হয়ে গেছে; আর কোন দিনই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার মত শক্তির অধিকারী হতে পারবে না। পারসিকরা তুলনামূলকভাবে রোমানদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। তদুপরি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তারা এক দুর্জয় শাক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াদা কখনই মিথ্যা হতে পারে না। তা ৬২২ খৃষ্টাব্দে হিজরাতের দ্বিতীয় বৎসরই সত্যে পরিণত হয় এবং রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করে বিজয় লাভে সক্ষম হয়।

আল্লামা জুরকানী লিখেছেন, উপরোদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই সুসংবাদ রয়েছে যে, যে সময়ে রোমানরা আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়ে বিজয় লাভ করবে, ঠিক সেই সময় মুসলিমরাও মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যে বিজয়ী ও আনন্দিত হবে। আল্লাহ্‌র এই সুসংবাদও বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদাকে সত্য করে দেখিয়েছেন। কেননা রোমানরা যখন পারসিক পৌত্তলিকদের উপর জয়লাভ করেছিল, সে সময়ই মুসলমানরা বদর যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের উপর বিজয়ী হয়েছিলেন। ফলে দুই আগাম সংবাদ একই সময় সত্য ও বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল, যদিও বাহ্যিকভাবে মনেই

করা যায়নি যে, রোমানরা কোনদিনই পারসিকদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে। যেমন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় মুসলিমদের চরম অসহায়ত্ব ও বস্তুগত শক্তি–সামর্থ্যের দিক দিয়ে চরম সংকটজনক অবস্থার কারণে কোনদিনই ধারণা করা যায়নি যে, যুদ্ধের ময়দানে শক্তিশালী কাফিরদের পরাজিত পর্যুদস্ত করা তাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোমানদের সেই চূড়ান্ত বিপর্যস্ততা ও মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা ও দারিদ্র–ক্লিষ্ট অবস্থার মধ্যেই আয়তদ্বয় নাযিল হয়েছিল এক সাথে দুটি বিজয়ের আগাম সুসংবাদ ধারণ করে।[১]

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় না হলেও শুধু রোমানদের বিজয় লাভও মুসলমানদের পক্ষে কম আনন্দের কারণ ছিলনা। তাতেও আল্লাহ্‌র কালামের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হত।

৩. মানবীয় পীড়ন থেকে নবী করীম (স)–এর রক্ষা পাওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীঃ

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ - (المائدة: ٦٧)

হে রাসূল! তুমি লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও যা তোমার প্রতি তোমার রব্‌–এর নিকট থেকে নাযিল করা হয়েছে। তুমি যদি তা না কর, তাহলে তোমার রিসালাত তুমি পৌঁছালেনা। আর আল্লাহ্‌ তোমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কাফির লোকদেরকে হেদায়েত দান করবেন না।

সূরা আল–মায়েদা'র এ আয়াতটি মদীনা শরীফেই নাযিল হয়েছিল। আয়াতটিতে দু'টি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে, রাসূলে করীম (স)–এর উপর রিসালাতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, রাসূলে করীম (স)–এর 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে, মানুষের হাত থেকে তাঁর রক্ষা পাওয়া সম্পর্কে।

রাসূলে করীম (স)–এর উপর অর্পিত রিসালাত পৌঁছানোর দায়িত্ব তিনি পূর্ণমাত্রায় পালন করেছিলেন। নবুয়্যাতের প্রথম দিকে তিনি তাঁর দাওয়াত অপ্রকাশ্যে প্রচার

১. مناهل العرفان ج ٢، ص ٣٧٧

করেছিলেন, পরে তা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করতে শুরু করেন এবং মক্কী জীবনের তেরটি বছর তিনি নির্ভিকচিত্তে—সকল প্রকার শত্রুতা ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহ্র দ্বীন জনগণের নিকট পৌছাতে কিছুই বাকী রাখেননি। মদনী সমাজে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধান হিসাবেও তিনি দ্বীন পালন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করেছেন। দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে তিনি যে রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করেছেন তাঁর সাক্ষ্য আরাফাত ময়দানে বিশাল জনতার নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন বিদায় হজ্জ-এর দিনে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেনঃ 'কেউ যদি বলে যে, মুহাম্মাদ (স) দ্বীনের কোন কিছু গোপন রেখে গেছেন, প্রচার করে যান নি, মনে রেখো, সে তোমাকে মিথ্যা বলে।' অপর বর্ণনায় তাঁর কথাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছেঃ রাসূলে করীম (স) কুরআনের কিছুই যদি গোপন করতেন তাহলে তিনি এ আয়াতটি নিশ্চয়ই গোপন করতেন। এর পরই আল্লাহ্ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন। তার অর্থ, হে নবী! তুমি তোমার রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ভয় ভীতির প্রশ্রয় দিও না। কেননা আমিই তোমাকে তোমার শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করব, তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব, বিজয়ী করব। অতএব, তুমি ভীতও হবে না, দুশ্চিন্তা ক্লিষ্টও হবে না। কেউ তোমার একবিন্দু অনিষ্ট করতে পারবে না এবং তোমাকে কষ্ট দিতেও সক্ষম হবে না।[১]

আয়াতটি 'গায়ব' পর্যায়ের বিষয়ে আগাম সংবাদ সম্বলিত। কেননা একথা প্রমাণিত যে, রাসূলে করীম (স)কে হত্যা করার জন্য শত্রুপক্ষের সকল পরিকল্পনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে তাঁর শত্রুদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও শক্তি-ক্ষমতার ব্যাপকতা সত্ত্বেও। তারা যে তাকে হত্যা করার জন্য প্রতি মুহূর্ত ওৎ পেতে থেকেও কার্যতঃ কিছুই করতে পারেনি, তা ঐতিহাসিক সত্য।

আল্লাহ্ বলেছেনঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ـ الَّذِيْنَ
يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ـ (الحجر، ٩٤-٩٥)

অতএব হে নবী! তোমাকে যে বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তুমি তা উদাত্ত কণ্ঠে চতুর্দিকে প্রচার ও প্রকাশ করে দাও এবং শিরককারীদের একবিন্দু পরোয়া করোনা। আল্লাহ্র সাথে অপর কাউকে ইলাহ রূপে গ্রহণকারী লোকেরা যে

১. تفسير ابن كثير تفسير الآية

—১৪—

তোমাকে ঠাট্টা–বিদ্রুপ করে এবং তাদের মুকাবিলা করার জন্য আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট। ওরা এর পরিণতি শীগ্‌গীরই জানতে পারবে।

এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং নবুয়্যাতের প্রাথমিক পর্যায়ের, যখন মক্কার মুশরিকরা রাসূলে করীম (স)কে নানাভাবে ঠাট্টা–বিদ্রুপ বাণে জর্জরিত করে তুলত। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (স)কে সেই ঠাট্টা–বিদ্রুপকারীদের থেকে রক্ষা করেছেন, ওদেরকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছেন। উক্ত আগাম সংবাদ এমন সময়ে দেয়া হয়েছিল, যখন রাসূলে করীম (স)–এর অবস্থা নানাভাবে অত্যন্ত করুণ ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত ওদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ ওদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেনঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ ط وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ط (النساء: ١١٣)

হে নবী। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যদি তোমার প্রতি না হত এবং তাঁর রহমাত তোমার প্রতি সতত বর্ষিত না হত তাহলে কাফিরদের একটি দল তোমাকে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল, যদিও তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই ভুল ধারণায় ফেলতে পারছিল না। আর ওরা তোমার একবিন্দু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

ক্ষতি করা অর্থ তাঁকে হত্যা করা। আর রাসূলে করীম (স)কে কাফির–মুশরিকরা যে হত্যা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কার্যতঃ কিছুই করতে পারে নি, একথা সর্বজনবিদিত।

রাসূলে করীম (স)–এর সকল প্রকার বিপদ–আপদ ও শত্রুদের শত্রুতা থেকে রক্ষা পাওয়া পর্যায়ের এসব আয়াত নিতান্তই ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণী করার কোন ক্ষমতা রাসূলের নিজের ছিলনা। এ সব কথা বলার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ছিল এবং তিনিই এই সব ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তব সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন।

৪. মুনাফিক ও পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে আগাম খবর

এই পর্যায়ের আয়াত সূরা তওবা, সূরা আল–ফাতহ ও সূরা আল–হাশর–এ উদ্ধৃত হয়েছে। সূরা আত–তওবা'র আয়াত হচ্ছেঃ

فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (التوبة-٨٣)

আল্লাহ্ যদি এদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে আনেন এবং ভবিষ্যতে এদের কোন লোকসমষ্টি যদি তোমার নিকট জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহলে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিবেঃ এখন তোমরা আমার সাথে কক্ষণই যেতে পারবে না; না আমার সাথে একত্রিত হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা কোনদিনই লড়াই করতে পারবে। পূর্বে তো তোমরা বসে থাকাকেই পছন্দ করে নিয়েছিলে, এখন ঘরে উপবেসনকারীদের সাথে–ই বসে থাক।

এ আয়াতে আগাম সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকরা বসে থাকবে, নিষ্ক্রিয় থাকবে, নবী করীম (স)–এর সাথে জিহাদে যাবে না। আল্লাহ্র কালামে রাসূলের কথাঃ 'তোমরা আমার সাথে কক্ষণই জিহাদে যেতে পারবে না'–এর অর্থ, আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য আমার সঙ্গে বের হওয়ার জন্য জরুরী ঈমানের সাহচর্য তোমরা কস্মিনকালেও পাবেনা। এছাড়া অন্যান্য ইবাদাতেও তোমরা আমার সাথে শরীক হতে পারবে না। আমার সাথে একত্রিত হয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করার জন্য তোমরা কখনই বের হতে পারবে না।

অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۔

(التوبة، ٤٢)

হে নবী! ফায়দা যদি সহজলভ্য হত ও বিদেশ–যাত্রা হত সুগম–স্বচ্ছন্দ, তবে তারা অবশ্যই তোমার পিছনে চলতে প্রস্তুত হত। কিন্তু তাদের পক্ষে এই পথ বড়ই কঠিন ও দুর্গম হয়ে পড়েছে। এক্ষণে তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে; আমরা যদি চলতেই পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যেতাম। আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। আল্লাহ্ খুব ভালোভাবেই জানেন যে, ওরা মিথ্যাবাদী।

নিকট ভবিষ্যতে ওরা যে আল্লাহ্র নামে কিরা-কসম করে কথা বলবে, তাতে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলবে, এ সবই হচ্ছে ভবিষ্যৎ পর্যায়ের কথা, যা সম্পূর্ণ গায়বী ব্যাপার। ভবিষ্যতে যা ঘটবে—পরে যা সংঘটিত হয়ে কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে—তার আগাম খবর দেয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্র কুদরাতের ব্যাপার। এইরূপ বিষয়ের আগাম সংবাদ দান একদিকে যেমন নবী করীম (স)-এর নবুয়্যাতের সত্যতা প্রমাণ করে, তেমনি কুরআনেরও আল্লাহ্র কালাম হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। উত্তরকালে তারা বাস্তবিকই এইরূপ কসম করে কথা বলেছিল।

অনুরূপ আর একটি আয়াত হচ্ছেঃ

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ـ (التوبة: ٩٥)

তোমরা—মুসলিমরা—যখন ফিরে আসবে তখন ওরা তোমাদের নিকট এসে কসম করবে যেন তোমরা তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না কর। অতএব তোমরা ওদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করোনা। কেননা এটা একটি কদর্য ব্যাপার। আর ওদের চূড়ান্ত পরিণতি তো জাহান্নাম, যা তাদের কাজের প্রতিফল হিসাবেই তারা পাবে।

সূরা তওবায় ভবিষ্যদ্বাণী পর্যায়ের বহু সংখ্যক আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে। সে সব আয়াত চিন্তা-বিবেচনা করলে বহু গায়বী সংবাদের কথা জানা যায়। উপরের আয়াতটিতেও তাবুক যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে যারা বিরত রয়ে গিয়েছিল সেই মুনাফিকদের সম্পর্কেই কথা বলা হয়েছে।

এই পর্যায়ের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সূরা আল-ফাত্হ-এর আয়াত। তাতে সে সব আরব বেদুঈন সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে যারা হুদাইবিয়া সন্ধিকালীন যাত্রায় রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে যেতে রাযী হয়নি। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ (الفتح: ١١)

হে নবী! বদ্দু আরবদের মধ্যে যাদেরকে পিছনে রেখে যাওয়া হয়েছিল এক্ষণে তারা এসে অবশ্যই তোমাকে বলবেঃ আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল ও পরিবারবর্গই

ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল, (এই কারণে আমরা আপনার সাথে যেতে পারিনি) এক্ষণে আপনি আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন। এই লোকেরা নিজেদের মুখে সেই সব কথাই বলছে, যা তাদের দিলে নেই।

এই সূরারই অপর আরেকটি আয়াতঃ

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۗ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۗ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ (الفتح: ١٥)

তোমরা যখন গনীমতের মাল লাভ করার জন্য যেতে থাকবে, তখন এই পিছনে রেখে-যাওয়া লোকেরা তোমাদেরকে অবশ্যই বলবে যে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। ওরা আল্লাহ্‌র ফরমান বদ্‌লে দিতে চায়। ওদেরকে স্পষ্টভাষায় বলে দাওঃ তোমরা কক্ষণই আমাদের সঙ্গে যেতে পার না, আল্লাহ্ তো এই কথা আগেই বলে দিয়েছেন। তখন ওরা বলবেঃ না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ। (অথচ এটা কোন হিংসার কথা ছিলনা) আসলে ওরা সঠিক কথা খুব কম-ই বুঝে।

এ দু'টি আয়াতেই জিহাদে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে বহু গায়বী খবর আগামভাবে দেয়া হয়েছে। তাতে তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। জানা গেছে তাদের সে সব অবস্থার কথা, যে সবের সম্মুখীন তারা ভবিষ্যতে হবে।

উপরের আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা যায়, হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম (স) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন উমরা করার উদ্দেশ্যে—ষষ্ঠ হিজরীর যিল্‌কাদাহ মাসে—তখন মদীনা ও তার আশেপাশের মুসলিমরা তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য দলে দলে এসে হাযির হলো। তারা উমরার জন্য এহরাম বেঁধে নিয়েছিল এবং সঙ্গে নিয়েছিল কুরবানীর জন্তু। যেন কেউ মনে না করে যে, তারা যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু বহু লোকই এই ব্যবস্থাকে অত্যন্ত অসমীচীন মনে করল এবং এই কাফেলার সাথে শরীক হতে অনিচ্ছুক হয়ে তারা তা থেকে পিছনে থেকে গেল। আর কারণ দেখাল নিজেদের পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালনের কঠিন ব্যস্ততা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আগে-ভাগেই খবর জানিয়ে দিলেন যে, নবী করীম (স) ও সাহাবীগণ যখন হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসবেন, তখন তারা মুসলিমদের নিকট এসে ওযর পেশ করে বলবে যে

আমাদের ধনমাল ও পারিবারিক দায়িত্ব ব্যস্ত করে রেখেছিল বলে আমরা আপনাদের সাথে যেতে পারিনি। সেই সাথে তারা রাসূলের নিকট 'ইস্তিগ্ফার' করারও দাবি জানাবে। অথচ আসল অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের এইরূপ ওযর পেশ করা সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের এই ইস্তিগ্ফার–এর দাবিও নেহাৎ মুখ বাঁচানোর ফন্দি মাত্র, এটা তাদের অন্তরের কথা নয়। কেননা নবী করীম (স) তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত চাইলেন কি চাইলেন না, তার কোন পরোয়াও তারা করেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা এ আগাম সংবাদও জানিয়ে দিলেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে মদীনায় ফিরে আসার পর নবী করীম (স) খায়বর যাত্রা করবেন এবং খায়বর জয় করে সেখানকার অধিবাসীদের নিকট থেকে বিপুল গনীমতের মাল নিয়ে আসবেন। তখন পিছনে থেকে যাওয়া এই লোকেরা তাঁর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইবে, যেন তারা গনীমতের মালের অংশ পাওয়ার জন্য মুসলমানদের সাথে শরীক হতে পারে। আর নবী করীম (স) তাদের বলবেন, 'না, তোমরা কখনই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না, তোমাদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বহু পূর্বেই একথা বলেদিয়েছেন।'

আর এ কারণেই নবী করীম (স) খায়বর বিজয়ের ফলে লব্ধ গনীমতের মাল কেবল তাঁদের মধ্যেই বন্টন করেন যারা তাতে কার্যত শরীক হয়েছিলেন।

'তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই এ কথা বলে দিয়েছেন' এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই লোকেরা যে হুদাইবিয়ার অভিযাত্রায় শরীক হবেনা এবং পরবর্তী খায়বর যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকেও বিরত থাকবে, এ কথা আল্লাহ্ তা'আলা আগে–ভাগেই রাসূলে করীম (স) কে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

পূর্ব কথার দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ (الفتح: ١٦)

এই পিছনে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদের বলে দাওঃ খুব শীগ্‌গীরই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্য ডাকা হবে যারা বড়ই শক্তিসম্পন্ন। তোমাদেরকে তাদের সথে যুদ্ধ করতে হবে কিংবা তারা অনুগত হয়ে যাবে। সেই

সময় তোমরা যদি জিহাদের নির্দেশ পালন কর তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম কর্মফল দিবেন। আর তোমরা যদি তেমনি পিছনে পড়ে থাক যেমন পূর্বে পিছনে ফিরে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আযাব দিবেন।

হুদাইবিয়ার অভিযাত্রায় না–যাওয়া লোকদের সম্পর্কে আগাম খবর দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে এক কঠিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শরীক হওয়ার আহবান জানান হবে, যে যুদ্ধ হবে এক দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী জনতার সাথে।

এর দুই বছর পরই নবী করীম (স) হাওয়াজিন, হুনাইন ও সকীফ গোত্রসমূহের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে আহবান জানালেন। এসব গোত্র বড় শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ ছিল। পরে আল্লাহ্ এ খবরও জানিয়ে দিলেন যে,তারা সেখান থেকে বিপুল গনীমতের মাল পাবেন। যেমন বলা হয়েছেঃ

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا - وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا -

(الفتح : ١٩ - ٢٠)

এতদ্ব্যতীত (তিনি) আরও বহু গনীমত সামগ্রী তাদেরকে দিবেন যা তারা শীগ্গীরই গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ ধন–সম্পদ দান করার ওয়াদা করছেন যা তোমরা অবশ্যই লাভ করবে। ত্বরিৎগতিতে এই বিজয় তো তিনি তোমাদেরকে দিলেনই, আর লোকদের হস্ত তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হওয়া থেকেও বিরত রাখলেন, যেন তা মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে উঠে। আর আল্লাহ্ সহজ–সঠিক–নির্ভুল–ঋজু পথের হেদায়েত দান করেন।

বস্তুতঃ খায়বর থেকে বিপুল গনীমত পাওয়ার এই আগাম সুংসবাদ সত্য ও সম্পূর্ণ বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল; হুনাইন ও হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়ের সাথে যুদ্ধেও মুসলমানরা বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন।

মুনাফিকদের সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই মুনাফিকী একটি মানসিক ও প্রচ্ছন্ন ব্যাপার। তাতে রয়েছে কুফর ও আল্লাহ্র নাফরমানীর প্রবল ভাবধারা। ওরা ওয়াদা করে এবং পরে নিজেরাই সে ওয়াদা খেলাফ করে। ইরশাদ হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ـ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ـ (الحشر: ١١-١٢)

তুমি কি দেখনি সেই লোকদের যারা মুনাফিকী আচার-আচরণ অবলম্বন করেছে? তারা তাদের কাফির আহলি-কিতাব ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে যাব। উপরন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারোর কথাই শুনবো না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই লোকেরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

ওরা বহিষ্কৃত হলে এরা তোমাদের সাথে কখনই বের হয়ে যাবেনা। আর তাদের উপর আক্রমণ করা হলে এরা কখনই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। এরা যদি তাদের সাহায্য করেও তবু এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতঃপর কোথাও থেকে কোন সাহায্য তারা পাবে না।

আয়াতদ্বয়ের সার বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলছেনঃ তুমি কি মুনাফিকদের অবস্থা বিবেচনা করে দেখনি? ওরা অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে মুখে ও বাইরে ঈমান যাহির করে ইয়াহুদী কাফিরদের সম্বোধন করে বলছে; তোমাদেরকে যদি তোমাদের ঘর-বাড়ী-ভূমি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়, তাহলে তোমাদের সাহায্যার্থে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে যাব। তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী কাউকেই—অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর সাহাবীদের—একবিন্দু সমর্থন বা সহযোগিতা দেবনা। সেই সাথে এই আশার বাণীও তারা শুনিয়েছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে আমরা তোমাদেরকেই সাহায্য দেব।

এ কথা উদ্ধৃত করার পরই আল্লাহ্ বলছেনঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী'। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের বহিষ্কৃত করা হলে তাদের সাথে ওরা নিশ্চয়ই বের হয়ে যাবেনা। আর ওদের উপর আক্রমণ করা হলে ওরা এদের সাহায্যও করবে না। ওরা হলো মুনাফিক, ওরা কোন দ্বীন বা আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানদার নয়। ওরা যদি এদের সাহায্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসেও, তবু ওরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাবে। ফলে এরা পরাজিত হবে।

তাফসীর লেখকগণ বলেছেন, উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয় মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু–নজীরদের বহিষ্কারের বহু পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং উত্তরকালে তারা বহিষ্কৃতও হয়েছে; কিন্তু মুনাফিকরা তাদের সঙ্গে মদীনা থেকে বের হয়ে যায়নি। তাদের সাহায্যেও ওরা এগিয়ে আসেনি।[১]

ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর নবুয়্যাত সত্য এবং কুরআন মজীদ একমাত্র আল্লাহ্‌র কালাম। কেননা ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোন ঘটনার খবর দেয়া এবং উত্তরকালে হুবহু তা–ই ঘটে যাওয়া কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব।[১]

বনূ–নজীর ইয়াহুদী গোত্রের প্রতি আকৃষ্ট মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আল' বলেছিলেনঃ

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۔ (الحشر ـ ١٤)

ওরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে (প্রকাশ্য ময়দানে) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কখনই আসবে না। লড়াই করলেও তা দুর্গ পরিবেষ্টিত জনবসতিতে বসে কিংবা প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে করবে। ওরা পারস্পরিক বিরুদ্ধতায় বড়ই কঠিন ও অনমনীয়। তুমি তো ওদের ঐক্যবদ্ধ মনে কর; কিন্তু ওদের দিল পরস্পর বিদীর্ণ ও বিরূপ। ওদের এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, ওরা নিজেরাই নির্বোধ লোক।

আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের লক্ষ্য করে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন যে, ওরা কখনই প্রকাশ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে না। তবে যদি কখনও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও, তবে তা করবে সুরক্ষিত দুর্গ প্রাকারের অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে। তোমাদের সমুখে বের হয়ে আসবে না কখনই। ওরা আড়ালে থেকে তোমাদের প্রতি লেজা–বল্লম–তীর নিক্ষেপ করবে। কেননা ওদের পারস্পরিক শত্রুতা অত্যন্ত প্রবল। ওরা এক দিলের লোক নয়, যদিও বাহ্যতঃ ওদের ঐক্যবদ্ধই মনে হয়। আসলে ওরা নির্বোধ, সে কারণেই আল্লাহ্ ওদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

বনূ নজীর গোত্রের পরবর্তীকালীন ইতিহাসের সাথে কুরআনের এই আগাম বর্ণনা শতকরা একশ ভাগই মিলে গেছে, বাস্তবের সাথে একবিন্দু পার্থক্য থাকেনি।[২]

---

১. مجمع البيان ج ٥ ص ٢٦٣

১. الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج ١٨ ص ٣٢

২. سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٩١

(৫) যুদ্ধের পূর্বেই যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ দান

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ـ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ـ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ـ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ـ ....

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ـ (الانفال ٧-١٢)

স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে, দুটি গোষ্ঠীর একটি তোমরা অবশ্যই পেয়ে যাবে। তোমরা চাচ্ছিলে যে, দুর্বল গোষ্ঠীকে তোমরা পেয়ে যাও। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল যে, তিনি তার কথা দ্বারা সত্যকে সত্য করে দেখাবেন এবং কাফিরদের শিকড় কেটে দিবেন, যেন সত্যকে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত ও বাতিলকে বাতিল প্রমাণিত করা যায়।—অপরাধীদের পক্ষে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।

আর সেই সময়ের কথাও (স্মরণ কর), যখন তোমরা তোমাদের রব্-এর নিকট ফরিয়াদ করছিলে। জবাবে তিনি বলছিলেন, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে পরপর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। এ কথা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে শুধু সুসংবাদ দেয়ার উদ্দেশেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং এ জন্য যে, তোমাদের দিল যেন সান্ত্বনা পায়। অন্যথায় সাহায্য যখনই আসে, আল্লাহ্র নিকট থেকেই আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রম ও মহাবিজ্ঞানী।—আর (স্মরণ কর) সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব্ ফেরেশতাদের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন যে, আমি তো তোমাদের সাথেই রয়েছি, তোমরা ঈমানদার লোকদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে রাখো। আমি এক্ষণে এই কাফিরদের মনে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করে দিচ্ছি। অতএব তোমরা ওদের গর্দানের উপর আঘাত হান এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও।

এ আয়াত ক'টি বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য দানের ও শত্রুপক্ষের মূল শিকড় কেটে দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। অথচ এই সময় মুমিনরা সংখ্যায় যেমন ছিলেন অতি অল্প, তেমনি শক্তি–সামর্থ্য বলতেও কিছু ছিলনা। এই সময় আসল আঘাতকারী (striking force) হিসাবে অশ্বারোহী সৈন্য ছিল মাত্র একজন কি দু'জন। আর কাফিররা সংখ্যায় যেমন ছিল বিপুল, তেমনি শক্তিতে ছিল ভীষণ। কুরআনেই তাদেরকে প্রবল প্রতাপান্বিত ও শক্তিধর বলা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় মুসলিমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করতে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যেহেতু সত্যকে প্রকাশিত–প্রতিভাত করতে চেয়েছিলেন, এ জন্য মুসলিমদের প্রতি কৃত তাঁর ওয়াদা তিনি পূরণ করেছিলেন। তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য সাহায্য দান করেছিলেন। আর পরিণামে কাফিরদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছিলেন।

যুদ্ধ যাত্রাকালে নবী করীম (স) সাহাবীগণকে বলেছিলেনঃ তোমরা আল্লাহ্র বরকতের উপর ভর করে রওয়ানা হও। কেননা আল্লাহ্ আমাকে কাফির কুরাইশদের দুটি বাহিনীর যে–কোন একটি পেয়ে যাওয়ার ওয়াদা পূর্বেই করেছেন। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন। আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, আমি যেন আবু জেহেল ইবনে হিশাম, উৎবা ইবনে রবীয়া, শাইবা ইবনে রবীয়া ও অন্যান্য কাফির সরদারদের মৃত্যুস্থলগুলো চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।[১]

উক্ত আয়াতে 'কাফিরদের মূলোৎপাটন করবেন' বলে আল্লাহ্ কাফির বাহিনীর পরাজয় বরণ ও তাদের সেরা সরদারদের নিহত হওয়ার, তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার এবং গোটা কাফির শক্তির নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন। অথচ কাফির বাহিনীর সরদারগণ শীর্ষস্থানীয় বিধায় ওদের নেতৃত্বাধীন সৈন্য বাহিনীর তো পশ্চাত ও সম্মুখ সমরে সকল ধ্বংস বা মৃত্যুর হাত থেকে বহু দূরে সুরক্ষিত থাকারই কথা। আর সমুখভাগের সাধারণ সৈন্যরা সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধ্বংস হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা তো অবশ্যই কার্যকর হবে, তার প্রতিরোধের সাধ্য কারোরই নেই।

তাই দেখা যায়, বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কাফিরদের মূলোৎপাটন কার্যক্রম সম্পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী—যা কুরআন মজীদের ওহীর মাধ্যমে রাসূলে করীম (স)–কে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল—সর্বতোভাবে সফল ও কার্যকর হয়।[২]

---

১. مجمع البيان ج٤، ص٥٣٢

২. [illegible]

কুরআন যে একমাত্র আল্লাহ্‌রই কালাম—এ কালাম যে কোন মানুষ রচনা করতে পারে না, এটা তারই অকাট্য প্রমাণ।

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের নির্মূল হওয়ার ব্যাপারে আগাম খবর কেবল এই একটি আয়াতেই দেয়া হয়নি, অপরাপর আয়াতেও তার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ - سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ - (القمر: ٤٤-٤٥)

অথবা তারা বলেঃ আমরা এক সুগঠিত সুদৃঢ় গণবাহিনী, নিজেদের সংরক্ষণে নিজেরাই সক্ষম। অতি শীগ্‌গীরই এই গণবাহিনী পরাজয় বরণ করবে এবং এই সব লোককে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পালিয়ে যেতে দেখা যাবে।

এ আয়াতে সমস্ত কাফিরী শক্তির পরাজয় বরণের, তাদের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার ও তাদের দাপট নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগাম খবর দেয়া হয়েছে। বদর যুদ্ধে এই ঘটনাই সংঘটিত হয়েছে। আবু জেহল যখন তার অশ্বটিকে চাবুক মেরে প্রথম কাতারের দিকে এগিয়ে গেল, তখন বলছিলঃ 'আজ আমরা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের উপর বিজয়ী হবো'। কিন্তু আল্লাহ্‌ ওদের সমগ্র বাহিনীটিকে চুর্ণ–বিচূর্ণ করে দিলেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত, উজ্জ্বল–উদ্ভাসিত করলেন এবং তার শৃংগকে সর্বোচ্চে তুলে ধরলেন। এভাবে দ্বীনের কালেমা বুলন্দ হয়ে গেল। কাফিররা চিরদিনের জন্য পরাজয় বরণ করল, মুসলিমরা বিজয়ী হলেন, অথচ তখন কারো পক্ষে এটা কল্পনা করাও সম্ভব ছিলনা যে, মাত্র তিন শত তেরজন লোক একটি বিরাট শক্তিধর ও সুসজ্জিত বাহিনীকে তাঁরা এমনিভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। এত অল্প সংখ্যক নিরস্ত্র লোকের হাতে এতবড় একটি সশস্ত্র বাহিনীর এমনি নির্মূল হওয়া এবং ঝটিকা যেমন ধুলিকণা উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি তাদেরকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়া কেমন করে সম্ভব হয়েছিল, কোন যুদ্ধ–বিজ্ঞানই তার বাস্তব ব্যাখ্যা দিতে পারে না।[১]

(৬) কুরআনের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সংক্রান্ত আগাম খবর

কুরআন মজীদ দুনিয়ার সামনে এই দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যে, তা সাধারণ অর্থেই সকল প্রকার বিকৃতি ও অদল–বদলের কারসাজি থেকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকবে। পূর্বে নাযিল করা আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের ব্যাপকভাবে বিকৃত হওয়ার কথা সকলেরই জানা। এই প্রেক্ষিতে কুরআনের এই দাবি নিশ্চয়ই বিস্ময়কর ছিল। অথচ ভবিষ্যতে কত তিক্ত অপ্রিয় ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতে পারত। কিন্তু কুরআন অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে দাবি করেছে যে, তা রদ–বদলকারী কুচক্রী হস্তের খেলা থেকে সর্বতোভাবে সংরক্ষিত থাকবে; তা কুরআন মজীদ নিয়ে কোন খেলা করতে পারবে না। কুরআনের দাবি ছিলঃ

---

১ مجمع البيان ص ٥٢١-٥٢٣

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۔ (الحجر: ٩)

নিঃসন্দেহে আমরাই এই যিকর—কুরআন—নাযিল করেছি এবং আমরাই এর যথাযথ সংরক্ষণকারী।

এ আয়াতটি রাসূলে করীম (স)-এর মক্কী জীবনের প্রায় শেষের দিকে নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সর্বাত্মক বিরুদ্ধতা-শত্রুতার মুখে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেই এ কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা এই কালামের যত বিরুদ্ধতাই করনা কেন, তোমরা এর একবিন্দু ক্ষতি করতে পারবে না—পারবে না এতে কোনরূপ বিকৃতি সাধন করতে। কেননা এই কিতাব যেমন আমারই নাযিল করা, তেমনি এর সর্বাত্মক সংরক্ষণের পূর্ণ দায়িত্বও আমিই গ্রহণ করেছি। আর আমি যা সংরক্ষিত করতে চাইব, তাকে নষ্ট করতে পারে, এমন সাধ্য কারোই নেই।[১]

(৭) ইসলাম ও রাসূলের বিজয়ী হওয়ার আগাম সুসংবাদ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۔
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۔

(التوبة: ٣٢-٣٣)

কাফিররা আল্লাহ্‌র নূরকে মুখের ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণত্ব না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না, কাফিররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। সেই আল্লাহ্-ই তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েতের বিধান ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ব্যবস্থাসহ, যেন সে তাকে দুনিয়ার সমস্ত জীবন-বিধান ও আনুগত্য ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে দিতে পারে— মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।

এই আয়াতটিই সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে সূরা আস্-সাফ-এও উদ্ধৃত হয়েছে। এ দু'টি সূরা-ই মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল প্রায় দশম হিজরী সময়ে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (স)-এর নেতৃত্বে দ্বীন-ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এই ওয়াদাকে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করেছিলেন। গোটা আরব উপদ্বীপের উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল ও পত পত করে

---

১ تفهيم القران ج:٢

উড়ছিল। পৌত্তলিকতার এই লীলাভূমি থেকে সকল প্রকার শির্‌ক সম্পূর্ণ রূপে উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। তার পরই নবী করীম (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

তাবরাসী লিখেছেনঃ ইসলামের এই বিজয় যুক্তি–প্রমাণের অকাট্যতা এবং শক্তি–কর্তৃত্বের দাপট উভয় দিক দিয়েই সাধিত হওয়ার ব্যাপার এবং বাস্তবে তা–ই হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল প্রকার দ্বীন–এর উপর দ্বীন ইসলাম অকাট্য যুক্তি, আধিপত্য ও শক্তি–পরাক্রমের দৌলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তি–প্রমাণের দিক দিয়ে অপর কোন দ্বীন ইসলামের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, পারেও নি। আর কর্তৃত্বের দিক দিয়েও মুসলিমরা অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের উপর বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছে। শির্‌ক পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এ পর্যায়ের আর একটি আয়াত হচ্ছেঃ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ـ (الرعد: ١٧)

এমনিভাবেই আল্লাহ্ হক ও বাতিল–এর ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে তোলেন। যা ফেনা, তা উড়ে–উবে যায় আর যা মানুষকে কল্যাণ দেয়, তা পৃথিবীতে স্থিতি পায়। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা উপমা দ্বারা নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন।

এ আয়াতে এই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীন–ইসলাম চিরন্তনতা লাভ করবে। তা চিরদিন থাকবে। আর পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতা ইত্যাদি বাতিল মতবাদ বা ধর্ম ফেনার মত হাওয়ায় উড়ে–উবে যাবে।

আল্লাহ্ এই আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন সেই সময়, যখন মুসলিমগণ মক্কায় অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক, দুর্বল ও সর্ব দিক দিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা প্রতি মুহূর্ত ভয়ে কম্পমান ছিলেন, কখন শত্রুপক্ষ তাদেরকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, যেমন করে চিল মুর্গী ছানাকে নিয়ে যায়।

এ রকমেরই আর একটি আয়াত হচ্ছেঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ـ تُؤْتِىٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ (ابراهيم ٢٤-٢٥)

তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ কিভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছেন, পাক কালেমা একটি পবিত্র শক্তিশালী বৃক্ষের ন্যায়। তার মূল সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আর তার শাখা-প্রশাখা মহাশূন্যে বিস্তীর্ণ। প্রতি মুহূর্ত তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তার ফল দান করে। আল্লাহ্ মানুষকে বোঝাবার লক্ষ্যে দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করেন, যেন তারা তা থেকে উপদেশ পেতে পারে।

এ আয়াতে কালেমা তাইয়্যেবা বা পাক কালেমা বলতে আল্লাহ্ তাওহীদের কালেমাকেই বুঝিয়েছেন, যার বহু শাখা-প্রশাখা রূপে রয়েছে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম। এক মহান আল্লাহ্র একত্বের প্রতি ঈমান এমন একটি মৌল, যা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, সকল প্রকার পরিবর্তন ও বিলীনতা থেকে সংরক্ষিত। মানুষ এই কালেমা'র জোরেই বেঁচে থাকে, তার শাখা-প্রশাখার আশ্রয় গ্রহণ করে। আর প্রতি মুহূর্তই তারা এর মাধ্যমে পূর্ণত্ব লাভ করতে থাকে।

আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, পরম সত্য আকীদা ও তার হুকুম-আহকামরূপী শাখা-প্রশাখা মিলে একটি সজীব-সতেজ বিরাট বৃক্ষের ন্যায়। বৃক্ষটির মূল ও শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ় প্রতষ্ঠিত থাকে এবং তার শাখা-প্রশাখাসমূহ থাকে ঊর্ধ্বে বিস্তৃত। মানুষ তার ছায়ায় আশ্রয় পায়, তার ফল খেয়ে উপকৃত হয়। সত্য দ্বীন ও সত্য কালেমাও অনুরূপ। তা হচ্ছে তাওহীদের—ইসলামের কালেমা। তা অবশ্যই মানব মনের পর্দায় দৃঢ়তা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার শিকড়সমূহও বিস্তীর্ণ হয়ে থাকবে মনের গভীর পরতে। মানুষের বাহ্যিক জীবনে তা হবে প্রসারিত ও প্রকাশমান। তার দৌলতেই মানব সমাজে ব্যাপক শান্তি ও শৃংখলা স্থাপিত হবে। মানুষ পাবে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা, পাবে শান্তি ও স্বস্তি। তারই ফলে মানব সমাজ জীবনের সকল অধ্যায়ে ও পর্যায়ে পূর্নত্ব লাভ করবে। অতএব তা-ই হবে মানুষের চিরস্থায়ী শাশ্বত দ্বীন।

এ ক'টি আয়াতই ইসলামের ভবিষ্যত—ইসলামের বিজয়, সাফল্য ও চিরন্তনতা সম্পর্কে আগাম সংবাদ পেশ করেছে। তা পেশ করেছে এমন কঠিন মুহূর্তে যখন দ্বীন-ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আশাবাদ জাগাই ছিল অত্যন্ত দুরূহ। রাসূলে করীম (স) বৈষয়িক শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে এতই নিঃস্ব ছিলেন যে, সেই সময় এই দ্বীনের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার কথা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। তা সত্ত্বেও দ্বীন-ইসলামের উজ্জলতম ভবিষ্যতের এই আশার বাণী ওহীর মাধমে শোনানো হয়েছে।

এভাবে কুরআনে নবী-রাসূলগণের ও মুমিনদের সাফল্য সম্পর্কে আরও অনেক কথাই এসেছে। যেমনঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ - اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ - وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ -

(الصّٰفّٰت : ١٧١-١٧٣)

আমার প্রেরিত বান্দাহদের নিকট আমরা পূর্বেই ওয়াদা করেছি যে, নিশ্চই তাদের সাহায্য করা হবে। আর আমাদের সৈন্যরাই বিজয় লাভ করবে।

এ আয়াতটি মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী—বরং মধ্যবর্তীরও শেষ ভাগে নাযিল হয়েছিল। তখন মক্কায় রাসূলে করীম (স)-এর প্রচন্ড ও তীব্র বিরুদ্ধতা চলছিল এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন।[১] এ সময় প্রদত্ত এই বাণী মুসলিমদের মন-মানসে আশার সঞ্চার করলেও বাস্তব পরিস্থিতির সাথে এর কোন মিল ছিলনা। উত্তরকালে আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত ইসলামী মুজাহিদরা বিজয়ী হয়ে আল্লাহ্‌র এই কথার সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে ঘটবে এমন আগাম কথা যখন বাস্তবে সংঘটিত হয়, তখন প্রমাণিত হয় যে, সেই কথাটি মানবীয় কল্পনাপ্রসূত ছিলনা, তা ছিল মহান আল্লাহ্‌র কথা।

এ আয়াতটিও এই পর্যায়েরঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (المؤمن: ٥١)

নিশ্চয় জানবে, আমরা আমাদের নবী-রাসূলগণের ও ঈমানদার লোকদের সাহায্য এই দুনিয়ার জীবনেও অবশ্যই করে থাকি।, আর সেই দিনও করব, যে দিন সাক্ষীগণ (সাক্ষ্যদানের জন্য) দাঁড়িয়ে যাবে (কিয়ামতের দিন)।

যখন মুসলমানদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং তারা কুরাইশদের নিপীড়নের তীব্রতায় মক্কায় টিকতে না পেরে হাবশায় হিজরাত করেছিলেন, তখনকার চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থায় এ আয়াতটি নাযিল হয়ে পরম আশার বাণী শুনিয়েছিল।

এ আয়াতটিও তাইঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۔ (النور: ٥٥)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ্‌ তাদের জন্য ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের করেছেন, তাদের জন্য তাদের এই দ্বীনকে

১. تفهيم القرآن للمودودى

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের বর্তমান ভীতিজনক অবস্থাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে একবিন্দু জিনিসকেও শরীক বানাবে না। এরপরও যারা কুফর করবে, তারাই আসল সীমালংঘনকারী লোক বলে চিহ্নিত হবে।

আল্লাহ্র এই ওয়াদা যদিও আল্লাহ্ ঘোষিত সাধারণ নীতি হিসাবেই গ্রহণীয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বয়ং নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণের ক্ষেত্রে এ আয়াত বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবী সৈনিকদের সাহায্য করেছেন, বিরোধী শত্রুদের উপর তাঁদের বিজয় দিয়েছেন, এই ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের খলীফা বানিয়েছেন, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ভয়–ভীতিজনক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে পূর্ণ শান্তি–নিরাপত্তার ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন। এই পরিস্থিতির কারণেই সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্র খালেস ইবাদত করা এবং সকল প্রকার শির্ককে উৎখাত করে তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়েছিল।

এভাবে কুরআন মজীদে এমন বহু সংখ্যক আয়াত পাওয়া যাবে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় লাভের আগাম সুসংবাদ শুনিয়েছে, শত্রুদের উপর বিজয় লাভের আগাম খবর দিয়েছে। এ ধরনের সব আয়াতই 'গায়ব' পর্যায়ের সংবাদ–বাহক। উত্তরকালে তার প্রতিটি কথাই বাস্তবে সংঘটিত হয়ে সত্য রূপে প্রতিভাত হয়েছে। একটি গায়বী খবরও মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি, কোন আগাম সংবাদই অসত্য প্রমাণিত হয়নি। এর কোন একটিও যদি আল্লাহ্র কথা না হত—যা ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল—হত মানুষের কল্পিত, তাহলে রাসূলের নবুয়্যাত ও কুরআনের আল্লাহ্র বাণী হওয়াকে লোকেরা কখনই স্বীকার করে নিত না। কিন্তু যেহেতু তার প্রত্যেকটিই আল্লাহ্র কথা, তাই কোন একটিও অসত্য হতে পারে না। দুনিয়ার মানুষ এই জন্যও তার সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও কোন কোন আগাম সংবাদের তাৎক্ষণিক বাস্তবতা দেখতে না পেয়ে কাফির–মুনাফিকরা নানা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করেছে, করার সুযোগ পেয়েছে; কিন্তু খুব বেশী দিন যেতে না যেতেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে ওদেরকে লা–জবাব করে দিয়েছে। যেমনঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ (الفتح: ٢٧)

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সঠিক সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যা পুরোপুরিভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ্ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণমাত্রার শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে প্রবেশ করবে, নিজেদের মাথা মুন্ডন করবে ও চুল কাটাবে। তোমরা এই সময় কোন ভয়ের সম্মুখীন হবে না। তিনি সেই কথা জানতেন, যা তোমরা জানতে না। এই কারণে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি এই নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দিয়েছেন।

ইতিহাস ও নবী-চরিতের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা একদা রাসূলে করীম (স)-কে মদীনায় স্বপ্নে দেখালেন যে, মুসলিমরা মসজিদে হারাম-এ প্রবেশ করেছে। তিনি এই স্বপ্নের বিবরণ সাহাবীদের শুনালেন। এবং একদিন মক্কা প্রবেশের লক্ষ্যে তাঁদের নিয়ে রওয়ানা হলেন। তিনি যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছার পর সমুখের অবস্থা সম্পর্কে খবর জানবার উদ্দেশ্যে কতিপয় লোক পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা এসে সংবাদ দিলেন যে, লুয়াইর পুত্র কায়াব ও আমের মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে বাধাদানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। অতঃপর তিনি হুদাইবিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং কুরাইশদের সাথে বহু কথোপকথনের পর সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করলেন। তাতে শর্ত করা হয়েছিল যে, দশ বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষে কোন যুদ্ধ হবেনা, এবারে রাসূল (স) ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানরা ফিরে যাবেন, আগামী বছর উমরা করার জন্য তরবারি খাপের মধ্যে ভরে রেখে মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং মাত্র তিনটি দিন অবস্থান করতে পারবেন।

হুদাইবিয়া থেকে রাসূলে করীম (স) সাহাবীদের নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। সাহাবীগণের মানসিক অবস্থা এই সময় অত্যন্ত খারাপ ও নৈরাশ্যে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কেননা একে তো তাঁরা বড় আশা করে এসেছিলেন যে দীর্ঘদিন পর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটলো না; রাসূলে করীম (স)-এর স্বপ্নও সত্য হলো না। তাঁরা উমরাও করতে পারলেন না, মাথা মুন্ডন বা চুল কাটাও হলো না। ঠিক এ পরিস্থিতিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত বলে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (স)-কে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা নয়। তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ অবশ্যই মসজিদে হারাম-এ প্রবেশ করবেন। এ বছর বা এই যাত্রায় তা হয়নি বলে অদূর ভবিষ্যতে তা হবেনা, এমন নয়। আগামী বছর তা অবশ্যই হবে।

আর বাস্তবেও তাই দেখা গেল। এই আয়াত নাযিল হওয়া ও মসজিদে হারাম-এ প্রবেশের মাঝে মাত্র একটি বছরের ব্যবধান হয়েছিল। স্মরনীয় যে, আয়াতটিতে মসজিদে হারাম-এ প্রবেশ করা সংক্রান্ত আগাম খবরকে 'ইনশাআল্লাহ্'—'আল্লাহ্ চাইলে' কথা দ্বারা শর্তাধীন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ সে বছরই মসজিদে হারাম-এ

প্রবেশ ঘটুক তা চান নি বলেই তা তখন হয়নি। তিনি চেয়েছেন, এই প্রবেশের পূর্বে কুরাইশদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদিত হোক। তা হয়েছে। তাছাড়া এর আরও একটি দিক রয়েছে। তাহলো, এই একটি বছরে কেউ মরে গেলে অথবা পরবর্তী বছর যাত্রা কালে কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার পক্ষে মক্কায় যাওয়া ও মসজিদে হারাম-এ প্রবেশ করা সম্ভবপর হবে না। মূল কালামে ইনশাআল্লাহ্ বলার এ-ও একটি বড় কারণ।[১]

কুরআন মজীদের আগাম খবর প্রদান সংক্রান্ত আরও দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গটি শেষ করতে চাই।

তার একটি হচ্ছেঃ কুরাইশ দুশমনদের উপর মুসলমানদের বিজয় লাভ, পৌত্তলিকতার লীলা কেন্দ্র মুসলমানদের অধিকারে আসা এবং মানুষের দলে দলে দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ করা সংক্রান্ত আগাম খবর। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا - (سورة النصر)

যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং হে নবী! তুমি দেখতে পাবে, জনগণ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে, তখন তুমি তোমার রব্ব-এর হামদ্ সহকারে তাঁর তাস্‌বীহ কর এবং তাঁর নিকট মাগফিরাত চাও। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা কবুলকারী।

এ সম্পূর্ণ সূরাটি বিদায় হজ্জকালে আইয়্যামে তাশ্‌রীকের মাঝামাঝি সময়ে মিনয়া নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বাস্তবিকই রাসূল করীম (স)-কে তাঁর শত্রুমন্ডলীর উপর বিজয় দান করেছিলেন, মক্কা বিজিত হয়েছিল, মানুষ দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়েছিল। আর এ কারণেই আল্লাহ্ তাঁর নবীকে তাঁর (আল্লাহ্‌র) তাসবীহ্ করার আদেশ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সংবাদ এর পূর্বে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে নাযিল হয়েছিলঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا - (الفتح : ١)

আমরা তোমাকে হে নবী সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।

---

১. سيرة ابن هشام ج ٢ غزوة الحديبية ص: ٣٠٨ - ٣٢٢

কেননা হুদাইবিয়ার সন্ধিই মক্কা বিজয়ের পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছিল। মুসলমানরা মসজিদে হারাম-এ প্রবেশ করতে না পেরে ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যখন মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখনই এই আয়াত নাযিল হয়েছিল, তাৎক্ষণিক অবস্থার সাথে যার কোন মিল ছিল না। কিন্তু রাসূলে করীম (স) এ আয়াত পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়েছিলেন। এর দুই বছর পর মক্কা বিজয় বাস্তবে সম্ভব হয়।

এভাবে 'সূরা আস্-সফ'-এর আয়াতঃ

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - (الصّف: ١٣)

আর দ্বিতীয় যা দেয়া হবে, তা তুমি পছন্দ কর, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসা সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়।

এই নিকটবর্তী বিজয় বলতে আল্লাহ্ মক্কা বিজয়ও বুঝিয়ে থাকতে পারেন, অথবা বুঝিয়েছেন কিছু কাল পরে সংঘটিত রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্য জয়।[১]

দ্বিতীয় হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার পর যারাই মুরতাদ হয়ে যাবে, তাতে কারোর কিছু ক্ষতি হবে না। কেননা অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক জনগোষ্ঠী জাগিয়ে দিবেন, যারা একদিকে মুমিনদের প্রতি হবে অত্যন্ত দয়াবান, সদাচরণকারী, ইনসাফকারী এবং অপরদিকে কাফির ও কুফরী শক্তি-নীতির প্রতি প্রচন্ড কঠোর ও অনমনীয়। যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌র বাণী হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (المائدة: ٥٤)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি স্বীয় দ্বীন ত্যাগ করে ভিন্ন মত গ্রহণ করে, (তা করুক না, তাতে কিছু আসবে-যাবেনা), আল্লাহ্ শীগ্‌গীরই এমন এক লোকসমষ্টি নিয়ে আসবেন, যাদের আল্লাহ্ ভালোবাসবেন, তারাও ভালোবাসবে আল্লাহ্‌কে, যারা মু'মিনদের প্রতি হবে অত্যন্ত নম্র, দয়ার্দ্র, বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠিন-কঠোর, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং

---

১. مجمع البيان ج٥ ص١٠٨-٢٨٢

কোন উৎপীড়কের উৎপড়ানের একাবিন্দু পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ বিপুল-বিশাল উপায়-উপকরণের মালিক, তিনি সর্বজ্ঞ।

এ আয়াতটি গোটা সূরা 'আল-মায়েদাহ' সহ হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নাযিল হয়েছিল। এ দৃষ্টিতে বলা যায়, হুদাইবিয়ার সন্ধিই আরব উপদ্বীপে পুরাতন সমাজ ও নেতৃত্বকে ভেঙে দিয়ে এক নবতর সমাজ ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ছিল মহান আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তের কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন সেই লোকদেরকে, যাদেরকে রাসূলে করীম (স)-এর নেতৃত্বে এই নক্শা অনুযায়ী গড়ে তুলছিলেন। উত্তরকালে সেই লোকদের সমষ্টিই ছিল আরব দেশের সমাজ প্রধান ও নেতা।

বক্ষ্যমান আলোচনার উপসংহারে একটি জটিল ও একালের চিন্তাশীল মানুষের মনে প্রশ্নকারে জাগ্রত বিষয়ের অবতারণা করত চাই। বিষয়টি হচ্ছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান প্রসঙ্গ।

ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা

কুরআনে অনেক বিস্ময়কর ভবিষ্যতদ্বাণী রয়েছে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে। কুরআন তাদেরকে এমন সহজ সহজ কাজের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যা ছিল তাদের সাধ্যায়ত্ত। তারা সে কাজগুলো অতি সহজেই সম্পাদন করতে সমর্থ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশ্চর্যের বিষয়, তারা সে কাজগুলো সম্পাদন করতে যেমন অক্ষম রয়েছে, তেমনি কুরআনের চ্যালেঞ্জ অসত্য প্রমাণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন হচ্ছে সেই মহান সত্তার কালাম, যাঁর হাতে একান্তভাবে নিবদ্ধ মানুষের হৃদয় ও মন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ -

(البقرة: ٩٤-٩٥)

ওদের বল, পরকালের ঘর সমগ্র মানুষ ব্যতীত কেবল তোমাদের জন্যই যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের মৃত্যু কামনা করাই বাঞ্ছনীয়; অবশ্য যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাক।

কিন্তু নিশ্চয়ই জানবে, ওরা কক্ষণই মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা তারা নিজেদেরই হাতে কামাই করে যা কিছু অগ্রে পাঠিয়েছে, তা-ই হচ্ছে মৃত্যু কামনা না করার কারণ। আল্লাহ্ এই জালিমদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবহিত।

এই ইয়াহুদীদের সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছেঃ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ـ (البقرة : ٩٦)

তোমরা বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে অন্য সব লোক অপেক্ষা অধিক বেশী লোভী দেখতে পাবে। এব্যাপারে তারা মুশরিকদের চেয়েও অগ্রসর। তাদের প্রতিটি ব্যক্তি কোন-না-কোনভাবে হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করে। অথচ এই দীর্ঘজীবন যে তাদেরকে আযাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেনা, তা নিঃসন্দেহ। তারা যা কিছু করছে তা সবই আল্লাহ্র গোচরীভূত।

এ আয়াতদ্বয়ের প্রেক্ষিত হচ্ছে, ইয়াহুদীরা সব সময় এই ধারণা পোষণ করত যে, তারা আল্লাহ্র খুবই প্রিয়পাত্র এবং পরকালীন মুক্তি কেবল তাদের জন্যই নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত। এ কারণেই তারা স্পষ্ট কণ্ঠে দাবি করতঃ 'জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না, করলেও সামান্য কয়েকদিনের জন্য মাত্র।'

তাদের এই দাবির প্রতিবাদ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের দাবিই যদি সত্য হয়, তাহলে তোমরা কায়মনোবাক্যে মৃত্যু কামনা কর। কেননা মরলেই তো তোমরা সেই সুখ-সুবিধা পাবে, যার দাবি তোমরা করছ। মানুষকে যখন কষ্টসাধ্য জীবন ও সকল কষ্টমুক্ত জীবনের মধ্যে কোন একটিকে বাছাই করে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রথমটির পরিবর্তে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করবে। আর পরকালীণ জীবনে তাদের জন্য মহাসুখ প্রস্তুত হয়ে আছে বলে তারা নিজেরাই দাবি করছে। তাদের মুখের এই দাবি সত্য হলে অবিলম্বে তাদের মরণ হোক, এ কামনাই করা উচিত। দুনিয়ায় তাদের আর একদিনও বাঁচতে চাওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। দুনিয়ার লোকদের মধ্যে ইয়াহুদীরাই মৃত্যুকে সবচাইতে বেশী এড়িয়ে যেতে চায়; ওরা বাঁচতে চায় হাজার বছর ধরে। ওরা মনে করে, যে অপরাধ তারা করেছে, মৃত্যুর পরই তার আযাব শুরু হয়ে যাবে। তাই যতদিন এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকা যায়, ততদিন আযাব থেকেও বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।

তাদের এই ধারণাকেও ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। দুনিয়ায় বেঁচে থাকলেই আযাব ভোগ থেকেও তারা নিস্কৃতি পাবে, তা মনে করার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। তাদের বাস্তব ইতিহাসই তাদের মুখের দাবির ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ওদের সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বলে দিয়েছেনঃ

قُلْ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ (الجمعة : ٦-٧)

বল, হে ইয়াহুদী হয়ে যাওয়া লোকেরা। তোমরা যদি নিজেদেরকে আল্লাহ্র একান্ত বন্ধু মনে কর অন্যান্য মানুষ ছাড়া (বা তাদের অপেক্ষা), তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর—অবশ্য তোমরা যদি সে ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাক। না ওরা কখনই মৃত্যু কামনা করবেনা ওদের হস্ত অগ্রে যা কিছু পাঠিয়েছে, তার অশুভ প্রতিফলের ভয়ে। আর আল্লাহ্ এই জালিমদের বিষয়ে খুব ভালো রকম অবহিত।

আল্লামা জুরকানী লিখেছেন, অন্ততঃ মুখে মুখে মৃত্যু কামনা করাও তো ওদের সাধ্যায়ত্ত ছিল। মুখে বলতে পারত, হ্যা, আমরা মরণ চাই। তাহলেও তারা কুরআনের এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারত। তাদের মুখে বলা এ কথাই কুরআনের চ্যালেঞ্জের জবাব হয়ে যেত। তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)–কে নির্বাক করে দিতে পারত। কিন্তু সেটুকু করতেও তারা সাহস পায়নি। মরণকে তারা এতই ভয় পায় যে, কোন ইয়াহুদী জীবনে কোন দিন মুখে বলেছে যে, হ্যা, আমি মরতে চাই, ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।[১]

তবে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ স্পষ্ট করে তোলে যে, আসলে মুখ দিয়ে মৃত্যু কামনা করা কুরআনের দাবি নয়। বরং প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ হিসাবে আন্তরিকভাবেই মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছিল তাদেরকে, যদিও তাদের বেঁচে থাকার আন্তরিক কামনার কথা ছিল সতত প্রকাশমান।

কুরআন ঘোষণা করেছে, নবী করীম (স) ও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে ইয়াহুদীরা কখনই বিজয়ী হতে পারবে না, বরং প্রত্যেক বারই মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে। ইরশাদ হয়েছেঃ

---

১ مناهل العرفان ج ٢، ص ٢٧٦

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (ال عمران: ١٢)

অতএব হে নবী! যারাই তোমার তাওহীদী দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তাদের বলে দাও যে, সেদিন খুব দূরে নয় যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে। আর জাহান্নাম তো অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত করার পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে 'কাইউনকা' বাজারে মদীনার ইয়াহুদীদের একত্রিত করলেন এবং তাদের সম্বোধন করে বললেনঃ 'হে ইয়াহুদী সমাজ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। বদর যুদ্ধে কুরাইশদের উপর যে রকম বিপদ এসেছে, তোমাদের উপরও তেমনি বিপদ আসতে পারে। অতএব সে বিপদ আসার পূর্বেই তোমরা ইসলাম কবুল কর। তোমরা নিঃসন্দেহে জানতে– বুঝতে পেরেছ, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত নবী–রাসূল। তোমাদের কিতাবেও তা–ই লিখিত রয়েছে।'

তখন ইয়াহুদীরা বললঃ 'হে মুহাম্মাদ! তুমি এক অশিক্ষিত ও অক্ষম জনগোষ্ঠীকে পরাজিত করেছ বলে ধোঁকা খেওনা। ওরা যুদ্ধ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফলে তুমি একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে গেছ! খোদার নামের শপথ! আমরা যদি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে যাই, তাহলে আমরা কি রকমের লোক তা জানতে পারবে'।

এই সময়ই উপরোদ্ধৃত আয়াতটি নাজিল হয়েছিল[১] এবং পরবর্তীতে আয়াতে বর্ণিত আগাম খবর সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। রসূলে করীম (স) শুধু মদীনায়ই নয়, সমগ্র আবর উপদ্বীপের ইয়াহুদী ও কাফির–মুশরিকদের উপর জয় লাভ করেছিলেন।

এই ইয়াহুদীদের কলঙ্কিত অতীত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কুরআন অনেক কথা বলেছে। ইয়াহুদীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কুরআন যা বলেছে, বিগত চৌদ্দশ' বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তার একটি কথাও একবিন্দু অসত্য প্রমাণিত হয়নি। বলা হয়েছেঃ

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۚ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ـ
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ

---

১. مجمع البيان ج: ١ ص: ٣١٣

اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (آل عمران: ١١١-١١٢)

ওরা তোমার কোন ক্ষতি–ই করতে পারবে না। খুব বেশী কিছু করলেও হয়ত সামান্য কষ্ট দিতে পারে। আর ওরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সমুখ–যুদ্ধে ওরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে এবং এমন অসহায় হয়ে পড়বে যে, তারা কোন দিক থেকেও সাহায্যপ্রাপ্ত হবেনা।

ওরা যেখানেই গেছে সেখানেই ওদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও ওরা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে অথবা কোন জন–গোষ্ঠীর নিকট কিছু আশ্রয় পেয়ে থাকলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্‌র গযব ওদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত করে ফেলেছে। ওদের উপর অভাব,দারিদ্র্য ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই সব কিছু হয়েছে এ কারণে যে, ওরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অমান্য করছিল, নবী–রাসূলগণকেও ওরা অন্যায়ভাবে ও অকারণে হত্যা করেছে। বস্তুতঃ এ সব ওদের নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির অনিবার্য পরিণতি মাত্র।

এ আয়াতদ্বয়ে বহু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছেঃ

১. ইয়াহুদীরা ষড়যন্ত্রকারী জনগোষ্ঠী এবং হীন, নীচ প্রকৃতির লোক। ওরা সমুখ–যুদ্ধে একবিন্দু দাঁড়াতে বা টিকতে পারে না। তবে ওরা ষড়যন্ত্র বা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের ক্ষতি করতে বা সামান্য হলেও কষ্ট দিতে পারে।

২. ওরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে নামলে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

৩. ধাতব মুদ্রার উপর যেমন লেখা বা ছবি অংকিত হয়, ঠিক তেমনি ওদের উপর লাঞ্ছনা–অপমান মুদ্রিত করে দেয়া হয়েছে। ওরা লাঞ্ছিত অপমানিত হবেই। তবে তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে দু'টি অবস্থার কোন একটি হলেঃ হয় ওরা আল্লাহ্‌র রজ্জু আকড়ে ধরবে, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, নতুবা কোন জনশক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে, যা ওদের সাহায্য করবে, ওদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিবে।

৪. দারিদ্র্য–ও ওদের ললাটে লিখে দেয়া হয়েছে। ওরা ভয়–ভীতি ও দরিদ্রতার মধ্যেই জীবন কাটাতে বাধ্য হবে। একথা সত্য যে, ওদের মধ্যে কোটি কোটি ডলারের মালিক রয়েছে। কিন্তু ওরা ভয়ানক কৃপণ; ওদের হাতের আংগুলের ফাঁক দিয়ে একটি কড়িও গড়িয়ে পড়তে পারে না। কেননা ওরা দারিদ্র্যকে সাংঘাতিকভাবে ভয় করে। ওরা অত্যন্ত লোভী; দুনিয়ায় ওদের মত লোভী মানুষ আর পাওয়া যাবে না। ওরা অল্পে তুষ্ট থাকতে পারেনা, জানেও না। ওরা ধন–সম্পদের স্তূপের উপর বসে থাকলেও

ওদের হীনমন্যতা, নীচতা ও দারিদ্র্যের তীব্রতা কখনই দূর হবে না। সাহসিকতা বলতেও ওদের কিছু নেই।

৫. ওদের উপর আল্লাহ্‌র গযব সব সময়ই বর্ষিত হয়েছে ও হতে থাকবে। পূর্ববর্তী আয়াতে আহলি কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ আয়াতে 'ওরা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না' বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে—একথা সত্য। কিন্তু এই আহলি কিতাব বলতে আল্লাহ্‌ ইয়াহুদীদেরকেই বুঝিয়েছেন। কেননা আয়াতের শেষে যে নবী–রাসূলগণকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে, তা প্রধানতঃ ইয়াহুদীদেরই কাজ।

এ কথার দলীল কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিঃ

اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاۤءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۔ (البقرة : ٦١)

(মূসা তাঁর জাতির লোকদের বললেন) 'কোন শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস গ্রহণ কর; তোমরা যা চাও, সেখানে তা পাওয়া যাবে।' শেষ পর্যন্ত পরিণতি এই হলো যে, লাঞ্ছনা অপমান–অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবে পরিবেষ্টিত হলো। এরূপ পরিণতির কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করেছিল এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছিল। আর এ–ও ছিল তাদের নাফরমানী ও শরীয়াতের সীমা লংঘনের ফল।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে সাধারণভাবে যা বলা হয়েছে সমগ্র আহলি কিতাব সম্পর্কে, তার আসল লক্ষ্য ইয়াহুদীরাই।

আর উপরোদ্ধৃত আয়াতে 'ওরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, খুব বেশী কিছু করলেও হয়ত সামান্য কষ্ট দিতে পারে। আর ওরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সমুখ–যুদ্ধে ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করবে' যে সব কথা বর্ণিত হয়েছে, তা বলা হয়েছে মদীনার ইয়াহুদীদের সম্পর্কে, যা বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল মুসলমানদের সাথে বনু নজীর, বনু কুরাইজা ও বনু কাউনকা এই তিনটি প্রধান ইয়াহুদী গোত্রের শুরু করা যুদ্ধে। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল; কিন্তু বেশীক্ষণ টিকতে পারেনি—পারেনি একবিন্দু দৃঢ়তা দেখাতে। শেষ পর্যন্ত ওরা মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এটা ছিল কুরআনের দেয়া একটা গায়বী খবর, যা পরবর্তীকালে বেশীদিন যেতে না যেতেই স্বয়ং রাসূলে করীম (স)–এর জীবদ্দশাতেই

বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি গোটা আরব উপদ্বীপটিকে এই সব ষড়যন্ত্রকারী মানবতার দুশমন ইয়াহুদী গোত্রসমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে নিয়েছিলেন। এ কাজে সময় খুব বেশী লাগেনি, আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরও সময় বেশী অতিবাহিত হয়নি। ওরা কোন দিক থেকে এক বিন্দু সাহায্যও পায়নি। 'ওরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, করলেও সামান্যই' এর অর্থ হালকা ধরনের ক্ষতি, যার প্রভাব ব্যাপক ও গভীর নয়। যেমন মুখে গালাগাল করা, নবী করীম (স)–এর পিছনে লেগে যাওয়া ইত্যাদি। যেমন খায়বর যুদ্ধকালে ঘটেছিল।

এ আয়াতটিতে যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে, তা ছিল রাসূলে করীম (স)–এরই জীবনকালীন ব্যাপার। আয়াতটি নিয়ে একটু চিন্তা–ভাবনা করলেই তা বুঝতে পারা যায়।

ফলে এ আয়াতটি ও পরে সংঘটিত ঘটনাবলী নবী করীম (স)–এর নবুয়্যাতের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।[১]

পরে উদ্ধৃত আয়াতটিতে ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চেপে বসা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তা–ও রাসূলে করীম (স)–এর জীবনকালীন ঘটনা হতে পারে। তবে এ পর্যায়ে দু'টি কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্যঃ

প্রথম ঃ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ 'ওদের উপর লাঞ্ছনা–গঞ্জনা–অপমান চাপিয়ে দেয়া হয়েছে' কথাটি পাঠ করলেই মনে হয়, উভয় আয়াতে এই কথাটি অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত এবং সমস্ত ইয়াহুদী জনগোষ্ঠীই এর মধ্যে শামিল। স্পষ্ট মনে হয়, আয়াতটির বক্তব্য হচ্ছে, ইয়াহুদীদের সৃষ্টি করা হয়েছে যে মাটি দ্বারা, তাতেই লাঞ্ছনা–গঞ্জনা–অপমান, পরাজয়–পদানতি ও দুঃখ–দারিদ্র্য মিলিয়ে–মিশিয়ে একাকার করে দেয়া হয়েছে। ওদের প্রকৃতিই এমনি। তাই ওদের বংশধররাও কোন কালে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে না।

দ্বিতীয় ঃ ওদের উপর এই অবস্থা চাপিয়ে দেয়ার কারণ হিসাবে মূল আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। একটি, আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা এবং তাঁর প্রতি কুফরী করা। আর এব্যাপারে সমস্ত ইয়াহুদী সমাজই অভিন্ন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ওরা সব সময় ওদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করে চলে। আর তাদের অনুসরণ করেই নবীগণকে হত্যা করে।

রাসূলে করীম (স)–এর সমসাময়িক ইয়াহুদীরা তাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় বীভৎস কার্যকলাপ সমর্থন করেছে, সে সবের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ফলে এরাও তাদেরই মত হয়ে গেছে। কেননা যে লোক অপর লোকদের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীনদের কার্যকলাপকে

১. مجمع البيان ج ١ ص ٤٨٨

এদেরও কার্যকলাপ রূপে গণ্য করেছেন। অতএব তাদের সকলেরই উপর এই লাঞ্ছনা-অপমান চেপে বসা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতই হয়েছে। আর রাসূলে করীম (স)-এর সময়কার ইয়াহুদীরা যদি এ কারণেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের অনুসারী বর্তমান সময়ের ইয়াহুদীদেরও অনুরূপ অবস্থা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এটা তো হতে পারেনা যে, একই কারণে কিছু লোকদের একটা বিশেষ অবস্থা দেখা দিবে আর অপর লোকেরা তার উর্ধ্বে থাকবে। কেননা এই গোটা বংশ ও সম্প্রদায়ের অপকর্মের কারণেই তাদের সকলের অবস্থা একই রূপ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۔ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۔ (ال عمران: ١٨١-١٨٢)

আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ দরিদ্র, কিন্তু আমরা ধনী। তাদের এ কথাও আমরা লিখে রাখব। আর ইতিপূর্বে তারা যে নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত, তা-ও তাদের আমল-নামায় রক্ষিত হবে। (যখন চূড়ান্ত ফয়সালার সময় উপস্থিত হবে তখন) আমরা তাদের বলবঃ লও, এখন জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর'। এ পরিণতি তোমাদের নিজেদেরই অর্জিত। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্দের জন্য কখনই জুলুমকারী নন।

বস্তুতঃ কুরআন নাযিল হওয়ার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তকার শতাব্দীগুলোতে কুরআনের সব ক'টি ভবিষ্যদ্বাণীই বাস্তবায়িত হয়েছে, সব আগাম খবরই পুরাপুরি সত্যে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের অধ্যায়গুলো উল্টালেই এ কথার যথার্থতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে।

এ পর্যায়ে প্রাচীনতম ইতিহাসের একটি ঘটনা স্মরণীয়। বখতে নসর 'ইউরাশিলমে'র (যেরুযালিমের) অধিকাংশ অধিবাসীকে বন্দী করে দাস বানিয়ে নেয়। এটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সনের ঘটনা। এর পর খৃষ্টপূর্ব ৩০২ সনে সুরিযার ইয়াহুদী রাজা-বাদশাহ্দের উপর ভারী কর ধার্য করা হয়—চালানো হয় নির্মম অত্যাচার।

ইসলামের বিজয় লাভের পরও তাদের লাঞ্ছিত হওয়ার ইতিহাস অব্যাহত রয়েছে। স্বয়ং নবী করীম (স) বনু কায়নুকা ও বনু-নজীর গোত্রদ্বয়কে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করেন এবং বনু কুরাইজা গোত্রের লোকদের হত্যা করেন।

পাশ্চাত্যে খৃষ্টানদের অভ্যুদয়ের পর বিভিন্ন খৃষ্টান প্রধান দেশে ইয়াহুদীদের উপর অত্যাচারের 'ষ্টীম রোলার' চালানো হয়। ফলে তারা আন্দালুসিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানকার মুসলিম শাসকগণ তাদের প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই আন্দালুসিয়া যখন খৃষ্টান কবলিত হয়, তখন আবার তারা ইয়াহুদীদের উপর নির্মম অত্যাচার চলাতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে স্পেন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, এই সময় তাদের বিপুল সংখ্যা উপকূলে বসবাসকারী জলদস্যুদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাদের ধনমাল সব লুটে নিয়ে তাদের দাস বানিয়ে রাখে।

এতো তাদের অবস্থা যারা ক্ষুধা ও মহামারীতে মরে যায়নি। পরে এদেরও অনেককে ধ্বংস করা হয়। এক পর্যায়ে পুর্তগালের রাজার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আশী হাজার ইয়াহুদী তথায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু এখানে তারা স্পেনেরও তুলনায় অনেক বেশী নিপীড়ন সইতে বাধ্য হয়। তাদের চৌদ্দ বছরের উর্ধ্ব বয়স্কদের সেদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং মা'দের কোল থেকে শিশুদের কেড়ে নিয়ে খৃষ্টান ধর্মানুযায়ী তাদের লালন পালন করা হয়। ফলে তারা খৃষ্টান রূপেই পরিচিত হয়।

পাশ্চাত্যের শক্তিধররা ইয়াহুদীদেরকে স্পেন ও পুর্তগাল থেকে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ইংলন্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম,হল্যান্ড, ইটালী, জার্মানী ও রাশিয়া থেকেও তাদের বহিষ্কার করা হয়।[১]

বিগত শতাব্দীসমূহ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী এমন কোন নির্যাতন ও নিপীড়ন নেই, যা তাদের উপর চালানো হয়নি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, প্রত্যেকটি সমাজ ও জনগোষ্ঠীই ষড়যন্ত্রকারী হীন চরিত্রের ইয়াহুদীদেরকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। কেননা ওদের মত লোভী, হীন ও নীচ মানসিকতা দুনিয়ার অপর কোন মানুষের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরা অন্য কোন মানুষের সাথে মিল–মিশ রক্ষা করে চলতে বা থাকতে পারে না। ওরা আজ পর্যন্ত মানুষের সাথে কৃত কোন ওয়াদাই পূরণ করেনি। কেননা ওরা নিজেদেরকে দুনিয়ার অন্যান্য সব জাতির তুলনায় অত্যন্ত উঁচু ও বিশিষ্ট জাতি বলে মনে করে। তালমূদ গ্রন্থের শিক্ষার দোহাই দিয়ে ওরা অন্য যেকোন লোকের ধন–সম্পদ কেড়ে নিতে প্রস্তুত। তার কারণ, অন্য লোকদের ধন–সম্পদকে ওরা পরিত্যক্ত মনে করে এবং নিজেদেরকে মনে করে সেই সবের নিরংকুশ মালিক হয়ে বসার একমাত্র অধিকারী।

এ কারণেই কুরআন মজীদ চৌদ্দশ' বছর পূর্বে ঘোষণা করার প্রয়োজন মনে করেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওদের উপর সব সময়ই এমন লোকদেরকে ক্ষমতাশীল বানিয়ে দিবেন, যারা কিয়ামত পর্যন্ত ওদের উপর অমানুষিক জুলুম ও নিঃপীড়ন চালাতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

---

১. 'اليهود فى القرآن' গ্রন্থে এই পর্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۔ (الاعراف: ١٦٧)

আরও স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব্ব ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি বনু–ইসরাঈলীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা এমন সব লোককে ক্ষমতাসীন বানিয়ে দিতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম নির্যাতনে পীড়িত করতে থাকবে। নিশ্চিতই তোমার রব্ব শাস্তিদানে ক্ষীপ্র এবং নিশ্চিতই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান।

কুরআন নাযিল হওয়ার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসরাঈলী বা ইয়াহুদীদের ইতিহাস কুরআনের এই ঘোষণাকে সর্বতোভাবে সত্যায়িত করে দিয়েছে। ইতিহাসের কোন একটি অধ্যায়েও এর একবিন্দু ব্যতিক্রম হয়েছে, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। বনু–ইসরাঈলীদের উপর সব সময় অত্যাচারী শাসকের ক্ষমতাসীন হওয়া কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ফয়সালা। এর ব্যতিক্রম হওয়া কখনই সম্ভব নয়। এটা তাদের নিজেদের দুষ্ককের্মরই অনিবার্য পরিণতি। তবে যদি কেউ খালেসভাবে তওবা করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহ্‌র আশ্রয়–রজ্জু শক্তভাবে ধারণ করে, কেবল তাহলেই সে উক্ত অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যেমন ক্ষীপ্র আযাব দানকারী, তেমনি তিনি অতীব ক্ষমাশীলও।

এই প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে বিগত ত্রিশ বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে 'ইসরাঈল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনমনে একটি প্রশ্ন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। ইয়াহুদীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, অন্য কোথাও না হলেও অন্ততঃ ফিলিস্তিনের একটি বিশাল এলাকা জুড়ে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং দিন দিন তার শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া ও নিকটবর্তী এলাকা সমূহ দখল করে নেয়া কি আল্লাহ্‌র উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী নয়? বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল রাষ্ট্র একটি মহাশক্তিতে পরিণতি হয়েছে। আশেপাশের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ইসরাঈলের ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত, এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে?

এ প্রশ্নের জবাবে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, সৃষ্টিলোকে ও বিশেষ করে মানব সমাজে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা (مَشِيَّة) প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এ আইনে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন পার্থক্য হয় না, তেমনি হয় না জাতিতে জাতিতে। যেমন নদীতে নৌকাডুবি হলে সাতার কাটতে সক্ষম ও অভ্যস্ত ব্যক্তি নিরাপদে কিনারে পৌছতে পারে। আর যে তা জানেনা—সক্ষম নয়, সে ডুবে মরে। যে লোক জমি চাষ

করে বীজ বপন করে, সে–ই সোনার ফসল কাটতে পারে। যে তা করে না,তার পক্ষে ফসল পাওয়া সম্ভব হয় না। এ দুনিয়ায় শুধু ঈমানই তো আর ফসল ফলাবে না, কুফর–ও ফলায় না শুধু কাঁটা। ঈমান ও কুফরের ভূমিকা বস্তুগত শক্তির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এটাই এ বস্তুগত দুনিয়ার বাস্তব ব্যবস্থা। এখানে কার্য ও কারণের নিয়ম বিজয়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর। যে লোক শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার লক্ষ্যে যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবে, শত্রুদের মুকাবিলায় টিকে থাকা ও বিজয়ী হওয়া তার পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। সে যদি নাস্তিক আল্লাহ্‌দ্রোহী হয়ও, তবু তাতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। শক্তিমান দুর্বলের উপর বিজয়ী হবে, এটাই সাধারণ নিয়ম। তাই যে লোক এ ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করবে, শত্রুর মুকাবিলায় টিকে থাকার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না, সে নির্ঘাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে একজন অলী–আল্লাহ্ ও মুমিন–সিদ্দীকই হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই রাসূলে করীম (স)–এর সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (الانفال ٤٦)

এবং তোমরা পরস্পর ঝগড়া–বিবাদ ও দ্বন্দ্ব–কলহ করো না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। তোমাদের প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। বরং তোমরা পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে সকল কাজ সম্পন্ন কর। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ্ এই ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।

রাসূলে করীম (স)–এর নেতৃত্বে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুতার ফলে যে বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি ইরশাদ করেছন। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, বিজয়ী শক্তি হয়ে থাকা মুসলমানদের কোন বংশীয় বৈশিষ্ট্য নয়, বংশানুক্রমিকভাবে পরবর্তী মুসলমানরা আপনা থেকেই তা পেয়ে যাবে না। আসলে তা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, রাসূলের আনুগত্য ও পারস্পরিক মিল–মহব্বতেরই পরিণতি। তাই এর পরিবর্তে এর বিপরীত ভাবধারা যদি কখনও কোথাও দেখা দেয়, তাহলে তার দুঃখজনক পরিণতি অনিবার্য হয়ে দেখা দিবেই। সত্য কেবলমাত্র এজন্য তো চিরকাল বিজয়ী হয়ে থাকবে না যে, তা সত্য। বাতিলও চিরকাল পরাজিত ও পদানত হয়ে থাকবে না কেবল এ কারণে যে, তা বাতিল। রবং এখানে—বিশ্বব্যাপী সদা কার্যকর নিয়ম রয়েছে। সমাজ–সমষ্টি তার ভিত্তিতেই গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের জারী করা এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম সাধারণতঃ হতে দেন না। এখানে যারা কাজ করবে তারাই ফল পাবে, কাজ যে ধরণেরই হোক। আর যারা কাজ করবে না তারা ফলও পাবে না, তারা আল্লাহ্‌র যতবড় প্রিয় বান্দা–হওয়ারই দাবিদার হোক।

কাজেই বর্তমানে ইয়াহুদীরা যদি আমাদেরই কোন ভূ–খন্ড দখল করে নিয়ে তথায় আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে কাজ করে একটি রাষ্ট্র কায়েম করে থাকে, তাহলে তাতে বিস্মিত হওয়া কিছু নেই; তাতে আল্লাহ্‌র সদা কার্যকর নিয়মের ব্যতিক্রমও কিছু হয়নি। তাছাড়া এই ইয়াহুদী রাষ্ট্রটি স্বয়ং ইয়াহুদীরা কায়েম করেনি, করেছে দুনিয়ার চারটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি—বৃটিশ, ফ্রান্স ,রাশিয়া ও আমেরিকা এবং বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত যে ঐ রাষ্ট্রটি এই সব রাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতা—বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি আমেরিকার প্রত্যক্ষ সমর্থনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, একথা কার না জানা আছে!

পক্ষান্তরে তার চার পার্শ্বের রাষ্ট্রগুলো মুসলমানদের হলেও সেগুলো ইসলামী রাষ্ট্র নয়। সেগুলো পরস্পরের মধ্যেও কেবলমাত্র 'আরব' বা আরবী ভাষাভাষী হওয়া ছাড়া ঐক্যের আর কোন ভিত্তি নেই। এতে বুঝা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে মুকাবিলা ইসলাম ও ইয়াহুদীবাদের মধ্যে নয়, মুকাবিলা হচ্ছে ইয়াহুদীবাদ ও আরববাদ এ দুটির মধ্যে। আর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ইয়াহুদীবাদ যদি অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাহলে সে শক্তি তো প্রতিপক্ষকে পরাজিত করবেই। কেননা তারা নিছক আরব এবং বৈষয়িক শক্তিতেও একেবারে পশ্চাদপদ।—ফলে এখানে আল্লাহ্‌র নিয়মের বিপরীত তো কিছু হচ্ছে না।

বস্তুতঃ সৌভাগ্য–দুর্ভাগ্য, সভ্যতা–পশ্চাদপদতা ও জয়–পরাজয় একটা নিয়মের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সেখানে কোন ব্যতিক্রম দেখা যাবেনা; জাতিতে জাতিতে কোন পার্থক্য ঘটবে না। ইয়াহুদীদের আল–কুদ্‌স বা পবিত্র স্থানসমূহ দখল করা এক দীর্ঘকালীন ও ক্রমাগত চেষ্টা সাধনা ও ব্যাপক প্রস্তুতির ফল। বিশ্ব–ইয়াহুদী সমাজই এই চেষ্টা–প্রচেষ্টার আসল হোতা। মধ্যপ্রাচ্যেকে লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেই তারা বহু দিন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তার অনিবার্য ফল তারা পেয়ে গেছে। অপরদিকে যে মুসলমানদের হাত থেকে ইয়াহুদীরা সে পবিত্র স্থানসমূহ কেড়ে নিয়েছে, তাদের সামষ্টিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। শত্রুপক্ষ প্রবল শক্তি ও অত্যাধুনিক কৌশল নিয়ে এগিয়ে গেছে; মুসলমানরা দুর্বলতম ঈমানী ও নৈতিক শক্তি নিয়ে তাদের সাথে মুকাবিলায় টিকতে পারেনি, একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের পরস্পরে শুধু যে অমিল ও অনৈক্য ছিল তা–ই নয়, তাদের মধ্যে ছিল রীতিমত শত্রুতা ও বিরুদ্ধতা।

ফলে শক্তিমানের বিজয় ও দুর্বল বা শক্তিহীনের পরাজয় স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলার এ ঘোষণার যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ (ال عمران:١١٢)

> বনী–ইসরাঈল–ইয়াহুদীরা যেখানে গিয়েছে সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও তারা আল্লাহ্র দায়িত্বে কিছু আশ্রয় লাভ করে থাকলে অথবা মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা। আল্লাহ্র গজব এদেরকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে এবং তাদের উপর অভাব–অনটন ও দারিদ্র্য–পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

আয়াতের ঘোষণায় লাঞ্ছনা–অপমান ও দারিদ্র্য–পরাধীনতা থেকে ব্যতিক্রম ঘটার পর্যায়ে দু'টি কথা বলা হয়েছেঃ একটি হচ্ছে, আল্লাহ্র রজ্জু ধারণ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষের রজ্জু ধারণ। কেবল মাত্র এই দুটির যে কোন একটি গ্রহণের মাধ্যমেই উপরোক্ত অবস্থা থেকে সাময়িকভাবে হলেও তারা রক্ষা পেতে পারে এবং আল্লাহ্র চাপিয়ে দেয়া লাঞ্ছনা–অপমান ও দারিদ্র্য–পরাধীনতা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

কুরআনের حبل শব্দের শাব্দিক অর্থ রজ্জু। আর তার ব্যবহারিক অর্থ চুক্তি। চুক্তিকে রজ্জু বলার কারণ, রজ্জু যেমন বহু অংশ মিলিয়ে পাকানো হয়, চুক্তিতেও বহু শর্ত মিলিয়ে একটা দলীল তৈরী করে তাতে একমত হওয়া বা স্বাক্ষর করা হয়। তাই ওরা যদি কখনও আল্লাহ্র রজ্জু ধারণ করে তাহলে চাপিয়ে দেয়া অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। আল্লাহ্র রজ্জু ধারণ করার দুটি অর্থ হতে পারে। একটি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান গ্রহণ করে মুসলিম হিসাবে জীবন ধারণ। যেমন ইয়াহুদী বংশের বহু সংখ্যক লোক—পুরুষ ও নারী—রাসূলে করীম (স)–এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইয়াহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়ে জীবন যাপন করছে এবং আল্লাহ্র গজব থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করে ও জিজিয়া দিতে রাযী হয়ে আল্লাহ্র নির্ধারিত লাঞ্ছনা থেকে তারা বেঁচে যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার মুসলিম নাগরিকদের মতই লাভ করা সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্রে বাস্তবেও তা সম্ভবপর হয়েছে।

তা না করে ইয়াহুদীরা যদি দুনিয়ার কোন এক বা একাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমর্থন ও আশ্রয় পায়, তাহলেও তারা অবধারিত লাঞ্ছনা–অপমান ও দারিদ্র্য–পরাধীণতা থেকে সাময়িকভাবে হলেও রক্ষা পেতে পারে। এটাই হচ্ছে কুরআনে ঘোষিত মানুষের রজ্জু ধারণ করার তাৎপর্য।

বর্তমানে দুনিয়ার ইয়াহুদী সমাজ ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহ্র এই শেষোক্ত কথাটির বাস্তবতাই প্রমাণ করছে। কেননা সকলেই জানেন, ইসরাঈল রাষ্ট্রটি যেমন চারটি প্রধান বিশ্বশক্তির সহযোগিতায় কায়েম হয়েছিল, বর্তমানে তা টিকেও আছে সেই রাষ্ট্রসমূহেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনের বলে। এই রাষ্ট্রটি মধ্যপ্রাচ্যে প্রচন্ড দাপট চালিয়ে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, ফিলিস্তিনীদের বসতিগুলো ও সে সবের অধিবাসীদের ধ্বংস করছে, তার মূলেও রয়েছে সেই পরাশক্তিগুলোরই সমর্থন।

বস্তুতঃ বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র আমেরিকার একটি সামরিক জান্তায় পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার নীতি বাস্তবায়নের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে এই রাষ্ট্রটি। আমেরিকার অর্ধ মিলিয়ন সৈন্যের বিশাল বাহিনীই এই রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করে চলেছে। এই রাষ্ট্রটির প্রতিরক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা আমেরিকাই দিয়েছে।

উপরন্তু ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রথমে ইয়াহুদী ধর্মের আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে ইয়াহুদী ধর্মের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। এখনকার ইসরাঈল রাষ্ট্র একটি জাতি-ভিত্তিক ও গোষ্ঠী-ভিত্তিক রাষ্ট্র, ধর্মরাষ্ট্র নয়। কেননা তাদের সামষ্টিক চরিত্র কোন ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর মত নয়। নিতান্তই ইতর জীবে পরিণত তারা। 'কাফির' ও 'ঈমানদার' এখানে একাকার। তারা তাওরাতকেও মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেনি। আর কুরআনে যা বলা হয়েছে, তা সেই ইয়াহুদীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যারা ইসরাঈলী শরীয়াত ও তারপর হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব মেনে চলে। কিন্তু বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র একটি নিতান্তই বস্তুবাদী রাষ্ট্রশক্তি। ফলে কুরআন মজীদে ইয়াহুদীদের যে লাঞ্ছনা-অপমান ও দারিদ্র-অধীনতার কথা বলা হয়েছে, তা এই ইয়াহুদী ধর্ম অ-পালনকারী জনগোষ্ঠীর জন্য নয়।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা যায়, তা হলো, কুরআন ইয়াহুদীদের উপর লাঞ্ছনা-অপমান ও দারিদ্র্য-পরাধীনতা চেপে বসার কথা বলেছে, সেই সাথে কোন এক সময়-দুইবার শক্তিশালী হয়ে উঠার কথাও সেই কুরআনেই বলা হয়েছে। কুরআনের সে আয়াতটি এইঃ

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

(الاسراء: ٤)

আমরা নিজস্ব কিতাবে বনী-ইসরাঈলদের জন্য ফয়সালা করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দুনিয়ায় দুইবার মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং খুব বেশী শক্তিধর হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

ইয়াহুদীদের 'দুইবার শক্তিশালী হয়ে উঠা ও দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা'র ঘটনা অতীতে বহুবার সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ যদি তা-ই বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে কুরআনের এ ঘোষণারও বাস্তবতা ঘটে গেছে, বলতে হবে। পক্ষান্তরে যদি ভবিষ্যতের জন্য এ ঘটনার কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা সেই সাথে আল্লাহ্র এই কথা তিনটিও সমুখে রাখতে হবেঃ

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا - ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا - (الأسراء : ٥-٦)

শেষ পর্যন্ত প্রথম বিদ্রোহের সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন—হে বনী-ইসরাঈলীরা—আমরা তোমাদের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের এমন সব বান্দাহকে পাঠিয়েছিলাম যারা ছিল অতীব শক্তিশালী। আর তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ছিল একটি ওয়াদা যা পূর্ণ হয়েছিল। অতঃপর আমরা তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি। আর তেমাদেরকে বিপুল ধন–মাল ও সন্তানাদি দিয়ে শক্তিশালী করে দিয়েছি। তখন তোমাদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী করে দিয়েছি।

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا - (الأسراء ٧)

তোমরা ভালো কাজ করলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক আর খারাপ কাজ করলে তার পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। পরে যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় আসলো, তখন (আমরা তোমাদের অপরাপর শত্রুদেরকে তোমাদের উপর প্রভাবশালী বানিয়ে দিলাম,) যেন তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে (বাইতুল মাকদিস) ঢুকে পড়ে, যেমন পূর্বে তারা প্রবেশ করেছিল। আর যার উপরই তারা কর্তৃত্ব পাবে, তা–ই তারা ধ্বংস করে দিবে।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا - (الأسراء : ٨)

তোমাদের রব্ব হয়ত এখন তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ববর্তী আচরণ আবার গ্রহণ কর, তাহলে আমরাও সেই শাস্তি তোমাদের উপর পুনঃপ্রবর্তিত করব। নিয়ামতের না–শোকরকারী লোকদের জন্য আমরা জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়ে রেখেছি।

এইসব ঘটনাই হয়ত অতীতে ঘটে গেছে। ভবিষ্যতে বা এখনও যে ঘটতে পারবেনা তা বলা যায়না। কিন্তু কোন অবস্থায়ই ইয়াহুদীরা আল্লাহ্‌র গযব থেকে রেহাই পেতে পারে না, একথায় একবিন্দু সন্দেহ করা যায় না। বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রটি দেখেও এ ব্যাপারে একবিন্দু বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই।

এ আলোচনার শেষে আহলি কিতাব—ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে আরো কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করছি, যা একটি মাত্র আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে এইঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ـ (المائدة:٦٤)

ইয়াহুদীরা বলেঃ আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা রয়েছে—বাধা হয়েছে ওদের হাত। এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে—আল্লাহর হস্ত তো উদার, উন্মুক্ত। তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন ব্যয় করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমার আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে কালাম তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে, তা উল্টাভাবে তাদের অনেক লোকেরই সীমালংঘন ও বাতিল তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (এরই শাস্তিস্বরূপ) আমরা তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। যখন তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে, আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দেন। ওরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একবিন্দু পছন্দ করেন না।

এ আয়াতে প্রধান যে কথাগুলো রয়েছে তা এইঃ

১. আমরা তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

২. ওরা যখনই কোন যুদ্ধের আগুন জ্বালাবে, আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দিবেন।

৩. ওরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা চালাবে, কিন্তু আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করেন না।

এই তিনটি কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে দেয়া হচ্ছেঃ

১. মূল আয়াতের بَيْنَهُمْ বলতে আল্লাহ্ আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত ইয়াহুদীদেরই বুঝিয়েছেন। অবশ্য আল্লামা রশীদ রিজা মিশরী মনে করেছেন যে, এই কথাটি ইয়াহুদী খৃষ্টান উভয়ের জন্য,যাদের উল্লেখ এ আয়াতের বহু পূর্বের ৫১

আয়াতে করা হয়েছে, যদিও তা অনেক দূরবর্তী কথা। অথচ তার তুলনায় নিকটবর্তী পূর্ব ৫৯ আয়াতে আহলি কিতাব–এর উল্লেখ আছেঃ

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ـ

হে আহলি কিতাব! তোমরা যে কারণে আমাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছ, তার এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি?

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমষ্টিগতভাবে সমস্ত আহলি কিতাব—ইয়াহুদী ও খৃষ্টান এবং বিশেষভাবে ইয়াহুদীদের পরস্পরে ধর্মীয় ও অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে চরম মতদ্বৈততা ও হিংসা–বিদ্বেষ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকার কথাই উপরোক্ত আয়াতটিতে বলা হয়েছে। এরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এ আয়াতটি দুটিতেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ
(الجاثية : ١٦-١٧)

আর আমরা বনু–ইসরাঈলীদেরকে কিতাব, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নবুয়্যাত দান করেছিলাম। তাদেরকে আমরা উত্তম জীবিকা দিয়েও ধন্য করেছিলাম; সারা দুনিয়ার মানুষের উপর তাদেরকে অধিক মর্যাদাও দিয়েছিলাম।

আর দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে সুস্পষ্ট হিদায়েত দিয়েছিলাম। পরে তাদের মধ্যে যে মত–বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে, (তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং) নির্ভুল জ্ঞান লাভের পরই তা হয়েছে এ কারণে যে, তারা পরস্পরের উপর বাড়াবাড়ি করতে চাইছিল। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সেইসব ব্যাপারেই ফয়সালা দান করবেন, যে সব বিষয়ে তারা পরস্পর মত–বিরোধ করছিল।

শত্রুতা হচ্ছে এমন মানসিক ভাবধারা, বাইরে যার প্রকাশ ঘটে। আর হিংসা–বিদ্বেষ নিছক আন্তরিক ব্যাপার; সে অনুযায়ী বাইরে কিছু না–ও ঘটতে পারে। এই শত্রুতা ও হিংসা–বিদ্বেষ যেমন ইয়াহুদীদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে, তেমনি ইয়াহুদী–খৃষ্টানদের মধ্যে এবং খৃষ্টানদের পরস্পরের মধ্যেও রয়েছে। তা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে, কোনদিনই নিঃশেষ হবে না।

আল্লামা রশীদ রিজা'র বর্ননানুযায়ী এই শত্রুতা ও হিংসা–বিদ্বেষ সবচেয়ে তীব্র রয়েছেরাশিয়ায়।[১] ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে তা সেই তুলনায় কম। আর ইয়াহুদীরা যেমন খৃষ্টানদের নিকট চরমভাবে ঘৃন্য, খৃষ্টানরাও তেমনি ঘৃনিত ইয়াহুদীদের নিকট। ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ওদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে কত শত বই রচিত ও প্রচারিত হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।[২]

খৃষ্টানদের পারস্পরিক হিংসা–বিদ্বেষ ও শত্রুতার কথা অপর একটি আয়াতেও বলা হয়েছে। আয়াতটি এইঃ

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ فَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ـ (المائدة:١٤)

এভাবে তাদের নিকট থেকেও আমরা পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, যারা বলেছিলঃ আমরা নাসারা। কিন্তু তাদেরকে যে সবক স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তার একটি বিরাট অংশ তারা ভুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের মধ্যে সকল সময়ের জন্য চিরন্তন দুশমনী ও পারস্পরিক হিংসা–বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি। এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আসবে, যখন তারা এ দুনিয়ায় কি করছিল ও গড়ে তুলছিল, তা আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দিবেন।

খৃষ্টানদের বহু সংখ্যক ভাগ রয়েছে। এই ভাগগুলোর পরস্পরের মধ্যে যে মৌলিক বিরোধ ও হিংসা–বিদ্বেষ, তা দুনিয়ার কারোই অজানা নেই। প্রায় দু'হাজার বছর ধরে তাদের মধ্যকার এই বিদ্বেষের আগুন অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতে যে আরও অনেক কিছু ঘটবে তা না বললেও চলে।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে একথাও জানা গেল যে, ওদের ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যেমন থাকবে ওদের মধ্যকার এই হিংসা–বিদ্বেষের অবস্থা।

২. আয়াতে বলা হয়েছে; 'ওরা যখনই কোন যুদ্ধের আগুন জ্বালাবে, আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দিবেন।

বস্তুতঃ যুদ্ধ শান্তির বিপরীত। হত্যাকান্ড বা সশস্ত্র যুদ্ধের তুলনায় এই শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। যুদ্ধ দ্বারা শান্তি বিঘ্নিত হয় যেমন, তেমনি তাতে চলে

---

১. রাশিয়া থেকে দলে দলে ইহুদীদের দেশত্যাগ এবং ইসরাইলে বসতি স্থাপনই একথার বাস্তব প্রমাণ।

২. تفسير المنار ج٦ ص٢٨٥

লুটতরাজ, ছিনতাই, ব্যাপক অশান্তি ও দুর্যোগের বিস্তার। যুদ্ধের জন্য উসকানি দেয়াও শান্তি পরিপন্থী তৎপরতা। ইয়াহুদীরা প্রথমে তা করেছে মক্কার মুশরিকদেরকে নবী করীম (স) ও মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানি দিয়ে। ওরাই দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নবী করীম (স) ও মুমিনদের বিরুদ্ধে। ওরাই মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের বলেছেঃ 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, থাকব, যদ্দিনে তাকে উৎখাত করতে না পারি'। জবাবে কুরাইশরা বলেছেঃ 'হে ইয়াহুদী সমাজ। তোমরাই হচ্ছ সকলের আগের কিতাবধারী। তোমরা কিতাবের ইলম রাখ। আর এই ব্যাপার নিয়েই তো মুহাম্মাদের সাথে আমাদের বিরোধ ও বিবাদ। তোমরাই বল, আমাদের ধর্ম উত্তম, না মুহাম্মাদের প্রচারিত ধর্মমত?'

জওবাবে ইয়াহুদীরা বললঃ 'তোমরাই সত্য ধর্মের অনুসারী।'[১]

ওদের লোকেরা রোমানদেরও উসকানি দিয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য। ওদের লোকেরাই মুমিনদের উপর ডাকাতি করত, তাদের শত্রুদের ওরাই আশ্রয় দিত, শত্রুতায় উৎসাহ জোগাত। শত্রুদের দিত ব্যাপক সহযোগিতা। যেমন কায়াব ইবনে আশরাফকে দিয়েছিল।

হযরত ঈসা (আ)–এর জন্মের পূর্বে এবং তার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওরা যেসব অপরাধমূলক তৎপরতা চালিয়েছিল, উক্ত আয়াতে সেদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে।

'আল্লাহ্ আগুন নিভিয়ে দিবেন' এর অর্থ রাসূল (স) ও মুমিনদের বিরুদ্ধে ওরা যে ষড়যন্ত্রই করুক, কোনটাই সফল হবে না। উসকানিদান ও উত্তেজিত করণের যত কাজই ওরা করবে,আল্লাহ্ তা সবই ব্যর্থ করে দিবেন। অথবা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (স) ও মুমিনদের সাহায্য দিবেন। ফলে ওরা কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

এর যেটাই হোক, ওরা আল্লাহ্র দ্বীন, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবার যে চেষ্টাই করবে, আল্লাহ্ ওদের সে সব চেষ্টাকেই ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিবেন। তবে দ্বীন–ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক রাজনৈতিক কারণে ও উদ্দেশ্যে, অথবা জাতীয় বিজয় ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যা কিছু করবে, আয়াতে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

আল্লামা তাবরাসী লিখেছেনঃ এ কথার মধ্যেও মু'জিজা ও কুরআনের আল্লাহ্র কালাম হওয়ার সত্যতা নিহিত রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ পূর্বেই ওদের সম্পর্কে এই খবর দিয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনা এই আগাম কথার সাথে পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল হয়েছে। ইয়াহুদীরা হেজাজের লোকদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তির অধিকারী ছিল। কুরাইশরা ওদের বলেই বলিয়ান হয়েছিল। মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ওদের

১. سیرہ ابن هشام ج ۱ ص ۲۱۴ و ص ۵۵/۵۴

মৈত্রী অর্জনের জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ই সমগ্র হেজাজ থেকে ওদের উৎখাত করে দিলেন, ওদের নাম-চিহ্নও চিরতরে বিলীন করে দিলেন।[১]

৩. 'ওরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা চালাবে,' ওদের এই চেষ্টা সমস্ত ভালো আমল ও নৈতিক চরিত্রের পরিপন্থী। ওরা মানব জাতির কোন কল্যাণ চায় না— চায়না তাদের দুরবস্থা দূর করতে, কোনরূপ উন্নতি বিধান করতে। ওদের একমাত্র লক্ষ্যই মুসলমানদেরকে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত রাখা, তাদের বিভ্রান্ত করা, নিতান্তই ভুল কথাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রচার করে মুসলমানদের বেঈমান বানানো। ওরা চায় , মুসলমানদের তাওহীদী আকীদার পরিবর্তে শিরকী আকীদায় লিপ্ত করতে। ওরা মুসলমানদের প্রতি চরম হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। কেননা ওরা চিরকাল মুসলমানদের তুলনায় অধিক অগ্রসর থাকুক, মুসলমানরা কোন-না-কোনভাবে ওদের পদানত হয়ে থাকুক, তা-ই ওদের একমাত্র চেষ্টা।

কুরআন মজীদ চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এই কথা জানিয়ে দিয়েছে। পূর্বে মুসলমানরা অতটা টের পায়নি, বুঝতে পারেনি, যতটা বর্তমানে স্পষ্টভাবে বুঝতে শুরু করেছে। মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য ওরা বৈজ্ঞানিক মত হিসাবে দার্শনিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে সব থিওরী বা মতাদর্শ প্রচার করেছে, সে সব যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মারাত্মক ভুল, তা মুসলমানরা সম্প্রতি বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠেছে। বর্তমান দুনিয়ায় যে সার্বিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে,তা ওদেরই কারসাজি। দুটি পরাশক্তি ওদেরই মন্ত্রে দীক্ষিত ও চালিত। টেলিভিশন ও সিনেমা নৈতিক চরিত্রে চরম ভাঙন সৃষ্টির জন্য ওরাই উদ্ভাবন করেছে। সূদ-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যাংক ও বীমা ওদেরই প্রবর্তিত। আল্লাহ্র এ কথা কত-ই না সত্যঃ

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ (المائدة ٦٢)

তুমি দেখতে পাও, এদের অনেক লোক গুনাহ, জুলম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ির কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে চেষ্টা ও সাধনা করে বেড়ায়, হারাম মাল খায়; মোটকথা এরা যা কিছু করে, তা খুবই খারাপ কাজ।

এই সবই হচ্ছে 'গায়ব' পর্যায়ের খবর। কুরআন মজীদে তা উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্য এ পর্যায়ের সকল আয়াতই এ আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি, তা সম্ভব-ও

---

১. مجمع البيان ج ٢ ص ٢٧٠

নয়। মোটামুটিভাবে বক্তব্যকে অকাট্য করে পেশ করার জন্য যা একান্ত দরকার, তা–ই আলোচনায় আনতে চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআনের গায়বী খবর আগাম প্রদান পর্যায়ে আমরা এখানে যে কটি আয়াতই উল্লেখ করলাম, তার মধ্যে একটিরও কি বিপরীত ঘটনা দুনিয়ায় ঘটেছে? এমন একটি ভবিষ্যৎ বাণীও চিহ্নিত করা যায় কি, যা পূরণ হয়নি?

রাসূলে করীম (স) অনেক সুদূর প্রাচীনকালের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে এই কুরআনের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। যেমন 'আসহাবে কাহাফ', যুল–কারনাইন বা রূহ সম্পর্কে। এর সবগুলোই ছিল তাঁর নিকট 'গায়ব'। কিন্তু এসব বিষয়ে কিছু বলার জ্ঞান তাঁর নিজের ছিলনা; কিংবা সমাজ পরিবেশ থেকেও তিনি জানতে পারেন নি। তাঁর জ্ঞানের একমাত্র সূত্র ছিল ওহী। এই ওহী সূত্রে জ্ঞান পেয়ে তিনি যা–ই বলেছেন, তা কি কখনও অসত্য প্রমাণিত হয়েছে? কেউ বলতে পেরেছে তা?

মূলতঃ 'গায়ব' পর্যায়ের এই সব খবরই বিরাট মু'জিজা বিশেষ। এই মু'জিজাসমূহের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না যে, এই সব বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞান–সমৃদ্ধ জবাব দিয়েছেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি বস্তুতঃই 'উম্মী'। যিনি মরুভূমির অধিবাসী, কোনদিন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা জ্ঞান–কেন্দ্রে মুহূর্তের তরেও উপস্থিত হননি।

পক্ষান্তরে ইনজীল–মথি সমাচারে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে এই সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে,তিনি মাটির গর্ভে তিন দিন তিন রাত সমাধিস্থ থাকবেন। কিন্তু পরবর্তী তিনখানা ইনজীল এই কথাকে অসত্য বলেছে। তাতে বলা হয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় হযরত মসীহর দেহ সন্ধান করে ক্রুশ থেকে নামানো হয়, তাঁকে কাফন পরানো ও দাফন করা হয়, রোববার দিন ফজরের পূর্বে তিনি মৃত্যু থেকে দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর কবর থেকে বের হয়ে আসেন। এ কথানুযায়ী তিনি কবরে অবস্থান করেন মাত্র শনিবারের রাত ও দিনটুকু এবং রোববারের রাতটুকু। তাতে একদিন ও দুই রাত হয়, তিন দিন তিন রাত নিশ্চয়ই হয়না। ইনজীল–মথি'র কথা এমনিভাবেই মাঠে মারা গেছে, অসত্য প্রমাণিত হয়েছে।

'বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতেই রয়েছে বিপুল নিদর্শন।'

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই 'গায়ব' জানেনা

১. 'গায়ব' কেবল মাত্র আল্লাহ্ই জানেন, এই পর্যায়ের তিন ধরনের দলীল
২. আল্লাহ্র যে সব সিফাত বিভিন্নভাবে অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় তার তাৎপর্য কি?
৩. আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে মানুষ কি গায়ব জানতে পারে?
৪. এই পর্যায়ের আয়াত ও সে 'গায়ব' শব্দের ব্যাখ্যা
৫. নবী–রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী পর্যায়ে কুরআনের ব্যাখ্যা
৬. 'নবী গায়ব জানেন না' কুরআনের এই কথার তাৎপর্য কি?
৭. নবীগণের 'ইলমে গায়ব' পর্যায়ে প্রশ্ন ও উত্তর

'গায়ব' কেবল আল্লাহ্ জানেন

কুরআন মজীদে 'গায়ব' শব্দটি বিভিন্ন রূপে চুয়ান্নবার উল্লেখিত হয়েছে। 'গায়ব' বলতে কি বুঝায়, তা আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনায় স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়েছে বলে মনে করি। এখানে আমরা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কতকগুলো বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, 'গায়ব' কি শুধু আল্লাহ–ই জানেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানেন না? কিংবা অন্যরা তা জানতে পারে না?

এর জবাবে আমরা বলব, 'গায়ব' মূলতঃ দু'প্রকার।

প্রথমঃ গায়ব কেবলমাত্র আল্লাহ্–ই জানেন, আল্লাহ্ ছাড়া এই ইল্ম কেউই পেতে পারে না। অন্য কাউকে তা জানানোও হয় না। কুরআন মজীদে 'গায়ব'–এর ইল্মের দিকে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার লক্ষ্য এটাই। আল্লাহ্র কথাঃ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (النمل ، ٦٥)

বলুন হে নবী। আসমান–যমীনে অবস্থিত কেউই 'গায়ব' জানেনা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া।

এ আয়াতে এই বিশেষ 'গায়ব' সম্পর্কেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, গায়ব–এর ইল্‌ম মহান আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ ও নিজস্ব গুণ, যেমন তাঁর অন্যান্য সিফাত রয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ যে 'গায়ব' আল্লাহ্‌ ছাড়া তাঁর ফেরেশতা, নবী–রাসূল এবং অন্য যার নিকট প্রকাশিত হয়, তা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। এ রূপ বিভক্তি যেমন 'ইল্‌মে গায়ব' পর্যায়ে চলে, তেমনি চলে আল্লাহ্‌র সকল প্রকার বর্ণিত গুণ–সিফাতের ক্ষেত্রেও, কুদরাত ও জীবনের ক্ষেত্রেও।

অতএব যে গায়ব–এর ইল্‌ম ও গুণ–সিফাত কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য প্রযোজ্য, তা কেবল তাঁরই জন্য প্রযোজ্য হবে, অন্য কেউই তাতে শরীক হতে পারে না। অন্য কারো জন্য তা প্রয়োগও করা যেতে পারে না। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যদের জন্য যা প্রযোজ্য, তার কোনটাই কোনভাবে আল্লাহ্‌র জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। তা কেবল সেই 'অন্যদের' জন্যই প্রযোজ্য হবে।

অতএব যে 'ইল্‌মে গায়ব' কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন, এখানে আমরা তার উল্লেখ করব। এ পর্যায়ে কয়েকটি দিক দিয়ে কথা বলতে হবেঃ

১. কুরআনের যে সব আয়াতে 'ইল্‌মে গায়ব' কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছেঃ

একটি আয়াতঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ـ (الانعام، ٥٩)

গায়ব–এর সমস্ত চাবি–কাঠি কেবল তাঁর (আল্লাহ্‌র)ই নিকট সংরক্ষিত। তা কেউ জানেনা, জানেন কেবল তিনিই।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (النمل ، ٦٥)

বল হে নবী! আসমান ও যমীনে যারাই আছে তারা 'গায়ব' জানেনা, জানেন কেবল আল্লাহ্‌।

এ দু'টি আয়াতে গায়ব–এর ইল্‌ম কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউই জানেনা বলে স্পষ্ট অকাট্য ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে এমন কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যা থেকে লক্ষণাদির ভিত্তিতে উপরোক্ত কথাই জানা যায়।

মানব–সৃষ্টির সূচনাকালে ফেরেশতাদের ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ্‌ বলেছিলেনঃ

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ - (البقرة، ٣٣)

তোমাদের কি বলিনি যে, আসমান–যমীনের গায়ব আমিই জানি, আরও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর।

এ আয়াত মূর্খতা ও অজ্ঞানতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে। আয়াতের বক্তব্য অনুসারে গায়ব সংক্রান্ত জ্ঞানকে তিনি অন্যদের থেকে এমনভাবে তুলে নিয়েছেন যাতে তা কেবলমাত্র তাঁরই আয়ত্তাধীন থাকতে পারে এবং তাতে অন্য কারোই একবিন্দু শরীক হওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না।

আল্লাহ্ বলেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (الفاطر ٣٨)

নিশ্চয় আল্লাহ্ই হচ্ছেন আসমান–যমীনের গায়ব সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞানী (আলেম) এবং কেবল তিনিই দিলসমূহে নিহিত ও প্রচ্ছন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে বিপুলভাবে অবহিত।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ -
(المائدة: ١٠٩)

যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী–রাসূলগণকে একত্রিত করবেন, পরে জিজ্ঞাসা করবেনঃ তোমাদের কি জবাব দেয়া হয়েছে? তারা সকলে বলবেঃ 'আমাদের কিছুই জানা নেই, কেবল তুমিই—হে আল্লাহ্—সমস্ত গায়ব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহে একমাত্র আল্লাহ্কেই 'গায়ব–এর জ্ঞানী' বলে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ - (الانعام: ٧٤)

গায়ব ও শাহাদাত—যা কিছু প্রত্যক্ষ ও প্রকাশমান—সবকিছুর জ্ঞানী তিনি; তিনি সুবিজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - (التوبة: ٩٤)

অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে গায়ব ও শাহাদাতের আলেম (আল্লাহ্‌র) নিকটঃ

وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ (التوبة: ١٠٥)

এবং তোমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে গায়ব ও শাহাদাতের আলেম–এর নিকট। অতঃপর তোমাদেরকে তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।

আল্লাহ্‌ তা'আলা'র 'গায়ব–এর আলেম' হওয়ার কথা কুরআন মজীদে এভাবে দশ বার বলা হয়েছে। এভাবে ও এত বেশী করে এ কথাটি বলার অর্থই হচ্ছে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন, এতে অপর কারো একবিন্দু শরীক হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

অন্য কেউই 'ইলমে গায়ব' জানেনা

নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে প্রত্যক্ষভাবে নয়—পরোক্ষভাবে জানা যায় যে, ইল্‌মে গায়ব কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন। যেমন, নবী করীম (স)–এর জবানীতে বলা হয়েছেঃ

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۔ (الاعراف: ١٨٨)

আমি যদি 'গায়ব' জানতাম তাহলে নিজের জন্য অনেক বেশী কল্যাণ আয়ত্ত করে নিতাম এবং কোন অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো আর কিছু নই, শুধু সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ঈমান রাখে এমন লোকদের জন্য।

وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ (هود، ٣١)

আর আমি তোমাদের বলছি না যে, আল্লাহ্‌র ধন–ভাণ্ডারসমূহ আমার নিকট রয়েছে এবং আমি গায়বও জানিনা।

এভাবে রাসূলের জবানীতে বলিয়ে যে আমি গায়ব জানিনা, গায়ব–এর ইল্‌মকে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, এব্যাপারে তাঁর সাথে কেউই শরীক নেই। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী–রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)–ও এ ব্যাপারে তাঁর অংশীদার নন।

কিন্তু গায়ব–এর ইল্‌ম কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন হওয়া সংক্রান্ত এই সমস্ত

কথা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে এবং তাঁরই দেয়া ইল্‌ম হিসাবে অন্যদের জন্য কিছু জানার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়নি।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য ঘোষিত 'সিফাত'সমূহ যদি কখনও অন্যদের জন্য ব্যবহৃত হয়ও, তবু তা সেইভাবে নয়, যেভাবে তা আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে গায়ব–এর ইল্‌ম আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো থাকতে পারে না। যদি কিছু থাকেও তবে প্রথমতঃ তা কেবল আল্লাহ্‌রই দেয়া এবং দ্বিতীয়তঃ তা সেভাবে নয়, যেভাবে তা আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন।

এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে, ইল্‌ম–এর দু'টি অর্থ আমরা করছি—একটি আল্লাহ্‌র জন্য, অপরটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের জন্য। কেননা একথা সত্য নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়। ইল্‌ম–এর অর্থ দু'টি নয়, একটিই। আর তা হচ্ছে, পন্থাসমূহের মধ্যে কোন একটি পন্থায় কোন জিনিস কারো নিকট উদ্‌ঘাটিত হওয়া। জীবন, শক্তি, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতিও অনুরূপ। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, গায়ব–এর ইল্‌ম যেভাবে আল্লাহ্‌র, সেভাবে অপর কারোই নয়। অপরের যদি কিছু থাকে তবে তা সেভাবে নয়, যেমন তা আল্লাহ্‌র জন্য।

অর্থাৎ গায়ব–এর ইল্‌ম আল্লাহ্‌র জন্য একভাবে আর সৃষ্টি—অর্থাৎ মানুষের জন্য অন্যভাবে। এ পার্থক্যটা ঘটেছে এই বিশেষ গুণে গুণান্বিত হওয়ার অবস্থার পার্থক্যের কারণে। কেননা ইল্‌ম দু'রকমের। এক রকম ইল্‌ম ওয়াজিব অর্থাৎ অপরিহার্য। আর এক প্রকারের ইল্‌ম সম্ভব পর্যায়ের। প্রথম প্রকার ইল্‌ম আল্লাহ্‌র জন্য আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ইল্‌ম মানুষের জন্য। কতক ইল্‌ম একান্ত নিজস্ব আর কতক উপার্জিত। কতক নিরংকুশ, সকল বাধা–বন্ধন ও সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কতক ইল্‌ম সীমিত, বন্ধন–গ্রস্থ। কতক ইল্‌ম মূলসত্তা নিহিত, যেখানে গুণ ও গুণান্বিতের মধ্যে দ্বৈততা নেই। আর কতক মূল সত্তার বাইরে, পরে অর্জিত হয়েছে। এই বিবিধ ইল্‌মের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের ইল্‌ম আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্‌র একান্ত নিজস্ব, নিরংকুশ, মূল সত্তা নিহিত, অসীম। অতএব সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ইল্‌ম মূল সত্তার নিজস্ব। সেখানে মূলসত্তা ও ইল্‌ম—এ দুইয়ের মাঝে দ্বৈততা নেই, পার্থক্য নেই। যিনি আল্লাহ্ তিনিই ইল্‌মের ধারক সত্তা। মূল সত্তা ইল্‌ম—ইল্‌মই মূল সত্তা। তাঁর সত্তা যেমন সীমিত নয়, তেমনি তাঁর ইল্‌মও অসীম, সর্বাত্মক। স্থান–কাল–পাত্র–এর দিক দিয়ে সে ইল্‌মে কোন পার্থক্য হয় না। সকল প্রকার অংশীদারিত্ব, অংশে–অংশে বিভক্তি থেকে তা পবিত্র ও সম্পূর্ণ মুক্ত।

উপরের আয়াতসমূহে 'গায়ব'–এর ইল্‌ম কেবল আল্লাহ্‌র জন্য বলা হয়েছে। সে ইল্‌ম নিজস্ব, সত্তাগত, নিরংকুশ, সীমাবদ্ধতামুক্ত। সে ইল্‌ম কেবল আল্লাহ্‌রই হতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া সৃষ্টিলোকের আর কাউকে এই ইল্‌ম–এর অধিকারী মনে করা যেতে পারে না।

এই প্রকার 'গায়ব'–এর ইল্‌ম আল্লাহ্‌রই রয়েছে। আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোই তা হতে পারে না। এই ইল্‌মে তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই। কেবল 'গায়ব'–এর ইল্‌মই নয়। 'শাহাদাতে'র (প্রত্যক্ষ উপস্থিত) ইল্‌মও তাঁরই রয়েছে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে।

গায়ব—এর ইল্‌ম কি মানুষ পেতে পারে?

হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় রয়েছে, তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা এই 'গায়ব'–এর ইল্‌ম দিতে পারেন। যা অতীতে ঘটেছে তা–ও যেমন জানাতে পারেন, তেমনি যা ভবিষ্যতে ঘটবে, তা–ও তিনি আগাম জানিয়ে দিতে পারেন। তাতে 'গায়ব'–এর ইল্‌ম কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হওয়ায় কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। কেননা আল্লাহ্‌ গায়ব জানেন নিজস্ব ও মৌলিকভাবে। আর বান্দাহ জানে কেবলমাত্র তাঁর জানিয়ে দেয়ার ফলে। কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াতে এ প্রসঙ্গটি বিবৃত হয়েছে। যেমনঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا - لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا - (الجن : ٢٦-٢٨)

তিনি তো 'গায়ব' অবহিত, স্বীয় 'গায়ব' সম্পর্কে তিনি কাউকেই অবহিত করেন না—সেই রাসূল ছাড়া, যাকে তিনি (গায়বী ইলম দেয়ার জন্য) পছন্দ করে নিয়েছেন। তখন তার সমুখে ও পিছনে তিনি প্রহরা লাগিয়ে দেন। যেন সে জানতে পারে যে, তারা তাদের রব্‌–এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং তিনি তাদের গোটা পরিমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছেন। এবং এক–একটি জিনিসকে গুণে–গুণে রেখেছেন।

এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, 'গায়ব' সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন। তা আর কেউ–ই জানতে পারে না। তবে তিনি যে রাসূলকে এজন্য পছন্দ করে নিয়েছেন তাঁর নিকট তা প্রকাশ করেন যতটা তিনি চান।

এর সাথে এ আয়াতটিও মিলিয়ে পড়তে হবেঃ

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ - (النمل : ٦٥)

বল হে নবী! আসমান–যমীনের কেউই গায়ব জানে না, জানেন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা।

এ থেকে বুঝা গেল, গায়ব–এর ইল্‌মকে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে স্বকীয়তা ও মৌলিকতার দিক দিয়ে। অন্যদের তা জানতে পারা সম্ভব কেবল আল্লাহ্‌র জানিয়ে দেয়ার উপায়ে মাত্র। তিনি যখন অন্য কারো নিকট 'গায়ব'–এর ইল্‌ম প্রকাশ করেন, তখন তাঁর ইল্‌ম–এর নিজস্বতা ও একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন হওয়ার মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না।

এর দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا (الزمر : ٤٢)

তিনি আল্লাহ্‌ই যিনি মৃত্যুর সময় রূহগুলোকে কবজ করেন।

মৃত্যু ঘটানো ও জান কবজ করা একান্তভাবে আল্লাহ্‌রই কাজ। তা সত্ত্বেও এক আয়াতে তিনি এই কাজটি মালিকুল মওতের বলে উল্লেখ করেছেন। আর একটি আয়াতে 'রাসূল' দের বলেছেন। আয়াতটি এইঃ

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ـ (السجدة : ١١)

ওদেরকে বল, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরাপুরি নিজের মুঠির মধ্যে ধারণ করে নিবে।

এ দুটি আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য হতে পারে এভাবে যে, মৃত্যুদান ও রূহ্‌ কবজ করা মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌র কাজ। আর অপরের কাজ হলো কারণ সৃষ্টি বা তাবেদারী করা। তা সত্ত্বেও একমাত্র নিরংকুশভাবে আল্লাহ্‌র কাজ হওয়ায় কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেননা এখানে এক হিসাবে কাজ দু'টি। অপর দিক দিয়ে দু'টির মধ্যে রয়েছে সাদৃশ্য।

আল্লাহ্‌ তাঁর গায়ব–এর ইল্‌ম তাঁর রাসূলকে দিতে কেবল দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন না; বরং তার উপর পাহারাদার নিযুক্ত করেন। যা তাঁকে জানানো হয়, তারা তার সংরক্ষণ করেন। এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এ আয়াতাংশেঃ

فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ـ

তখন তার পেঁছনে ও সমুখে পাহারা লাগিয়ে দেন।

আর রাসূলের গায়ব–এর ইল্‌ম যেহেতু আল্লাহ্‌র ইল্‌ম থেকে পাওয়া, এ জন্যই বলা হয়েছেঃ

وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

এবং তিনি তাদের গোটা পরিমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করে নেন।

অর্থাৎ নবী–রাসূলগণ ও অন্যান্য সৃষ্টিকুলের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তিনি আয়ত্তাধীন করে নেন। আর তারা আয়ত্তাধীন করতে পারে কেবল ততটুক যতটুকু আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেন। وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا 'এবং এক–একটি জিনিসকে গুনে গুনে রক্ষা করেন।

আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত রাসূলকে গায়ব–এর ইল্‌ম জানিয়ে দেন। তবে তা কেবল হযরত মুহাম্মাদ (স)–কেই জানান—অন্য কাউকে জানান না, তা নয়। বরং অন্যান্য নবীগণকেও তা জানান। বলেছেনঃ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۔ (النساء : ١٦٣)

আমরা তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যেমন করে ওহী পাঠিয়েছি নূহ্ ও তার পরের নবীগণের প্রতি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, গায়ব জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত মাধ্যম হচ্ছে ওহী। এই ওহীর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (স)–এর অন্তরে কুরআন মজীদ নাযিল করেছেন। এই পন্থা ছাড়া আর কোন পন্থা আছে কি রাসূলের গায়ব জানার? এ বিষয়ে কুরআন বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে আল্লাহ্‌র একটি বাক্যাংশকে ভিত্তি করে যথেষ্ট চিন্তা–ভাবনা করতে হবে। সে বাক্যাংশটি হচ্ছেঃ

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۔

এ হচ্ছে গায়ব বিষয়ে সংবাদ দান, যা আমরা তোমার নিকট 'ওহী' করছি।

এ আয়াতাংশ রয়েছে আলে–ইমরান ৪৪, ইউসুফ–১০২ এবং হূদ–৪৯ আয়াতসমূহে।

উক্ত প্রশ্নের জবাব সহজ হতে পারে যদি আমরা আভিধানিক, প্রচলিত ও কুরআনী পরিভাষা হিসাবে এই ক'টি স্থান ছাড়া অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত 'গায়ব' (الغيب) শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য জানতে পারি।

এখানে কয়েকটি দিক দিয়ে এই পর্যায়ে আলোচনা করা যাচ্ছেঃ

১. غيب (গায়ব) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, যা ইন্দ্রিয়নিচয়ের আয়ত্তাধীন নয়। এর বিপরীত অর্থ বোধক শব্দ হচ্ছে 'শাহাদাত' (شهادة)। —তা হচ্ছে সেই জিনিস যা কোন–না–কোন ইন্দ্রিয়ের আওতাধীন। 'ওহী'–কে 'গায়ব' বলা হলে তা একারণে বলা হবে যে, তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের আওতা–বহির্ভূত; ইন্দ্রিয়নিচয় থেকে প্রচ্ছন্ন বা বিচ্ছিন্ন। যেমন এই বিশ্বলোকে দিন–রাত এমন অসংখ্য ঘটনা–দুর্ঘটনা

সংঘটিত হচ্ছে, যা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের আওতায় আসেনা। তাহলে কেবল 'ওহী'কেই বিশেষভাবে 'গায়ব' বলে চিহ্নিত করার কি কারণ থাকতে পারে?

কুরআন মজীদে গায়ব–এর প্রতি ঈমান মুত্তাকী লোকদের একটি বিশিষ্ট গুণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ـ (البقرة : ٣)

(মুত্তাকী তারা) যারা গায়ব–এর প্রতি ঈমান রাখে⋯

এ আয়াতে 'গায়ব' শব্দটি অনেক ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। কিয়ামত, আল্লাহ্‌র ওয়াদা, আযাবের ঘোষণা ইত্যাদিও তার মধ্যে শামিল। তার কোনটাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়া সত্ত্বেও মুত্তাকী লোকেরা তার প্রতি ঈমান রাখে।

এই পর্যায়ে স্মরণীয়, 'গায়ব' শব্দটি 'শাহাদাত'–এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ হিসাবে কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ আল্লাহ্ গায়ব ও শাহাদাত—ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব বিষয়েই পূর্নমাত্রায় অবহিত। এখানে ইন্দ্রিয়াতীত বলতে কেবল 'ওহী'কেই বুঝায়নি। 'ওহী'কে 'গায়ব' বলার কারণ এটা নয় যে, একটি অপরটির শব্দার্থ। বরং তা বলা হয় শুধু এই কারণে যে, 'ওহী'ও 'গায়ব' পর্যায়েরই একটি জিনিস। কেননা তা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের আওতায় পড়ে না। 'গায়ব' শব্দের শাব্দিক অর্থ কিন্তু 'ওহী' নয়। তবে 'গায়ব'সমূহের মধ্যে 'ওহী'ও একটি। আগেই বলা হয়েছে, কুরআন মজীদে الغيب শব্দটি ৫৪টি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সব আয়াতেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বিষয়াদিই বোঝানো হয়েছে। 'ওহী'কে গায়ব বলা হয়েছে যে আয়াতে, তাতেও।

উপরে যেসব আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তাতে মরিয়ম, ইউসুফ ও নূহ্ সংক্রান্ত কাহিনীর দিকে ইশারা করা হয়েছে। এই কাহিনীসমূহ তদানীন্তন সমাজে যথার্থরূপে কারোই জানা ছিল না। কুরআন মজীদ সেই কাংখিত সহীহ রূপেই এ পর্যায়ের কাহিনীসমূহ উপস্থাপন করেছে। এখানে সেই 'গায়ব'কে জানার জন্য একটি পন্থা হলো 'ওহী'। 'গায়ব' কিন্তু 'ওহী'র সমস্ত বিষয় নয়। 'ওহী' কেবল 'গায়ব' বিষয়েই আলোচনা করে, তাও নয়। কুরআনে সম্ভবতঃ এমন একটি আয়াত পাওয়া যাবেনা যেখানে 'গায়ব' শব্দটি ব্যবহার করে কেবলমাত্র 'ওহী'ই বোঝানা হয়েছে। নমুনাস্বরূপ কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ (البقرة : ٣٣)

আমি আসমান ও যমীনের 'গায়ব' জানি।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (الانعام : ٥٩)

'গায়ব'–এর সমস্ত চাবি তাঁর–ই নিকট রক্ষিত।

أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ - (سبا: ١٤)

ওরা যদি 'গায়ব'ই জানত, তাহলে ওরা এই অপমানকর আযাবের মধ্যে পড়ে থাকত না।

২. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - (الجن: ٢٦)

আল্লাহ্–ই গায়ব–এর আলেম, তিনি তাঁর 'গায়ব' অন্য কারো নিকট প্রকাশিত হতে দেননা।'

এ আয়াতে · الغيب · শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন সব ব্যাপার। এখানে এ শব্দ দ্বারা ওহী বোঝানো হয়নি। কেননা এর পূর্ববর্তী আয়াত হচ্ছেঃ

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا - قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا - (الجن: ٢٤-٢٥)

(এই লোকেরা নিজেদের এই আচার–আচরণ থেকে বিরত হবেনা) যতক্ষণ না তারা সেই জিনিসটি দেখতে পাবে যার ওয়াদা তাদের নিকট করা হচ্ছে। তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং বাহিনী কম সংখ্যক?

এ আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে কিয়ামতের ওয়াদা সম্পর্কে নবী করীম (স) জানতে পেরেছিলেন, অথচ তিনি এই ধরনের বিষয় জানেন না বলেই আগে জানিয়েছেন। এর পরই আল্লাহ্র 'আলেমুল গায়ব' হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে 'গায়ব' অর্থ ওহী নয়, কিয়ামতের ওয়াদা। এ আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কিত ইল্মকে 'গায়ব' পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই উক্ত আয়াতে · الغيب · বলতে শুধু 'ওহী' বুঝিয়েছেন এমন কথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না। কেননা পূর্ববর্তী আয়াত কিয়ামতের ওয়াদা সংক্রান্ত ইল্মকে আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে বাইরে গণ্য করতে নিষেধ করছে। এরূপ অবস্থায় আয়াতটির যথার্থ অর্থ হবেঃ

আল্লাহ্ নিশ্চয়ই গায়ব—(ওহী প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত যাবতীয় বিষয়) সংক্রান্ত ইল্ম–এর একমাত্র আলেম। তিনি তাঁর এই গায়ব পর্যায়ের ইল্ম কাউকেই জানান না,

জানান কেবল সেই রাসূলকে যাঁকে জানাতে তিনি রাযী হন। ফলে নবী (স) ওহীর মাধ্যমে গায়ব জানতে পারেন, একথা উক্ত আয়াত থেকেই প্রকাশিত হলো।

৩. সূরা আল জ্বিন–এর আলোচ্য আয়াতে الغيب শব্দের অর্থ তাফসীর লেখকগণ বুঝিয়েছেন 'ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এমন সব বিষয়', আর এ সব বিষয় সম্পর্কে নবীগণ যে অবহিত হন, তাও এ আয়াত থেকেই প্রমাণিত। এই দলীলের ভিত্তিতে আল্লামা তাবরাসী, কুরতুবী ও রুহুল বয়ান প্রভৃতি তাফসীর লেখকগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 'গায়ব' পর্যায়ের এই ইলমই রাসূলের রিসালাতের পূর্ণাঙ্গ দলীল। এটা তাদের জন্য মু'জিজাও। কেননা তাঁরা গায়বী ইল্ম পান, জনগণের মনে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস জন্মাবার জন্য এটা একটা বড় ভিত্তি। এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁদের দৃঢ় সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে।[১]

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ (ال عمران ـ ١٧٩)

আল্লাহ্ মুমিনদেরকে এমন অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা এখন রয়েছ। তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে অবশ্যই পৃথক করে দেবেন। কিন্তু 'গায়ব' সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়। 'গায়ব' জানাবার জন্য তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে চান বাছাই করে নেন। অতএব 'গায়ব' বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখবে। তোমরা যদি ঈমান ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার নীতি অনুসরণ কর, তবে তোমরা বিরাট শুভ ফলের অধিকারী হবে।

---

১. প্রচলিত সমস্ত তাফসীর গ্রন্থেই الغيب শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে كُلُّ أَمْرٍ غَابَ عَنِ الْحِسِّ مُطْلَقًا ঃ ইন্দ্রিয় নিচয়ের আয়ত্তাধীন নয় সাধারণ ভাবে এমন সব জিনিসকেই 'গায়ব' বলে। কোন একজন তাফসীর কার–ও 'গায়ব'–এর অর্থ 'ওহী' লিখেন নি। তাফসীর সমূহের নাম এইঃ

تفسير التبيان للشيخ الطوسى ١٠/ ١٥٨، مجمع البيان للطبرسى ١٠/ ٣٧٤، تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٣، تفسير القاضى بيضاوى ص ٤٤٥ الطبعة الحجرية، تفسير جوامع الجوامع للطبرسى ص ٥١٤، الكشاف ٤/ ٦٣٣، زاد المسير لابن الجوزى ٧/ ٣٨٥، تفسير القرطبى ١٠/ ٦٨١٩، تفسير الجلالين ص ٧٦٦، تفسير الطنطاوى ٢٤/ ٢٨١، تفسير المراغى ٢٩/ ١٠٧، تفسير كازر ١٠/ ١٩١، فى ظلال القرآن ٢٩/ ١٤٢، تفسير روح البيان ١٠/ ٢٠١ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ 'গায়ব' সম্পর্কে কাউকেই অবহিত করেন না। তাই অন্যদের দিলে কি প্রচ্ছন্ন ও গোপন কথা রয়েছে তা কেউ জানতে পারে না। এ কারণে বাহ্যিকভাবে মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে চান বাছাই করে নেন ও তাঁকে 'গায়ব' জানিয়ে দেন।

এ আয়াতেও 'গায়ব' অর্থ কুরআনী 'ওহী' নয়। কেননা তা করা হলে আয়াতের কোন বক্তব্যই স্পষ্ট হয় না। যেহেতু পরবর্তী الخبيث। অর্থ মুনাফিক, যারা মুখে ঈমান যাহির করে, আর মনের মধ্যে কুফর গোপন রাখে। আর الطيب অর্থ প্রকৃত মুমিন। বর্তমানে এ মুমিন ও মুনাফিক পার্থক্যহীনভাবে মিলে–মিশে একাকার হয়ে আছে। আল্লাহ্ এভাবে নিশ্চই থাকতে দিবেন না, বা থাকা তাঁর পছন্দ নয়; বরং নিম্নোদ্ধৃত দু'টি পন্থার যে–কোন একটি দ্বারা এ দু'শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পার্থক্য করে দিবেনইঃ

একটি, সকলের উপর পরীক্ষা চালাবেন। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কে মুমিন আর কে মুনাফিক তা স্পষ্ট ও প্রমাণিত হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, গায়ব–এর ইল্ম। তা এই যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে মুমিন ও মুনাফিকদের অবস্থা জানিয়ে দিবেন, ধরিয়ে দিবেন—ধরিয়ে দিবেন এদের মধ্যকার পার্থক্য। কিন্তু এই পন্থাটি কেবলমাত্র নবী–রাসূলগণের জন্য ব্যবহৃত। তা–ও আবার সব নবী–রাসূল নন, বরং আল্লাহ্ তাদের মধ্য থেকে যাঁকে যাঁকে এ উদ্দেশ্যে পছন্দ করে বাছাই করে নিবেন, কেবল তাঁদেরকেই জানিয়ে দিবেন।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'গায়ব' বলতে পরিভাষার 'ওহী'ই বুঝায় না; বরং এখানে তার অর্থ, অজানা কথা বাহ্যিকভাবে জানিয়ে দেয়া। যেমন মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যেকার পার্থক্য। 'গায়ব' বলতে যদি পরিভাষিক 'ওহী'ই বুঝানো হতো, তাহলে নবী–রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে চান বাছাই করে নিয়ে তাঁকে 'গায়ব' জানানোর কথা অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা সে রকমের 'ওহী' তো সব নবী–রাসূলগণের নিকটই এসে থাকে। কোন নবীই 'ওহী' পাওয়া থেকে বঞ্চিত নন।

তবে উপরোক্ত আয়াতে যে প্রেক্ষিতে 'গায়ব' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এখানে 'গায়ব'–এর তাৎপর্য হলো মুমিন ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরা ও তাদের মধ্যকার পার্থক্য নিঃসন্দেহে জানা ও বুঝতে পারা। ঈমান ও নিফাক দুটোই অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন অবস্থা। তা বাইরে থেকে নিঃসন্দেহে জানা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই একে 'গায়ব' বলা হয়েছে। কুরআনে যদিও মুনাফিকদের চারিত্রিক বিশেষত্ব বলে দেয়া হয়েছে; কিন্তু তার ভিত্তিতে 'অমুক অমুক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুনাফিক' বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে না। তাই এই 'গায়ব'

আল্লাহ্ তা'আলা কেবলমাত্র তাঁর রাসূলকেই জানিয়ে দেন বলে উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। তার দলীল হিসাবে ইতিহাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। নবী করীম (স) তাবুক যুদ্ধের সময় সমস্ত মুনাফিককে নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছিলেন, হযরত হুযাইফা (রা)কে তা জানিয়েও দিয়েছিলেন।[১] এভাবেই কুরআনে উদ্ধৃত 'খবীস'কে 'তাইয়্যেব' থেকে পৃথক করে দেয়ার কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। উদ্ধৃত আয়াতটি চিন্তা করলেও তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এ ধরনের নিশ্চিত জ্ঞান কুরআনের সাধারণ ও সামগ্রিক বা নীতিগত কথার মাধ্যমে অর্জন করা চলে না। সেজন্য স্বতন্ত্র একটি পন্থার একান্ত প্রয়োজন, যার মাধ্যমে রাসূল (স) নিজে জানবেন এবং অন্যকেও জানাবেন।

তৃতীয়ঃ কুরআনের আয়াতঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ - (التكوير: ٢٣-٢٤)

এবং সে সেই পয়গাম বাহককে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে। আর সে 'গায়ব'কে (লোকদের পর্যন্ত পৌছানোর ব্যাপারে) মোটেই কৃপন নয়।

এ আয়াতের 'الغيب' বলতে কুরআন ওহীকেই বুঝিয়েছে। এর অর্থ, রাসূল (স)–এর নিকট যে 'ওহী' নাযিল হয়, তা লোকদের নিকট পৌছাতে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না। তিনি তা গোপন করেন না, আটকে রাখেন না। তাকে একবিন্দু রদ্‌বদলও করেন না। যেমন তিনি পান, ঠিক তেমনই তিনি পৌছিয়ে দেন।

রাসূল (স)কে গায়ব জানানো হত, এ আয়াত তা স্পষ্ট করে বলছে। আর এ 'গায়ব' 'ওহী' ছাড়া আর কিছুই নয়।

চতুর্থঃ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ -

এটা গায়ব পর্যায়ের খবর যা আমরা তোমাকে ওহী করে জানিয়ে দিচ্ছি।

কুরআনে এ ধরনের বাক্যাংশ কয়েকটি স্থানেই রয়েছে। এ সকল বাক্যাংশ থেকেও এই কথাই জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'গায়ব' তাঁর রাসূলের নিকট প্রকাশ করেন। গায়বী বিষয়ে তাঁকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী অবহিত করেন।

---

১. الدرجات الرفيعة ص ٢٨٤، الاستيعاب ج ١ ص ٣٣٤، اسد الغابه ج ١ ص ٣٩١، تاريخ بغداد ج ١ ص: ١٦١

আর হযরত হুযাইফা (রা) রাসূলে করীম (স)–এর গোপন রহমাত ও তত্ত্ব জানতেন বলেই মুনাফিকদের সম্পর্কেও তাঁকে জানিয়েছিলেন।

উপরের দীর্ঘ কুরআন–ভিত্তিক আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদের নিকট ওহী পাঠান, তাঁদেরকে তিনি 'গায়ব' ও জানান এবং যা প্রত্যক্ষ নয়, পর্যবেক্ষণের আওতায় আসেনা, আল্লাহ্ তা তাদের সমুখে স্পষ্ট প্রতিভাত করে তোলেন। এ পর্যায়ে কয়েকটি আয়াতকে ভিত্তি করে কিছুটা চিন্তা–ভাবনা করা যাচ্ছে।

বস্তুতঃ রাসূলে করীম (স) দ্বীন–ইসলামের যে সব মৌলিক ও বিস্তারিত নিয়ম–বিধান ও প্রাচীন কালের কিসসা–কাহিনী উপস্থাপন করেছেন, তা সবই 'গায়ব' পর্যায়ের জিনিস। তার কোন একটিও মানুষের ইন্দ্রিয়–গ্রাহ্য বা চিন্তা–কল্পনার আওতাধীন ব্যাপার নয়। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (স)কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ
هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۔ (هود-٤٩)

(হে মুহাম্মাদ!) এ সবই গায়ব–এর খবর। আমরা তোমার নিকট তা ওহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। এর পূর্বে তুমিও তা জানতে না, তোমার জনগণও তা জানত না। অতএব ধৈর্যধারণ কর। কেননা শুভ পরিণতি মুত্তাকী লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট।

কুরআন মজীদ নিজেই 'গায়ব' থেকে আসা বিধান, তাতে যাবতীয় গায়বী খবরই সন্নিবেশিত। তার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। সেই কুরআন অপেক্ষা অধিক উন্নত ও স্পষ্ট 'গায়ব' আর কি হতে পারে, যার কথা উপরোক্ত আয়াতটিতে বলা হয়েছে? আসলে যে কথা যে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তা তার পটভূমিতে 'গায়ব'। পটভূমি ও ক্ষেত্র বিভিন্ন, তাই 'গায়ব'ও বিভিন্ন। আল্লাহ্ তো এই সব 'গায়ব' তার শব্দ ও অর্থ সহই রাসূলের নিকট পাঠিয়েছেন, তার বাহ্যিক আকৃতি ও তাৎপর্য তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। কেননা একথা প্রমাণিত ও সর্বজন স্বীকৃত যে, কুরআন মজীদ তার শব্দ ও অর্থ সহই এক মু'জিজা। আর অন্যান্য মু'জিজাও এক–একটি গায়ব–এর জিনিস।

মোটকথা, কুরআন থেকে একথা যেমন প্রমাণিত যে, 'গায়ব' একমাত্র আল্লাহ্রই অধিগম্য বিষয়, অন্য কেউই 'গায়ব' পর্যায়ের কিছুই জানেনা, সেই সাথে একথাও কুরআন থেকেই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী–রাসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে যতটা চেয়েছেন, এই 'গায়ব'–এর ইল্ম ততটা দিয়েছেন।

এখানে আমরা কুরআন মজীদ থেকেই দেখাতে চেষ্টা করব যে, আল্লাহ্ তাঁর কোন্ কোন্ নবী ও রাসূলকে কোন্ কোন্ 'গায়ব' জানিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)কে 'গায়ব' জানিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَٰئِكَةِ ۙ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔

(البقرة : ٣١ - ٣٣)

আর আল্লাহ্ আদমকে সমস্ত 'নাম' শিক্ষা দিলেন। পরে সে গুলোকে ফেরেশতাদের সমুখে পেশ করলেন; অতঃপর বললেন, এই সব জিনিসের নাম আমাকে জানিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বললো, মহান পবিত্র হে আল্লাহ্। আমাদের তো কোন ইল্‌ম নেই সেই ইল্‌ম ছাড়া যা তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছ। আসলে তুমিই হচ্ছ সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী। তখন আল্লাহ্ বললেনঃ হে আদম! তুমি ওদেরকে এই সবের নামসমূহ জানিয়ে দাও। পরে আদম যখন তাদেরকে সেই সবের নাম জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ্ বললেনঃ আমি কি তোমদের বলিনি যে, আমি আসমান-যমীনের গায়ব জানি—জানি তোমরা যা প্রকাশ কর, আর যা গোপন কর।

এই তিনটি আয়াত সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনা করলে আমরা নিঃসন্দেহে জানতে ও বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী আদম (আ)-কে সেই সব নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন তত্ত্বসমূহ জানিয়ে দিয়েছিলেন, যা ফেরেশতাদের নিকটও 'গায়ব'ই ছিল। আল্লাহ্'র আদেশক্রমে তিনি সেই গুলো ফেরেশদের জানিয়ে দিলেন। এই নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব সমূহকে তিনি কুরআনে أسماء 'নামসমূহ' বলে পেশ করেছেন। কিন্তু এই 'নাম' বলে তিনি দ্রব্যসমূহের শুধু নাম পরিচিতিই বুঝান নি। কেননা শুধু নাম জানলেই তো আর তদ্দরুণ আদমের শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না।

আসলে এই 'নাম' বলতে নামের দ্রব্যসমূহ—দ্রব্যসমূহের নিগূঢ়-নিহিত তত্ত্বসমূহ বুঝতে হবে। তার অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি কর্মের নিগূঢ় রহস্যাবৃত তত্ত্ব ও দ্রব্য-গুণাদিই হযরত আদম (আঃ)কে জানিয়েছিলেন। আদমকে এই 'নাম'সমূহ শিক্ষা দানের ফলেই বিশ্বলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব, সে সংক্রান্ত খবরাদি ও নিয়ম-কানুন এবং জীবনের ঘটনাবলী জানা-বুঝা মনুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আল্লাহর কথা ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ - 'পরে সেই সমুদয়কে ফেরেশতাদের নিকট পেশ করলেন' থেকেই আমাদের এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা শুধু 'নাম' শিক্ষাদানই লক্ষ্য হলে هم 'সেই সমুদয়' বলা হত না। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত আদম (আ) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে 'গায়ব' —গায়ব-এর ইল্‌ম বাস্তবিকভাবেই লাভ করেছিলেন।

২. হযরত নূহ (আ) গায়ব জেনেছিলেন।

তিনি আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে তাঁর নিকট দোয়া করেছিলেন বলা হয়েছেঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا - إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا - (نوح : ٢٦-٢٧)

আর নূহ বললঃ হে আমার রব্, এই কাফিরদের মধ্য থেকে কাউকেই পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দিওনা। তুমি যদি এদেরকে এখানে ছেড়ে দাও,তাহলে এরা তোমার বান্দাহদের পথভ্রষ্ট করবে আর এদের বংশে যারাই জন্ম নিবে, তারা দুরাচার কাফিরই হবে।

হযরত নূহ্ (আ) তাঁর উম্মাতের সমুখে দীর্ঘকাল ধরে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন; দাওয়াত প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করেছেন। এই দাওয়াত প্রচার ব্যাপদেশে তিনি অবর্ণণীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, বিরোধীদের অনেক ঠাট্টা–বিদ্রূপ তিনি সহ্য করেছেন। বিশেষ বিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং মর্মস্পর্শী ওয়ায–নসীহতের মাধ্যমে শির্কের বিস্তীর্ণ জাল ছিন্ন–ভিন্ন করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীয় উম্মাতের নিকট থেকে কোন অনুকূল সাড়া পাননি। তারা কোন দিন ঈমান আনবে, সে আশাও তিনি আর রাখতে পারলেন না, ফলে সম্পূণ নিরাশ হয়ে গেলেন। আর সেই নৈরাশ্যের মধ্যে পড়েই তিনি উপরোক্ত দোয়াটি করেছিলেন। তিনি বেঈমান কাফিরদের সম্পূর্ণ ধ্বংস কামনা করেছেন। কেননা তাঁর জনগণের এবং তাদের বংশধরদের পরিণতি যে অত্যন্ত খারাপ, তা তিনি নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছিলেন। আর নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে উক্তরূপ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়তাপূর্ণ কথাগুলো দোয়ার মধ্যে বলতে পারা সম্ভব হয়েছিল।

ওদের মধ্য থেকে যে কেউ ঈমান আনবে না, ওদের বংশধররা কাফির হয়ে উঠবে, তাদের উপস্থিত কার্যকলাপ ও নৈতিক চরিত্রের পরিণতি যে অত্যন্ত খারাপ, এ বিষয়ে এটা কি তাঁর আগাম সংবাদ দেয়া নয়?

এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন মনে হচ্ছে আয়াতটি হলোঃ

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ - (هود : ٣٦)

নূহের প্রতি ওহী পাঠানো হলো যে, তোমার জনগণের মধ্য থেকে যারাই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আর কেউ–ই কক্ষনই ঈমান আনবে না। অতএব তুমি ওদের কার্যকলাপে দুঃখিত হবেনা।

এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সেই কালের কাফির লোকদের মধ্য থেকে যে আর কেউ ঈমান আনবে না, সে কথা আল্লাহ্ নিজেই এ আয়াতের মাধ্যমে বলে দিয়েছিলেন এবং হযরত নূহ্ (আ) আল্লাহ্র এই কথা থেকেই তা জানতে পেরেছিলেন। একথা ঠিক, কিন্তু ওদের বংশধরদের মধ্য থেকেও যে কেউ–ই ঈমান আনবে না, তা তিনি কেমন করে জানলেন?— সে বিষয়ে তো কোন কথাই এ আয়াতে বলা হয়নি। ওদের বংশধররা যে ফাজির কাফির হয়েই উঠবে, একথা হযরত নূহ (আ) নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্র নিকট থেকে জানতে পেরেছিলেন। জানতে পেরেছিলেন বলেই অত দৃঢ়তা সহকারে সে কথা দোয়ার মাধ্যমে বলা সম্ভব হয়েছিল। আল্লাহ্ই কোন একটি উপায়ে ভবিষ্যতের সেই 'গায়ব' তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ)কে আসমান–যমীনের 'মালাকূত' প্রদর্শনঃ

কুরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ)–এর জীবনের প্রায় সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর তাওহীদী দাওয়াতের সূচনা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (الانعام ٧٥)

এবং এমনিভাবেই আমরা ইবরাহীমকে আসমান–যমীনের 'মালাকূত' দেখিয়েছি, যেন সে দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের মধ্যের একজন হতে পারে।

'মালাকূত' অর্থ পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌমত্ব, নিরংকুশ প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব, প্রকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যা আসমান–যমীনের সর্বত্র বিরাজমান ও সদা কার্যকর। ইমাম রাগেব বলেছেন, 'মালাকূত' অর্থ আল্লাহ্র নিরংকুশ মালিকত্ব।

হযরত ইবরাহীম (আ)কে আসমান–যমীনের 'মালাকূত' দেখানোর তাৎপর্য হচ্ছে, আসমান–যমীনের প্রতিটি বিন্দু ও অণু–কণার উপর যে একমাত্র আল্লাহ্রই সার্বভৌমত্ব, মালিকত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব কার্যকর, তা–ই দেখিয়ে দেয়া, দেখিয়ে দেয়া যে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোই একবিন্দু কর্তৃত্ব নেই। তাই শির্ক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সমগ্র প্রাকৃতিক জগতের উপর মালিকত্ব, কর্তৃত্ব ও নিয়ম–বিধান কার্যকরকরণে আল্লাহ্ই একক, তাঁর সাথে অন্য কেউই বিন্দু মাত্রও শরীক নয়। হযরত ইবরাহীম (আ)কে আল্লাহ্ তা'আলা এই সব দেখিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তিনি দৃঢ় প্রত্যয়শীল হতে পারেন। কেননা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান তো হযরত ইবরাহীমের ছিল; কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় অর্জনেরও প্রয়োজন ছিল। শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য তো অনস্বীকার্য। শ্রবণের পর প্রত্যক্ষ দর্শন ছিল কাম্য।

এই প্রদর্শন অর্থ 'গায়ব'–এর ইল্ম দান, 'গায়ব' সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান। কেননা এই 'মালাকুত' সম্পূর্ণ রূপে 'গায়ব' পর্যায়ের ব্যাপার। মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে তা কখনই অনুভব বা আয়ত্ত করতে পারে না।

৪. হযরত লূত (আ)কে 'গায়ব' জানানোঃ

হযরত লূত (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)–এর সময়কারই একজন নবী। সকাল বেলাই যে তাঁর উম্মাতের লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত সৈনিকদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তা তিনি পূর্বাহ্নেই জানতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্ আগেই তাঁকে প্রেরিত ফেরেশতাদের দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ط إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ـ (هود : ٨١)

ফেরেশতাগণ বললঃ হে লূত, আমরা তোমার রব্ব কর্তৃক প্রেরিত। ওরা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। ব্যস, তুমি কিছুটা রাত থাকতেই স্বীয় পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরে না তাকায়।

কিন্তু তোমার স্ত্রী (তোমাদের সঙ্গে যাবেনা।) কেননা তার উপর তা–ই ঘটবে, যা ওদের উপর ঘটবে। ওদের ধ্বংসের জন্য সকাল বেলার সময় নির্দিষ্ট। আর সে সকাল কি খুব নিকটে নয়?

অতঃপর হযরত লূত (আ) যদি তার ঈমানী সঙ্গীদের নিকট বলে থাকেন যে, এই বেঈমান জনগণ সকাল বেলাই ধ্বংস হয়ে যাবে, তাহলে একথা বলা কিছুমাত্র অসত্য হবে না যে, তিনি সেই সময় কাফিরদের পরিণতি সম্পর্কে গায়বী ইল্ম জানতেন আর সেই 'গায়ব' সম্পর্কেই আগাম সংবাদ জানাচ্ছিলেন। যদিও তাঁর এই গায়বী ইল্ম তাঁর নিজস্ব নয়, তাঁর নিজস্ব ক্ষমতার ফলও নয় এবং তা অসীমও নয়, বরং একান্তই সীমাবদ্ধ।

৫. হযরত ইয়াকুব (আ)–এর গায়বী ইল্ম জানাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা কাহিনী উদ্ধৃত করে বলেছেনঃ

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ

لِيْ سَاجِدِيْنَ - قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۖ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۖ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (يوسف : ٤-٦)

ইউসুফ যখন তার পিতাকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে পিতা! আমি স্বপ্নে দেখলাম এগারটি তারকা ও সূর্য–চন্দ্র আমার জন্য সিজদা করছে। (তখন সে) বললঃ হে প্রিয় পুত্র, তুমি তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করো না, তাহলে তারা তোমার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র পাকাবে। কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

আর এই রূপ–ই হবে (যেমন তুমি স্বপ্নে দেখেছ যে,) তোমার রব্ব তোমাকে (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নিবেন এবং তোমাকে প্রত্যেক কথার মর্মমূলে পৌছানোর নিয়ম শেখাবেন। আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূব–বংশধরদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত তেমনিভাবে পূর্ণ করে দিবেন, যেমন এর পূর্বে তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক–এর উপর পূর্ণ করেছেন। নিশ্চিতই তোমার রব্ব সর্ব বিষয়ে বিজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী।

এ আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল, উক্ত কথা দ্বারা হযরত ইয়াকূব নবী (আ) তাঁর পুত্র ইউসুফের স্বপের ব্যাখ্যা দিলেন। সে স্বপ্নের অন্তর্নিহিত পরম সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। আর তা ছিল তাঁর পুত্র ইউসুফের উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহন করা সম্পর্কিত। ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটবে, তা তিনি স্বপ্নের বিবরণের মধ্য দিয়েই জানতে পেরেছিলেন। আর এটাও 'গায়ব' জানা পর্যায়ের একটি ব্যাপার। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্গণের মধ্য থেকে যাকে চান, এই যোগ্যতা দান করেন।

ইউসুফের ভাইগণ যখন তাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ)–এর নিকট দাবি করলেন যে, ইউসুফকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন, সে ঘুরে–ফিরে ও খেলা–ধূলা করে আসবে, তখন তার জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ

اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ - (يوسف : ١٣)

আমি নিঃসন্দেহে এই দুশ্চিন্তা গ্রস্থ যে, তোমরা তো তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে আর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে এমতাবস্থায় যে, তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে না।

এ কথাটি ভাইদের মনে ইউসুফের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন শয়তানী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আগাম সংবাদ দান পর্যায়ের। পরবর্তী কালে ভাইরা যে এ রকমের কথাই বলবে ঘরে ফিরে এসে, তা আল্লাহ্ তা'আলা আগামভাবে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভাইদের সেই কথাটি পরে আল্লাহ্ উদ্ধৃত করেছেন এ ভাষায়ঃ

يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ وَتَرَكۡنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُ ۔ (يوسف : ١٧)

হে আমাদের পিতা। আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় মগ্ন ছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম। এই সময় ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে।

পরে হযরত ইয়াকুব (আ) যখন তাদের ভাই (ইউসুফ) সম্পর্কে তাদের কথা শুনলেন, তখন তিনি তাদের কথা সত্য বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হলেন না। বললেনঃ

بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أَنفُسُكُمۡ أَمۡرًا ۖ فَصَبۡرٌ جَمِيلٌ ۖ (يوسف : ١٨)

বরং তোমাদের নফ্স তোমাদের জন্য একটি কঠিন কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে।

অর্থাৎ তোমরা যা বলছ, তা সত্য নয়, প্রকৃত ব্যাপার তার বিপরীত। ইউসুফ এখনও জীবিত, সে রিয্ক পাচ্ছে। বাঘ তাকে খায়নি।

হযরত ইয়াকূব (আ)–এর এই কথাটি যে ইন্দ্রিয়–গ্রাহ্য অতীত জগতের বাইরের খবর, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে?—বস্তুতঃ এ বিষয়ে কোনই অস্পষ্টতা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই হযরত ইয়াকুব (আ)কে এই জ্ঞান দিয়েছিলেন এবং তিনিই হযরত ইয়াকূব (আ) সম্পর্কে বলেছেনঃ

وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلۡمٖ لِّمَا عَلَّمۡنَٰهُ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ۔ (يوسف : ٦٨)

নিঃসন্দেহে সে আমাদের দেয়া শিক্ষা ও জ্ঞানের বলেই জ্ঞানবান ছিল। যদিও অনেক লোকই তা জানেনা।

আর এই জ্ঞানের বলেই তিনি ইউসুফের কনিষ্ঠ ভাই সম্পর্কে অন্যান্য ভাইদের বর্ণনা— সে চুরি করেছিল বলে তাকে ধরে রাখা হয়েছে— কে মিথ্যা গণ্য করেছিলেন। এমনকি সেই গোটা খবরকেই তিনি সম্পূর্ন অসত্য ও বানোয়াট বলে ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেনঃ

سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أَنفُسُكُمۡ أَمۡرًا ۖ فَصَبۡرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَنِي بِهِمۡ جَمِيعًا ۚ

(يوسف : ٨٣)

এই কঠিন ব্যাপারটিকে তোমাদের নফ্‌সই সহজ বানিয়ে দিয়েছে। অতএব ধৈর্য ধারণই উত্তম। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা শীগ্‌গীরই তাদের সকলকেই আমার নিকট উপস্থিত করে দিবেন।

হযরত ইয়াকূবের কান্নাকাটির উপর তাঁর পুত্ররা আপত্তি জানাল। বললঃ

تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّٰى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (يوسف : ٨٥)

আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো কেবল ইউসুফের স্মরণেই ক্ষয়িত হচ্ছেন। এইরূপ অবস্থা হয়েছে যে, তাঁর চিন্তায়ই আপনি নিজেকে নিজে জীর্ণ–শীর্ণ করবেন, অথবা নিজের জীবন ধ্বংস করে ফেলবেন।

এর জবাবে হযরত ইয়াকুব (আ) বললেনঃ

اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُونَ - يَابَنِىَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَاَخِيهِ وَلَا تَايْئَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ط اِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ - (يوسف : ٨٦-٨٧)

আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার ফরিয়াদ আল্লাহ্ ছাড়া কারো নিকটই করছিনা। আর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া যে জ্ঞান আমার আছে, তা তোমরা জানো না। হে আমার ছেলেরা! তোমরা গিয়ে ইউসুফের ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর লও। আল্লাহ্‌র রহমাত থেকে নিরাশ হবে না। কেননা আল্লাহ্‌র রহমাত থেকে নিরাশ হয় তো শুধু কাফির লোকেরাই।

এসবই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইয়াকূব (আ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী। এ সবের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কথাঃ 'নিঃসন্দেহে সে আমাদের দেয়া জ্ঞানের বলেই জ্ঞানবান'–এর সত্যতা প্রতিভাত আর এ থেকেই হযরত ইয়াকূবের নিজের কথাঃ 'আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে জ্ঞান আমার আছে তা তোমরা জানো না'—এর সত্যতা ও যথার্থতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

আর সেই সাথে হযরত ইয়াকূব (আ)–এর এ কথটিও স্মরণীয়। তিনিবলেছিলেনঃ 'হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা শীগ্‌গীরই তাদের সকলকেই আমার নিকট উপস্থিত করে দিবেন।' এ থেকে নিঃসন্দেহে জানা গেল, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইর জীবিত থাকা ও শেষ পর্যন্ত মিলিত হওয়ার ব্যাপারে একবিন্দু সংশয় বোধ করতেন না। তাঁর এই নিঃসংশয়তা ও দৃঢ় প্রত্যয় যে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া জ্ঞানেরই ফল ছিল, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে?

তাছাড়া হযরত ইউসুফ ভাইদের বলেছিলেনঃ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ـ
(يوسف: ٩٣-٩٤)

তোমরা আমার জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার মুখের উপর তোমরা এটিকে ফেল; দেখবে, তিনি দৃষ্টিমান হয়ে উঠবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট নিয়ে আস।

এই কাফেলা যখন (মিশর থেকে) রওয়ানা হলো, তখন তাদের পিতা বললঃ আমি ইউসুফের সুঘ্রাণ পাচ্ছি, তোমরা যেন বলোনা যে, আমি বার্ধ্যক্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

হযরত ইয়াকূব (আ)কে এখনো জানানো হয়নি যে, হযরত ইউসুফ শুধু বেঁচেই নেই, তিনি একটি দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়ে আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মিশরের দিকে রওয়ানা হয়ে বললেন, 'আমি ইউসুফের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' তিনি তা কেমন করে বলতে পারলেন? আসলে এ সবই হচ্ছে গায়বী ইল্ম, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন কোন নবীকে দান করেন।

৬. হযরত ইউসুফের ভবিষ্যদ্বাণীঃ

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)–এর এই কথাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ (يوسف: ١٠١)

হে আমার রব্ব, তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়েছ। আর আমাকে সব বিষয়ের গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান–তত্ত্ব অনুধাবনের শিক্ষা দান করেছ। আসমান–যমীনের হে মহান স্রষ্টা! তুমিই ইহকাল ও পরকালে আমার পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক। মুসলিম হিসাবেই আমাকে মৃত্যুদান কর এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মশীল লোকদের সাথে মিলিত কর।

এটি হযরত ইউসুফের একটি বিশেষ প্রার্থনা। এতে তিনি মহান আল্লাহ্র অসীম দানের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আন্তরিক শোকর আদায় করছেন এবং তাঁর যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার মত জ্ঞান ও যোগ্যতা যে আল্লাহ্রই দান এবং তিনি যে রাষ্ট্রক্ষমতার

অতি উচ্চ আসনে আসীন কেবল আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহে, তা-ও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ স্বপের এই ব্যাখ্যাদান যে জ্ঞানের ভিত্তিতে, তা এক প্রকার গায়ব-এর ইল্‌ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত ইউসুফের কারা-জীবনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ - يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۖ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ -

(يوسف : ٣٦-٤١)

জেলখানায় তার সাথে আরও দু'জন যুবক প্রবেশ করল। একদিন তাদের একজন তাকে বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মদ্য প্রস্তুত করছি। অপরজন বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথার উপর রুটির ঝুড়ি বহন করছি, পাখীরা তা থেকে ছোঁ মেরে খেয়ে নিচ্ছে। আমাদের দু'জনের দেখা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি আমাদের বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন আন্তরিক নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি রূপেই দেখছি।

হযরত ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বরূপ বললঃ হে কারাগারের বন্ধুরা! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন তো নিজের মনিবকে মদ্যপান করাবে। আর অপরজনকে শুলে চড়ানো হবে। আর পাখীগুলো তার মস্তক ঠুকরে ঠুকরে খাবে। ফয়সালা হয়ে গেছে সেই ব্যাপারের যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছিলে।

পরবর্তীকালে বাস্তব ঘটনাবলী সেভাবেই ঘটেছিল, যেমন হযরত ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হিসাবে বলেছিলেন। একজন তো রেহাই পেয়ে গেল। আর অপরজনকে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। পাখীরা তার মস্তক ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছিল। স্বপ্নের এইরূপবাখ্যাদান—যা পরে সেই ব্যাখ্যানুযায়ী ঠিক ঠিক ঘটে যায়, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত গায়ব-এর ইল্‌ম ছাড়া সম্ভব নয়। হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের পূর্বেই বলেছিলেনঃ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ · 'আমি যে তোমাদের দু'জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেব, তা সেই ইলম-এর ভিত্তিতে, যা আমার রব্ব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।'

এই সূরা ইউসূফে উদ্ধৃত আর একটি স্বপ্ন হচ্ছে স্বয়ং মিশরাধিপতির দেখা। তার ব্যাখ্যাও হযরত ইউসুফ (আঃ) দিয়েছিলেন। কুরআনের ভাষায় সে স্বপ্ন ছিল এইরূপঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ (يوسف : ٤٣)

বাদশাহ বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, সাতটি হৃষ্ট–পুষ্ট গাভীকে অপর সাতটি ক্ষীণাঙ্গী গাভী খেয়ে ফেলছে। আর শস্যের সাতটি গুচ্ছ সবুজ–তাজা, অপর সাতটি শুষ্ক।

এই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে প্রথমে তিনি দরবারী লোকদের নিকট এর ব্যাখ্যা চাইলেন। কিন্তু দরবারী লোকেরা বললঃ 'এ তো অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্নের কথা। আমরা এধরনের স্বপ্নের কোনই তাৎপর্য বুঝিনা।'

পরে কারাগারে বন্দীদশায় পড়ে থাকা হযরত ইউসুফের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁর নিকট এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হলো। জবাবে হযরত ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেনঃ

تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ -
(يوسف ٤٧ - ٤٩)

সাতটি বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে তোমরা চাষাবাদ করতে থাকবে। এই সময় যে সব ফসল তোমরা কাটবে তা থেকে অল্প অংশ—যা তোমাদের খোরাকীর জন্য প্রয়োজন বের করবে আর অবশিষ্টাংশকে গুচ্ছের মধ্যেই রেখে দিবে। এর পর সাতটি কঠিন বছর আসবে। এই সময়ের জন্য তোমরা যে সব শস্য সঞ্চয় করে রাখবে, তা সবই এ সময়ে খেয়ে ফেলবে। কিছু উদ্বৃত্ত হলে হবে শুধু তা–ই, যা তোমরা সংরক্ষিত করে রেখেছিলে।

এরপর একটি বছর আবার এমন আসবে, যখন রহমাতের বর্ষণ দ্বারা লোকদের ফরিয়াদ শুনা হবে, আর তারা রস নিঙড়াবে।

এই বর্ণনার মাধ্যমে হয়ত ইউসুফ (আ) তিনটি গায়বী বিষয়ে আগাম খবর দিয়েছেন। সে তিনটি বিষয় হচ্ছেঃ (১) সাতটি বছর পরপর তারা আল্লাহ্র বরকত ও কল্যাণে আপ্লুত হবে। তাদের ফসল হবে উত্তম। (২) এর পরবর্তী সাতটি বছর দুর্ভিক্ষকাল, আল্লাহ্র রহমাতের দ্বার রুদ্ধ হয়ে থাকবে। এবং (৩) এই চৌদ্দটি বছর

অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি বছর তারা নতুন করে আল্লাহ্‌র অশেষ নিয়ামত ও কল্যাণ লাভ করবে। তখন আল্লাহ্‌র রহমাতের দ্বার থাকবে উদার–উন্মুক্ত।

বাস্তবেও তা–ই ঘটেছিল। হযরত ইউসুফের পক্ষে এভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান আল্লাহ্‌র দেয়া গায়বী ইলমের দৌলতেই সম্ভব হয়েছিল।

৭. হযরত সালেহ–র ভবিষ্যদ্বাণীঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ـ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ـ (هود ٦٤-٦٥)

হে আমার জনগণ! লক্ষ্য কর, আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহ্‌র যমীনে বিচরণ করার জন্য অবাধ ও মুক্ত করে ছেড়ে দাও। এর পথে সামান্য বাধারও সৃষ্টি করোনা। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়বে।

কিন্তু তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল। এ কারণে সালেহ লোকদেরকে সতর্ক করে বললঃ 'তোমরা অতঃপর আর মাত্র তিনটি দিন নিজেদের বসবাসের সুখ ভোগ করে নাও। এমন একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা, যা কখনই মিথ্যা হতে পারেনা।

লোকেরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন স্বরূপ আসা উষ্ট্রীটির সাথে নিষিদ্ধ আচরণ করল। তখন আল্লাহ্‌র নবী হযরত সালেহ্ (আ) সে লোকদের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে তিন দিনের মেয়াদের একটা ঘোষণা দিলেন। আসলে এই উষ্ট্রী ছিল একটি মুজিজা বিশেষ। হযরত সালেহ (আ) আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে তাওহীদী দাওয়াত পেশ করলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর নবুয়্যাতের সত্যতার প্রতি ঈমান গ্রহণের আহবান জানালেন। কিন্তু লোকেরা নবীর দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল। এমন কি মুজিজা স্বরূপ আবির্ভূত ও বিঘোষিত উষ্ট্রীটিকেও তারা মেরে ফেলল। নবীর উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তাদের উপর আযাব এসে গেল।

এই সালেহ নবী 'সামূদ' নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ পর্যায়ে অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ـ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ

وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ـ (الذريت: ٤٣-٤٤)

এবং (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) সামূদ জাতির ঘটনায়। তাদেরকে যখন বলা হয়েছিল্ যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগ করে নাও। কিন্তু এই সতর্ক সংকেতের পরও তারা তাদের রব্‌–এর নির্দেশের বিপরীত আচরণ করল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর তাদের চোখের সমুখেই এবং দেখতে দেখতেই এক আকস্মিক আযাব চেপে বসল।

নবীর বলা গায়ব–এর কথা যে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জানা এবং তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়, তার অকাট্য প্রমাণ এর চাইতে বড় আর কি হতে পারে?

৮. হযরত সুলাইমানের গায়ব জানা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ـ (النمل: ١٦)

আর দায়ূদের উত্তরাধিকারী হলো সুলাইমান। সে বলল, হে জনগণ! আমাদেরকে পাখীর ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সব রকমের জিনিসই দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা (আল্লাহ্‌র) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

দায়ূদ ও সুলাইমানের (আ) পাখীর ভাষা বুঝতে পারা ও তার শিক্ষা লাভ কি গায়ব পর্যায়ের একটা ইল্‌ম নয়?

আল্লাহ্ বলেছেনঃ

حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ـ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ـ (النمل: ١٨-١٩)

একবার সে তার সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যখন পিপিলিকার প্রান্তরে পৌছল, তখন একটি পিপিলিকা বললঃ হে পিঁপড়ের দল! নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়। এমন যেন

না হয় যে, সুলাইমান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পিষে মেরে ফেলবে আর তারা টেরও পাবে না।

সুলাইমান এ পিঁপড়ের কথা শুনে স্মীত হাসি হাসল। বললঃ হে আমার রব্ব! আমাকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখ। তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, আমি যেন তার শোকর আদায় করি এবং এমন নেক আমল করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর নিজ রহমাতে আমাকে তোমার নেক বান্দাহগণের মধ্যে শামিল কর।

কোন মানুষের পক্ষে পিপিলিকার কথা বুঝতে পারা কি অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়? হ্যাঁ, অস্বাভাবিক হলেও তা-ই বাস্তব সত্য এবং তা আল্লাহ্র শেখানো গায়বী ইল্ম পর্যায়ের।

আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ - لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ - فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ - (النمل، ٢٠-٢٢)

(ভিন্ন এক উপলক্ষে) সুলাইমান পক্ষীকুলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল এবং বলল, ব্যাপার কি? আমি হুদহুদ্কে দেখতে পাচ্ছিনা কেন? সেটি কি কোথাও উধাও হয়ে গেছে? আমি সেটিকে কঠিন শাস্তি দেব; কিংবা যবাই করব। নতুবা সেটিকে আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাতে হবে।'

খুব বেশী সময় অতিবাহিত না হ'তেই পাখীটি এসে বললঃ আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি, যা আপনার জানা নেই। আমি 'সাবা' সম্পর্কে নিশ্চিত খবরাদি নিয়ে এসেছি।

হুদ্হুদ্ পাখীর মাধ্যমে পাওয়া এই খবরাদি কি গায়েবী ইল্মের ব্যাপার নয়?

৯. হযরত ঈসা (আ)-র গায়ব জানা

আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ، (ال عمران ، ٤٩)

তোমরা যা খাও এবং যা তোমাদের ঘরসমূহে সঞ্চয় করে রাখ, সেই বিষয়ে আমি তোমাদের জানাব।

হযরত ঈসা (আ) তাঁর সময়ের জনগণের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এবং শীত মৌসুমের জন্য যা তারা সঞ্চয় করে রাখত, তার বর্ণ ও পরিমাণ কি বা কত, তা সবই বলে দিতেন। এটা ছিল তাঁর একটি অতি বড় মুজিজা

এই আয়াতটিওঃ

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ - (صف : ٦)

হে বনী ইসরাঈলীরা। আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল, তওরাতের যা কিছু আমার সমুখে আাছে, তার সত্যতা ঘোষণাকারী এবং আমার পরে 'আহমাদ' নামের একজন আগমণকারী রাসূলের সুসংবাদদাতা।

প্রায় ছয় শত বছর পরে আগমনকারী রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজ্‌তবা (স)র আগমন সম্পর্কে আগাম খরব দেয়া কি গায়ব পর্যায়ের সংবাদ দান নয়?

এভাবে এ পর্যন্ত যে ক'জন নবী–রাসূলের 'গায়ব' পর্যায়ের আগাম খবর দানের আলোচনা কুরআনের ভিত্তিতে পেশ করা হয়েছে, তা থেকে একথা অনস্বীকার্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল 'গায়ব' পর্যায়ের ইল্‌মের অধিকারী ছিলেন। সেই সাথে একথাও প্রমাণিত ও স্বীকৃত যে, এ পর্যায়ের কোন জ্ঞানই তাঁদের নিজস্ব ও একান্ত নিজস্ব উপায়ে অর্জিত ছিলনা; তা সবই ছিল মহান আল্লাহ্ তা'আলার জানিয়ে দেয়া।

কেননা 'গায়ব' মৌলিকভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনি ছাড়া আর কারোই এই ইল্‌ম নেই, থাকতে পারে না।

১০. হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর গায়বী খবর দান

কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ - (التحريم : ٣)

(এই ব্যাপারটি বিবেচ্য যে,) নবী একটি কথা নিজের একজন স্ত্রীর নিকট অতি গোপনীয়তা সহকারে বলেছিল। পরে সে স্ত্রী সেই গোপন কথা প্রকাশ করে

দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে এই গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়ার ব্যাপারটি নবীকে জানিয়ে দেন। নবী (তার স্ত্রীকে) এই বিষয়ে কতকটা সতর্ক করেছিল এবং কতকটা ছেড়ে দিয়েছিল। পরে নবী যখন তাকে (গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়ার) এই ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করল, সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলঃ আপনাকে কে তা জানিয়েছে? নবী বলল, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, নবী করীম (স) তাঁর বেগম হযরত হাফ্সা (রা)-এর নিকট একটি গোপন কথা বলেছিলেন এবং তা অন্য কারো নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত হাফ্সা সে বিষয়টি অন্য কাউকে জানিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই সময় তাঁর নবী (স)কে এই গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়ার ব্যাপারটি জানিয়ে দেন। তখন রাসূলে করীম (স) হাফ্সাকে এই গোপন কথার কোন কোন অংশ প্রকাশ করে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন আর কোন কোন অংশের কথা জিজ্ঞাসা করেলেন না। হাফ্সা (রা) যে সব বিষয় প্রকাশ করেছেন সেই সমস্ত বিষয়ে তিনি আর জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। তখন হযরত হাফ্সা (রা) রাসূলে করীম (স)কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমি যে গোপন কথা প্রকাশ করেছি, তা আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে কে বলল? জবাবে তিনি বললেনঃ আমাকে তো জানিয়েছেন তিনি, যিনি সবকিছু জানেন—সকল গোপন তত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে যিনি পুরোপুরি অবহিত (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা)।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কুরআন নাযিল হওয়ার নির্দিষ্ট উপায়ের বাইরে ভিন্নতর উপায়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে এই 'গায়ব' বিষয়ে অবহিত করে দিয়েছিলেন।

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন কোন নবী ও রাসূলকে গায়বী ইল্ম দান করেছিলেন। ঠিক তেমনি কুরআন মজীদ থেকে একথাও জানা যায় যে, নবী বা রাসূল নন এমন কতিপয় ব্যক্তিকেও আল্লাহ্ তা'আলা গায়ব জানিয়েছেন। এ পর্যায়ের কয়েকটি বিষয় এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

১১. কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ - وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّٰلِحِينَ -

(آل عمران: ٤٥-٤٦)

যখন ফেরেশতাগণ বললঃ 'হে মরিয়ম,আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর নিজের এক 'বাণী'র সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম হচ্ছে মরিয়াম পুত্র মসীহ–ঈসা। ইহকাল ও পরকালে সে সম্মানিত হবে ও আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী বান্দাহদের মধ্যে গণ্য হবে। সে লোকদের সাথে দোলনায় থাকা অবস্থায়ও কথা বলবে—কথা বলবে বেশী বয়স হওয়া কালেও। বস্তুতঃ সে এক সৎ ও সাধু পুরুষ হবে।

মরিয়মের বিয়ে হয়নি, কোন পুরুষের সংস্পর্শেও সে কখনই আসেনি, তা সত্ত্বেও তার একটি পুত্র সন্তান হবে, তার নাম এই হবে ইত্যাদি কথা চিন্তা করাও কি মরিয়মের পক্ষে সম্ভব ছিল? — না, তা সম্ভব ছিলনা। এটা সম্পূর্ণ 'গায়বী' কথা। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

১২. ইবরাহীম (আ)–এর স্ত্রী ও গায়বী ইল্‌ম

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ - وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ - قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ - قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ - (هود: ٦٩- ٧٣)

আর শোন, ইবরাহীমের নিকট আমাদের ফেরেশতা সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো। বললঃ তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জবাব দিল, তোমার প্রতিও সালাম হোক। অনন্তর অল্পক্ষণ পরই ইবরাহীম একটি কষানো বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে আসল।

——ইবরাহীমের স্ত্রীও নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সে উক্ত সুসংবাদ শুনতে পেয়ে হেসে ফেলল। অতঃপর আমরা তাকে প্রথমে ইসহাক এবং তারপর ইয়াকুব এই দুই নামের সন্তান হওয়ার সুসংবাদ দিলাম। সে (স্ত্রী) বললঃ হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য! এখন কি আর আমার সন্তান হবে? আমি বৃদ্ধা আর এই আমার স্বামী বয়োবৃদ্ধ।—এতদসত্ত্বেও এই সুসংবাদ একটা বড়ই আশ্চর্যজনক জিনিস। ফেরেশতারা বললঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশ জানতে পেরে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ? এতো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমাত ও বরকত।

ইবরাহীম (আ)–এর স্ত্রী নবী বা রাসূল ছিলেন না। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই বার্ধক্যাবস্থায় তাদের সন্তান হবে, একথা কি তাদের কল্পনায়ও আসতে পারছিল? এ

অকল্পনীয় ব্যাপারটি তাদেরকে গায়বী ইল্ম হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলাই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

১৩. মুসা (আ)–এর মা ও গায়বী ইল্ম

ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ (القصص ، ٧)

এবং আদেশ পাঠালাম মূসা'র মায়ের প্রতি যে, তুমি ওকে দুধ খাওয়াও। তুমি যখন তার বিষয়ে ভয় পাবে, তখন তাকে নদীতে ফেলে দেবে। তুমি তখন ভয় পাবে না, দুশ্চিন্তাগ্রস্থও হবে না। আমরা তাকে তোমার নিকটই ফিরিয়ে দেব এবং তাকে একজন রাসূল বানাব।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায়, হযরত মূসা'র মা গায়বী উপায়ে তাঁর পুত্রের ভবিষ্যত জানতে পেরেছিলেন। জানতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ্ তার হিফাযত করবেন, তাঁর কোলেই আবার তাকে ফিরিয়ে আনবেন সহীহ্ সালামতে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে রাসূল বানাবেন। হযরত মূসা (আ)–এর মাকে এই যা কিছু জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, তা একান্তই গায়ব এবং এই গায়ব ও নবী–রাসূলকে জানানো গায়ব—এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্যই লক্ষ্য করা যায় না।

১৪. হযরত মূসা'র সফর–সঙ্গীর গায়ব জানা

খিজির নামে সুপরিচিত হযরত মূসা (আ)র এক সঙ্গীকে আল্লাহ্ তা'আলা রহমাত ও ইল্ম দান করেছিলেন এতটা, যতটা স্বয়ং হযরত মূসাও আয়ত্ত করতে পারেন নি। সঙ্গী খিজির নদী পারাপারের নৌকাটি ভেংগে দিয়েছিলেন। কেননা তিনি আল্লাহ্র নিকট থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, সেখানে একজন বাদশাহ রয়েছে, যে সব নৌকা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। একটি বালককে হত্যা করেছিলেন; কেননা তার পিতা–মাতা মু'মিন ছিলেন, তাদের প্রতি সে কুফরী ও দুর্ব্যবহার করতে পারে এই ভয়ে। আর কাত হয়ে পড়া প্রাচীরটি সঠিকভাবে দাঁড় করে দিয়েছিলেন; কেননা তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তার নীচে দুই ইয়াতীম সন্তানের জন্য ধন–ভান্ডার সংরক্ষিত রয়েছে। এসব কাজ করে তিনি বলেছিলেনঃ

وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ـ (الكهف ، ٨٢)

আমি এর কোন একটি কাজও আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি।

তার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই তাকে এই সব গোপন রহস্য সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যা অন্য কারোই জানা ছিল না।

তাই এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে 'গায়ব' একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনি ছাড়া আর কারোই গায়ব জানা নেই। তবে আল্লাহ্ নিজেই যদি তাঁর কোন নবী ও রাসূল বা তাঁর কোন প্রিয় বান্দাহকে কিছু জানাতে ইচ্ছা করেন, তাহলে তাঁরাও তা ততটুকুই জানতে পারেন, যতটুকু আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় জানাতে চান বা জানিয়ে দেন। তার বেশী কিছু জানার কোন ক্ষমতা কারোই নেই, থাকতে পারে না।

নবী করীম (স) গায়ব জানেন না–এই পর্যায়ের আয়াতসমূহের তাৎপর্য

কুরআন মজীদে আমরা এমন বহু সংখ্যক আয়াত পাঠ করি, যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, নবী করীম (স) 'গায়ব' জানেন না। আর পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, কোন কোন আয়াতে নবী করীম (স) 'গায়ব' জানতেন বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষণে এই দুই ধরনের আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার উপায় কি?

এর জবাব প্রসঙ্গে আমরা কুরআনের সে সব আয়াত উদ্ধৃত করছি, যা থেকে জানা যায় যে, রাসূল করীম (স) গায়ব জানতেন নাঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

(الاحقاف، ٩)

১. বল হে নবী! আমি অভিনব কোন রাসূল নই। আর আমি জানিনা আমাকে দিয়ে কি করা হবে, জানিনা তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে। আমি তো অনুসরণ করি শুধু তা, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আর আমি তো সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

قُلْ لَّآ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّىْ مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيْرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ـ

(الانعام ، ٥٠)

২. বল, হে নবী! আমি তোমাদের বলছিনা যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন–ভান্ডার রয়েছে। আর আমি গায়ব জানিনা। আমি এ–ও বলছিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমি তো শুধু তা–ই অনুসরণ করে চলি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনও সমান হতে পারে?– তোমরা কি চিন্তা–ভাবনা কর না?

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ۔ (هود : ٣١)

৩. আমি তো তোমাদের বলি না যে, আল্লাহ্‌র ধন–ভান্ডার আমার নিকট রয়েছে আর আমি তো 'গায়ব' জানিনা; এ–ও বলিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা। এ কথাও বলি না যে, তোমাদের চক্ষু যে সব লোককে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ্ তাদেরকে কোন কল্যাণ দেন না। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহ্–ই ভালো জানেন। এই ধরনের কথা যদি আমি বলি, তাহলে আমি তো তখন একজন জালিম।

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۔ (الاعراف ١٨٨)

৪. বল হে নবী! আমি আমার নিজের জন্য কল্যাণ ও ক্ষতির মালিক নই। তবে ঘটবে তা–ই যা আল্লাহ্ চাইবেন। আমি যদি 'গায়ব'ই জানতাম, তাহলে আমি বিপুল কল্যাণ লাভ করে নিতাম এবং কোনরূপ অনিষ্টই আমাকে স্পর্শও করত না। আমি তো আর কিছু নই, শুধু সতর্ককারী ও ঈমানদার লোকদের জন্য সুসংবাদদাতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۔ (التوبة : ١٠١)

৫. তোমাদের চতুঃপার্শ্বের বেদূঈনদের মধ্যে মুনাফিক রয়েছে, মদীনাবাসীদের মধ্য থেকেও যারা মুনাফিক তারা মুনাফিকীতে পাকা–পোক্ত হয়েছে। তুমি তাদের জানো না, আমরা তাদের জানি। সে দিন দূরে নয়, যখন আমরা তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেব। পরে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে।

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۔ (الانبياء : ١٠٩)

৬. তারা যদি অন্য দিক মুখ ফিরায়, তাহলে তুমি বলে দাওঃ আমি তো প্রকাশ্যভাবে তোমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি। এখন আমি জানি না যে, তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা খুব নিকটবর্তী, কিংবা বহু দূরে।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

(المائدة: ١٠٩)

৭. যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমাদের (দাওয়াতের) কি জবাব দেয়া হয়েছে? তখন তারা বলবেঃ আমরা কিছুই জানি না, হে আল্লাহ্! তুমিই সকল গোপন ও নিগূঢ় তত্ত্ব জান।

مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ـ اِنْ يُّوْحٰى اِلَىَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

(ص ، ٦٩ ـ ٧٠)

৮. (ওদের বলঃ) আমি সেই সময়ের কিছুই জানি না, যখন উচ্চতর জগতে ঝগড়া হচ্ছিল। আমাকে তো ওহীর মাধ্যমে এসব কথা শুধু এজন্য বলে দেয়া হয় যে, আমি সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র।

এই সব–ক'টি আয়াতের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, রাসূলে করীম (স) গায়ব জানেন না। অথচ পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে, নবী–রাসূলগণ—হযরত মুহাম্মাদ (স)ও গায়ব–এর ইল্‌ম জানেন। এ প্রেক্ষিতে এক'টি আয়াতের ব্যাখ্যা কি করা যেতে পারে?

আমাদের বক্তব্যঃ

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকেই এসব আয়াত থেকে উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব দেয়া খুবই সহজ। কুরআনের ভাষার একটা ধরণ হচ্ছে, তাতে একটা জিনিস একান্তভাবে আল্লাহ্‌র রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়, ঠিক সেই জিনিসই ভিন্নতর প্রেক্ষিতে অন্য কারোও রয়েছে বলে বলা হয়।

যেমন সূরা আজ্–জুমার–এর ৪২ আয়াতে বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহ্ই প্রাণসমূহ পূর্ণ মাত্রায় কবজ করেন সে সবের মৃত্যুর সময়ে।' এ আয়াতে মৃত্যুদান ও জান কবজকরণ একমাত্র আল্লাহ্‌র কাজ বলা হয়েছে। কিন্তু সূরা আন্–নহল –এর ৩২ আয়াতে বলা হয়েছেঃ 'ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করে।'

প্রথমোক্ত আয়াতে জান কবজ করার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র বলা হয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতে সে কাজ ফেরেশতাদের বলা হয়েছে। এ একই কাজের দু'টি ক্ষেত্রের

দৃষ্টিতেই এ রূপে বলা হয়েছে। জান কবজকরণ ও মৃত্যুদান মূলতঃ আল্লাহ্র কাজ, কোনই সন্দেহ নেই। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাঁরই পক্ষ থেকে এই কাজটি বাস্তবে ঘটায় মাত্র। প্রথম কাজ কেবল আল্লাহ্র, তাতে অন্য কারোই এক বিন্দু অংশ নেই। আর দ্বিতীয় কাজটির মাধ্যম বা হাতিয়ার হচ্ছেন ফেরেশতারা—যাঁরা এই কাজে নির্দেশিত ও নিযুক্ত। এদের নিজেদের কোন ক্ষমতাই নেই কারো জান কবজ করার। তাঁরা নিজেরাও জানেন না কখন কার জান কবজ করতে হবে বা করার নির্দেশ হবে।

এ দৃষ্টিতেই 'গায়ব' জানা পর্যায়ে যা বলা হয়েছে তা বুঝতে হবে। মৌলিকভাবে 'গায়ব' জানেন কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্র নবী–রাসূলগণ যদি কিছু জানেন, তবে তা ঠিক ততটুকু, যতটুকু আল্লাহ্ তাঁদের জানান নিজ ইচ্ছামতে।

বিষয়টি খোলাসা করার জন্য আমরা উদ্ধৃত আয়াতসমূহের প্রত্যেকটির বিশ্লেষণ করা জরুরী মনে করছি।

প্রথমোদ্ধৃত আয়াতটির চারটি অংশ রয়েছে। সে চারটি অংশ এইঃ

১. বল, আমি কোন অভিনব রাসূল নই।

২. আমার সাথে কি করা হবে তা যেমন আমি জানি না, তেমনি তোমাদের সাথে কি করা হবে তাও (জানিনা)।

৩. আমি তা–ই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয় (তাছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করি না)।

৪. আমি একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শক–সতর্ককারী মাত্র (এ ছাড়া আর কিছুই নই)

প্রথম বাক্যাংশে মুশরিকদের একটি মারাত্মক ভুল ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, নবী–রাসূলগণ সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবেন। পানাহার, নিদ্রা–বিশ্রাম ইত্যাদি কেবল সাধারণ মানুষের অভ্যাস, তা নবী–রাসূলগণের মধ্যে থাকবে না। ওরা বলত, মুহাম্মাদ (স) যদি সত্যিই একজন রাসূল হতেন, তাহলে তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না, নিদ্রা–বিশ্রাম গ্রহণ করতেন না, হাটে–বাজারে চলা–ফিরা করতেন না। এই সবই যদি করেন তাহলে বুঝতে হবে, তিনি রাসূল নন। তাদের এ ধারণারই উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াতটিতেঃ

مَالِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط (الفرقان: ٧)

এই রাসূলের কি হলো, সে কেন খাবার খায় ও হাটে–বাজারে চলাফেরা করে?

উপরোক্ত ব্যাক্যাংশে মুশরিকদের এই ভুল ধারণারই প্রতিবাদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ায় তিনি কোন নতুন নবী বা রাসূল হয়ে আসেন নি। পূর্বেও বহু নবী ও রাসূল এই দুনিয়ায় এসেছেন। তাঁদের যেমন পানাহার, নিদ্রা–বিশ্রাম ও বাজারে চলাফেরা করার অভ্যাস ছিল, এই শেষ নবী–রাসূলেরও তাই রয়েছে। তিনি কোন ভিন্নতর বিশেষত্ব নিয়ে আসেন নি। তাঁরাও যেমন মানুষ ছিলেন, ইনিও তেমনি একজন মানুষ। আর আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী–রাসূলগণ মানুষই হয়ে থাকেন, অন্য কিছু নয়। সূরা আল–ফুরকানের আয়াতেই ওদের উক্ত ধারণার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ ـ

(الفرقان، ٢٠)

হে নবী! তোমার পূর্বে আমরা যে সকল রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই খাবার খেত এবং বাজারে চলাফেরা করত।

মুশরিকরা নবী–রাসূল সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করত যে, তাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন আদত–অভ্যাসের অধিকারী হবেন; শুধু তা–ই নয়, বরং তাঁরা হবেন অসীম ক্ষমতার মালিক। তাঁরা 'গায়ব'–এর ইলমের পূর্ণ অধিকারী হবেন নিজস্বভাবে, আল্লাহ্‌র সাথে কোন সংযোগ ব্যতীতই। আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাক্যাংশ দিয়ে তারই প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং মুশরিকদের ভুল ধারণার অপনোদন করতে চাওয়া হয়েছে।

বলে দেয়া হয়েছে, তিনি 'গায়ব" জানেন না শুধু তা–ই নয়, তিনি নিজ ইচ্ছামত কিছু করতেও পারেন না। তাঁকে তো প্রতি পদে–পদে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হয়, যা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দেয়া হয়। এ জন্যই তৃতীয় বাক্যাংশের কথাটি বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়নি যে, তিনি 'গায়ব' আদৌ জানেন না। বলা হয়েছে, গায়ব জানেন শুধু ততটুকু, যতটুকু আল্লাহ্‌ তাঁকে জানান।

শেষ বাক্যাংশটিতে বলা হয়েছেঃ তোমারা মনে কর, আমি নিজস্ব যোগ্যতা বলে গায়ব জানি। কিন্তু তা ঠিক নয়। এরূপ ধারণা একান্তই ভিত্তিহীন। আমি তো ভয় প্রদর্শক—সতর্ককারী নবী মাত্র। আমার কাজ হচ্ছে, ওহী সূত্রে যা আমাকে জানানো হবে, আমি কেবল তা–ই তোমাদের বলব। আল্লাহ্‌র জানানো ছাড়া আমার কিছুই জানা নেই।

দ্বিতীয়োক্ত আয়াতটিতেও তা–ই বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 'আমি 'গায়ব' জানিনা'। অর্থাৎ আমি 'গায়ব' জানিনা আল্লাহ্‌র দেয়া ইল্‌ম ছাড়া। অর্থাৎ ওহী সূত্রে প্রাপ্ত ইল্‌ম–

এর ভিত্তিতেই শুধু আমি গায়ব জানি, নিজস্বভাবে নয়। আর সে 'গায়ব'ও ততটুকুই, যতটুকু আল্লাহ্ জানান।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও মুশরিকদের ভুল ধারণা দূর করতে চাওয়া হয়েছে। রাসূলে করীম (স)–এর বৈষয়িক দুর্গতি দেখে মুশরিকরা বলত, নবী–রাসূল হলে তাঁর এই রূপ দুর্গতি হতে পারত না। জবাবে বলা হয়েছে, আমি নিজ ক্ষমতায় না কোন সুবিধা লাভ করতে পারি, না দুর্গতি দূর করতে পারি। নিজ স্বভাবে যদি 'গায়ব' জানতাম, তাহলে কত সুবিধাই না আমি আমার নিজের জন্য করে নিতাম। তবে আল্লাহ্ যা চান, তা–ই হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ চাইলে গায়বী ইল্ম দেন— দেন বৈষয়িক সুখ–সুবিধা। তিনি না দিলে আমি নিজে কিছু আয়ত্ত করে নিতে পারি না। কেননা 'গায়ব'–এর ইল্ম আমার নিজস্ব কোন গুণ নয়। তা একমাত্র আল্লাহ্র অবদান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন তা আমাকে দান করেন।

পঞ্চম আয়াতটিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মুনাফিক তোমার চতুঃপার্শ্বে রয়েছে; কিন্তু তুমি তাদের চিননা। আমরা চিনি ও জানি। হ্যাঁ, আল্লাহ্ যখন তাদেরকে জানিয়ে চিনিয়ে দিলেন তাঁকে, তখনই তিনি তাদের জানতে ও চিনতে পারলেন। চিনতে পারলেন আল্লাহ্র চিনিয়ে দেয়ার কারণে। এই মুনাফিকদের চেনা ও জানা সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۔ (محمد، ٣٠)

আমরা চাইলে সেই লোকগুলোকে তোমাকে অবশ্যই দেখাতে পারি। অতঃপর তুমি নিজেই তাদের লক্ষণাদি দেখে তাদের চিনতে পারবে এবং তাদের কথাবার্তার ধরণের মধ্যেই তুমি তাদের ধরতে পারবে। আল্লাহ্ তো তোমাদের সকলের যাবতীয় আমল ভালোভাবেই জানেন।

এ আয়াত অনুযায়ী মুনাফিকদের বাহ্যিক লক্ষণাদি, চেহরা–সূরত ও কথা–বর্তার ধরন–ধারণ দেখেই তাদেরকে রাসূলে করীম (স) নিজেই চিনতে পারবেন বলে বলা হয়েছে, তবে তা আল্লাহ্র চিনিয়ে, দেখিয়ে দেয়ার পর, তার পূর্বে নয়।

দ্বিতীয়তঃ মুনাফিকরা রাসূলে করীম (স)–এর নিকট চিরদিন অপরিচিত বা অজ্ঞাত ছিলনা। কুরআন মজীদের নানা স্থানে তাদের পরিচিতি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এ আয়াতটিতেঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ـ (المنافقون، ٢)

তুমি যখন এদের প্রতি তাকাবে তখন এদের অবয়ব খুবই আকর্ষনীয় মনে হবে। আর এরা কথা বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে রাযী হবে। কিন্তু আসলে এরা খোদাইকৃত কাষ্ঠ খন্ড মাত্র, যা প্রাচীরের গাত্রে জুড়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি বলিষ্ঠ আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরা ঘোরতর শত্রু। এদের থেকে সতর্ক থাক। এদের উপর আল্লাহ্র মার, এদের কোন্ ভ্রান্তপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

শেষ পর্যন্ত এক মাস পরে আল্লাহ্র ওহীই মুনাফিকদের সৃষ্ট এই কঠিন বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। সেই ওহীর মাধ্যমেই তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত আয়েশা নির্দোষ। আর তাঁর বিরুদ্ধে যে কলংকের প্রবল ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কিন্তু তিনি নিজে গায়ব জানলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারত।

এই ঘটনাও চিরদিনের তরে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিল যে, নবী করীম (স) নিজে গায়ব জানতেন না। তিনি গায়বী বিষয়ে তখনই জানতে পারেন, যখন আল্লাহ্ নিজে তাঁকে জানান, তার এক মুহূর্ত পূর্ব পর্যন্তও সে বিষয়ে তার কিছুই জানা থাকে না। হযরত আয়েশা (রা)র নির্দোষিতা সম্পর্কে ওহী নাযিল করতে আল্লাহ্ তা'আলা দীর্ঘ এক মাস কাল বিলম্ব করলেন সম্ভবতঃ এজন্য যে, তিনি মুসলমানদের নিকট এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর সমুখে চিরদিনের তরে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ (স) নিজে 'গায়ব' জানেন না। ঘটনার শুরুতেই এই ওহী নাযিল হলে এ উদ্দেশ্য কখনই সফল হত না।

এ আয়াতটিতে মুনাফিকদের তিনটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছেঃ

১. ওরা বিশাল দেহ–অবয়বের অধিকারী

২. বাহ্যত ওরা নিজেদেরকে হক্পন্থী ও সত্য দ্বীনের অনুসারী দেখিয়ে বেড়ায়ঃ

৩. ওরা আসলে খোদাই করা কাষ্ঠের ন্যায়, যা প্রাচীরের গাত্রে জুড়ে দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় নিষ্প্রাণ, কর্মক্ষমতাশূণ্য।

অর্থাৎ কুরআনের আয়াত ও যুক্তিপূর্ণ কথা ওদের ঈমানকে প্রভাবিত করতে পারে না। সে সবের প্রতি কোন রূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো ওদের সাধ্যায়ত্ত নয়। ওরা নিষ্প্রাণ দেহ–সর্বস্ব মাত্র।

এছাড়াও সূরা 'আল–মুনাফিকূন'–এ ওদের এতসব লক্ষণাদির উল্লেখ করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে মুনাফিকদের চিনতে পারা রাসূলে করীম (স)–এর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিলনা। সূরা তওবা'য়ও বলা হয়েছেঃ

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ـ (التوبة، ٥٤)

ওরা নামাযের জন্য আসে বটে, কিন্তু আসে অবসাদগ্রস্থ অবস্থায় (অনিচ্ছুকভাবে, যেন ধরে আনা হচ্ছে), আর আল্লাহ্‌র পথে ওরা অর্থ ব্যয় সাধারণতঃ করেনা, করে অসন্তুষ্ট অবস্থায়।

আল্লাহ্ কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন রাসূলে করীম (স)কেঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط (التوبة: ٧٣)

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং ওদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন কর।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ (الاحزاب، ٤٨)

এবং কাফির ও মুনাফিকদের সমুখে আদৌ দমে যাবেনা, ওদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করবে না, ভরসা করবে আল্লাহ্‌র উপর।

আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ পালন করা রাসূলে করীম (স)–এর পক্ষে তখনই সম্ভব হতে পারে, যদি তিনি কাফিরদের ন্যায় মুনাফিকদেরও চিনতে ও চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। কাজেই তিনি যে ওদের চিনতে ও চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন আল্লাহ্‌র দেয়া গায়বী ইল্‌মের বলে ও বলে দেয়া লক্ষণাদির দৃষ্টিতে, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক তথ্য হচ্ছে, তিনি মুনাফিকদেরকে ভালো করে চিনেছিলেন। এমনকি তাদের নামের একটি তালিকা তৈরী করিয়ে তাঁর গোপন কথার আমানতদার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা)–এর নিকট সংরক্ষিতও করে দিয়েছিলেন।[১]

---

১. اسد الغابه ج ١ ص ٣٩١

মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র এই নির্দেশও ছিলঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (التوبة : ٨٤)

এবং ওদের কেউ মরলে তুমি তার জানাযা পড়বে না, তার কবরের নিকটে দাঁড়াবেও না। ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে।

এই কারণে রাসূলে করীম (স) কোন মুনাফিকের জানাযা নামায পড়েননি। হযরত উমর (রা)ও এমন কোন মৃতের জানাযায় শরীক হতেন না যেখানে হযরত হুযাইফা (রা) উপস্থিত থাকতেন না। কেননা তিনি তো রাসূলে করীম (স)–এর নিকট থেকে মুনাফিকদের চিনতে ও জানতে পেরেছিলেন।

রাসূলে করীম (স) নিজে যে বাস্তবিকই 'গায়ব' জানতেন না, তার এটা বড় প্রমাণ হযরত 'আয়েশা' (রা) সম্পর্কিত 'ইফ্‌ক্'–এর ঘটনা। এই ঘটনার উল্লেখ কুরআন মজীদে রয়েছে। এ সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী নাযিল হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত মদীনীয় সমাজের চতুর্দিকে হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে মিথ্যা রটনার প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। রাসূলের প্রিয়তমা বেগম এবং সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)–এর স্নেহময়ী কন্যার বিরুদ্ধে মিথ্যা–মিথ্যি যা কিছু রটনা করা হচ্ছিল, তাতে রাসূলে করীম (স) নিজে ভয়ানকভাবে উদ্বিগ্ন ও দুঃখ–ভারাক্রান্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা)–এর গোটা পরিবার দুঃখ ও লজ্জায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নবী করীম (স) কিছুই করতে বা বলতে পারছিলেন না। কেননা হযরত আয়েশা (রা) বাস্তবিকই কোন গুনাহ করেছেন কিনা, সে বিষয়ে তাঁর নিজের কিছুই জানা নেই। একমাস কাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত কাতর ও দিশেহারা অবস্থায় অতিবাহিত করলেন। কখনও খাদেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন, কখনও অন্যান্য বেগমগণের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতেন। কখনও কথা বলতেন হযরত আলী (রা)–এর সাথে আর কখনও হযরত উসামা ইবনে জায়দ (রা)–এর সাথে। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রা) তাঁর পিতার ঘরে গিয়ে উঠলে তিনি বললেনঃ 'তুমি গুনাহ্ করে থাকলে তওবা কর। আর না করে থাকলে আল্লাহ্‌ই হয়ত তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করবেন।'

বস্তুতঃই নবী করীম (স) যদি 'গায়ব' জানতেন, তাহলে এই চিন্তা–ক্লেশ, দুঃখ ও এই জিজ্ঞাসাবাদ ও তওবা করার উপদেশ দান—এর কোন কিছুই করা হত না, তার প্রয়োজনও দেখা দিতনা। তিনি তাঁর গায়ব জানার ভিত্তিতেই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারতেন যে, আয়েশা (রা) সম্পূর্ণ নির্দোষ নিষ্পাপ; তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে

তাঁর (আয়েশার) নির্দোষিতা প্রকাশের আশায় ওহীর অপেক্ষায় বসে থাকতে বাধ্য হতেন না।

এ পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের উল্লেখ আবশ্যক। কুরআনের ভাষায় নবী করীম (স) যেখানেই বলেছেন, আমি গায়ব জানিনা, সেখানেই এমন সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যে সব বিষয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জানা আছে, অন্য কারোই জানা সম্ভব নয়। যেমন কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কবে হবে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের প্রতি সুখদান বা আযাব দানের যে সব ওয়াদা করেছেন সে সবের বাস্তবায়নের দিন কবে ইত্যাদি। আল্লাহ্ এই সব বিষয়ের ইল্‌ম নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন, অন্য কাউকেই একবিন্দু জ্ঞান দেন নি। এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণাবলী স্পষ্ট। এ পর্যায়ের কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হচ্ছে।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ج لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا -
(الاعراف: ١٨٧)

১. এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করেঃ সেই কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে? তুমি বলঃ এই বিষয়ে জ্ঞান একমাত্র আমার রব্ব–এরই রয়েছে। তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে কেবল তিনিই তা প্রকাশমান করবেন।

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى - (طه ، ١٥)

২. কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আমি তার নির্দিষ্ট সময় গোপনই রাখতে চাই, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টা–সাধনা অনুযায়ী প্রতিফল পেতে পারে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ - (لقمان، ٣٤)

৩. কিয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই রয়েছে।

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ط وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا - (الاحزاب: ٦٣)

৪. লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কখন আসবে? বলঃ সে বিষয়ের জ্ঞান তো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট সংরক্ষিত। তুমি কি করে জানবে, হয়ত কিয়ামত নিকটেই এসে গেছে।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ط (حم السجدة ٤٧)

৫. কিয়ামত সম্পর্কিত ইল্‌ম কেবল আল্লাহ্‌র উপরই বর্তায়।

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - (الزخرف، ٨٥)

৬. এবং কিয়ামত সম্পর্কিত ইল্‌ম তাঁরই নিকট সংরক্ষিত আর তোমরা সকলে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

এই সব ক'টি আয়াত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, কিয়ামত সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা কেবলমাত্র নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। এর মধ্যে কি কারণ নিহিত তা–ও কেবল তিনিই জানেন। এই কিয়ামত সম্পর্কে যখনই রাসূলে করীম (স)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, প্রত্যেক বারই তিনি একই উত্তর দিয়েছেন। তা যেমন কুরআনে রয়েছে, তেমনি সহীহ্ হাদীসেও বিধৃত। এই কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (স)কেও কিছুই জানান নি। তাই বলে অন্যান্য জরুরী বিষয় সম্পর্কেও তাঁকে জানান নি, তা ঠিক নয়। আর তা যে ঠিক নয়, তা তো পূর্বে উদ্ধৃত সূরা আল্–জ্বিন–এর ২৪—২৭ আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছেঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ -

(الجن: ٢٧-٢٦)

গায়ব–এর একমাত্র আলেম আল্লাহ্‌ই। তিনি তাঁর 'গায়ব'কে কারো নিকটই যাহির করেন না। করেন শুধু তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে জানাতে তিনি রাযী হন।

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে নবী করীম (স) কিয়ামতের দিন–তারিখ জানেন না বলে বার বার তাঁর জবানীতে বলা হয়েছে। তার কারণ এই যে, এ পর্যায়ের ইল্‌ম তিনি কাউকেই দেন না। আর সূরা আল–মায়েদা'র ১০৯ আয়াতে যে বলা হয়েছেঃ 'যেদিন আল্লাহ্ সব রাসূলকে একত্রিত করবেন, সেদিন জিজ্ঞাসা করবেনঃ তোমাদের কি জবাব দেয়া হয়েছে, সকলেই বলবেঃ 'আমাদের কিছু জানা নেই, তুমি–ই হচ্ছ সমস্ত গায়ব–এর একমাত্র আলেম'। এতে রাসূলগণের একসাথে 'গায়ব' না জানার কথা বলা হয়েছে; তার কারণ এই যে, মূলতঃ তাঁরা তো গায়ব জানেনই না,তা যে ধরনেরই 'গায়ব' হোক–না কেন, একথা তো ঠিকই। তাঁরা তো মাত্র ততটুকুই জানেন—জানতে পারেন, যতটুকু তাঁদেরকে জানানো হয়। তার বলে তো তাঁরা 'গায়ব' জানেন, এমন দাবি করতে পারে না। বা তাঁরা 'গায়ব' জানেন, একথা আমরাও বলতে পারি না।

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)